প্রচ্ছদশিল্পী : অনিল কুমার দত্ত

ব্লক ও মুদ্রণ : ডি, জি, প্রেস এণ্ড পাব্‌লিসিটি সিণ্ডিকেট
৩।২এ, চন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫।২ শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-৭

বাঁধাই : পঞ্চানন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২০।এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২

মুখ্য-পরিবেশক : দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩
ফোন নং : ৩৪-৫০৩৫
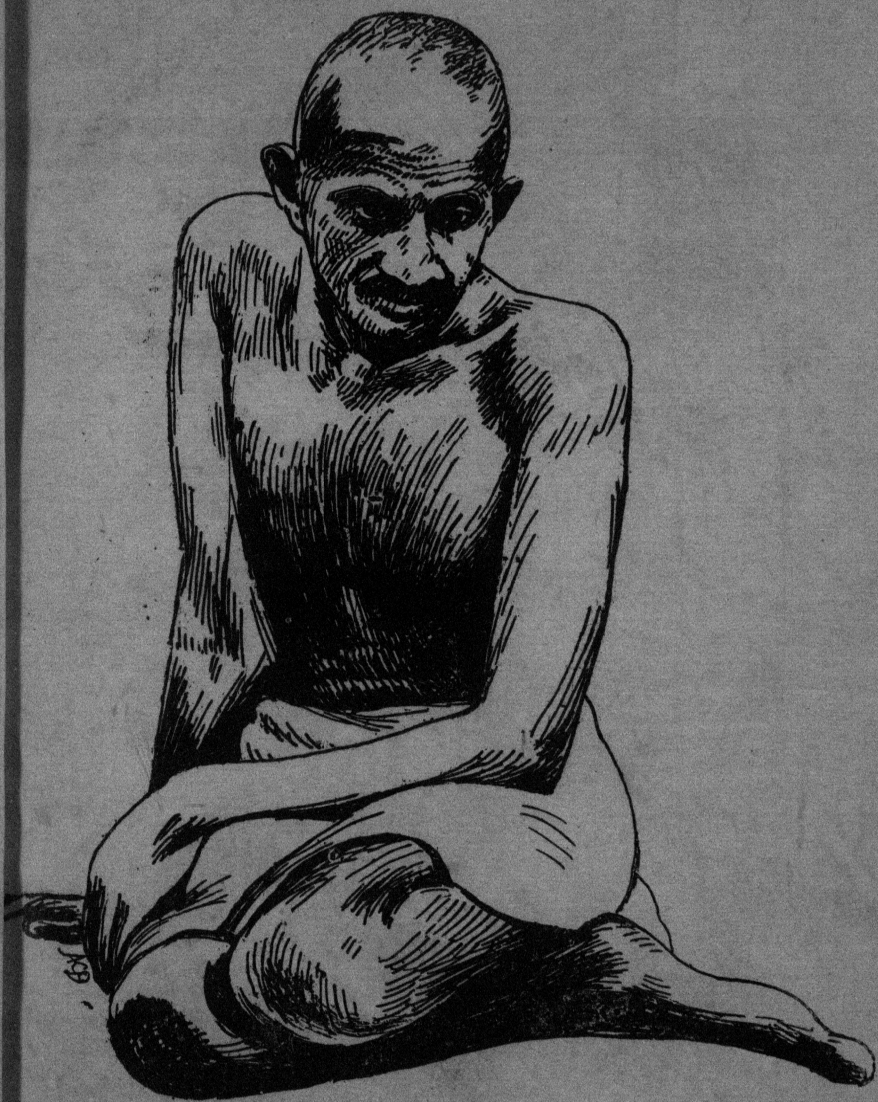
মহাত্মা গান্ধী

মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতির কর্মপরিষদের সদস্যগণ

১। শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়—সভাপতি
(পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)

২। ,, সতীশ চন্দ্র সামন্ত (কোষাধ্যক্ষ, প্রাক্তন লোকসভা সদস্য)

৩। „ আদিত্য কুমার বাঁকুড়া—সহঃ কোষাধ্যক্ষ, (প্রাক্তন এম, এল, এ)

৪। „ বসন্ত কুমার দাস—সাধারণ সম্পাদক, (প্রাক্তন লোকসভা সদস্য)

৫। „ নরেন্দ্র নাথ দাস—সদস্য
(History of Midnapur ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা)

৬। „ পঞ্চানন সিংহরায়—সদস্য (প্রাক্তন এম, এল, এ)

৭। „ রাধারমণ চক্রবর্তী—সদস্য
(রাণী রাসমণি, কর্ণগড় প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা)

৮। „ রাসবিহারী পাল—সদস্য, (এম, এল, এ)

৯। শ্রীমতী আভা মাইতি—সদস্য (প্রাক্তন মন্ত্রী, ভারত সরকার)

১০। „ গোপী নন্দন গোস্বামী—সদস্য
('বাংলার হলদিঘাট' 'তমলুক' ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রণেতা)

১১। „ বিরাজমোহন দাস—সদস্য, (বিশিষ্ট সংগঠন কর্মী)

১২। „ গোপীনাথ পতি (এ্যাড্‌ভোকেট) সদস্য

১৩। „ ধনঞ্জয় কর—সদস্য(প্রাক্তন এম, এল, এ)

১৪। „ অরবিন্দ মাইতি—সদস্য (এ্যাডভোকেট)

১৫। „ ভূপতি চরণ মাজি—সদস্য ("আরো আগে" পত্রিকার সম্পাদক)

১৬। „ রাসবিহারী রায়—সদস্য
(অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, 'মেদিনীবাণী' ও 'মেদিনীপুর' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক)
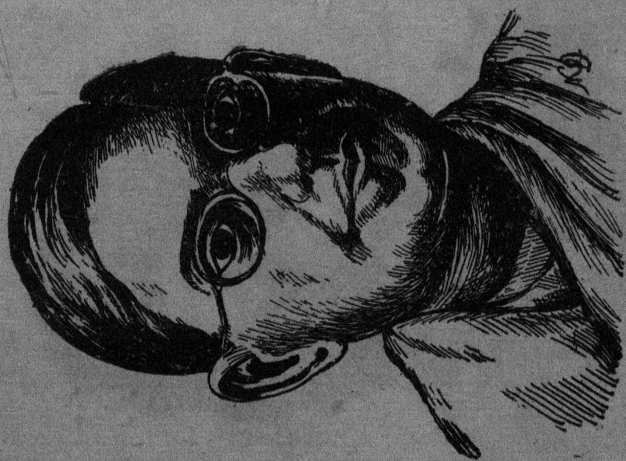
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

শ্রী অরবিন্দ

মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি

আজীবন সদস্য

১। শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি (বীরেন্দ্র পেপার হাউস কাঁথি)
২। „ সুধীন্দ্র নাথ মণ্ডল (কাকগেছিয়া)
৩। „ প্রতাপ চন্দ্র শাসমল (জামালপুর)
৪। „ রাখাল চন্দ্র পড়্যা (জরার নগর)
৫। „ মতিলাল প্রামাণিক (চেঁচুড়াপুট)
৬। „ বঙ্কিম বিহারী গিরি (আমতলিয়া)
৭। „ সূর্য্যকিরণ মিশ্র (পশ্চিম চেঁচুড়াপুট)
৮। „ গোবিন্দ প্রসাদ হাইত (ঠাকুর নগর)
৯। „ আশুতোষ রায়চৌধুরী (বাল্য গোবিন্দপুর)
১০। „ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি (ঠাকুর নগর)
১১। শ্রীমতী ভগবতী শাসমল (জুখিয়া বাজার)
১২। „ ত্রৈলোক্য নাথ মাহাতো (চন্দ্রী)
১৩। „ বাসুদেব মাহাতো (ঝাঁটিবাঁধ)
১৪। „ প্রফুল্ল কুমার পাহাড়ী (চন্দনপুর)
১৫। „ দিগম্বর দাস (ধান গাঁ)
১৬। „ ভাস্কর চন্দ্র দাস মহাপাত্র (মেদিনীপুর)
১৭। ৺হরিচরণ দাস (বক্শীষপুর)
১৮। শ্রীঈশ্বর চন্দ্র প্রামাণিক (সুভাষ পল্লী)
১৯। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া মান্না (ধান্দালি বাড)
২০। শ্রীভদ্রেশ্বর কর (খড়িগেড়িয়া)
২১। „ শরৎ চন্দ্র দাস (পোতাপুখুরিয়া অনন্তরাউত বাড)
২২। „ গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য (যবদা)
২৩। ডঃ পরিমল কুমার রায় (কলিকাতা)
২৪। ৺ভীমাচরণ পাত্র (কুঞ্জপাড়া)
২৫। শ্রীপুষ্পেন্দু বিকাশ দাস (ডায়মণ্ডহারবার)
২৬। „ রাম চন্দ্র মণ্ডল (কশাড়িয়া)
২৭। „ অক্ষয় নাথ গিরি (বাঁকীপুর)
২৮। „ উপেন্দ্র নাথ জানা (পাণিপিয়া)
২৯। „ বঙ্কিম চন্দ্র ভুঁইয়া (চেঁচুড়া পুট)
৩০। „ ভূষণ চন্দ্র মণ্ডল (ঐ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

৩১। শ্রীঅধর চন্দ্র রায় (বক্শীষপুর)
৩২। „ চিত্তরঞ্জন দাস
৩৩। „ দেবেন্দ্র নাথ বাগ (নামালডিহা)
৩৪। „ শ্যামাচরণ বেরা (কাঠরংকা)
৩৫। „ জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী
৩৬। শ্রীধর চন্দ্র সামন্ত (কাকদ্বীপ)
৩৭। „ রাজেন্দ্র নাথ মাইতি (শ্যামসুন্দরপুর পাটনা)
৩৮। „ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র (বেলগাছিয়া ভিলা
৩৯। „ রবীন্দ্র নাথ বেরা (লাখী)
৪০। „ রামচন্দ্র সামন্ত (হাদিয়া)
৪১। „ সতীশ চন্দ্র মাইতি (নববাণী মন্দির, কাঁথি)
৪২। „ গোপাল চন্দ্র দাস অধিকারী (দশগ্রাম)
৪৩। „ রাধারমণ সিংহ (চন্দ্রকোণা)
৪৪। „ কোহিনুর কান্তি করণ (ভাঙনমারি)
৪৫। „ দিগিন্দ্র নাথ দাস (ছোট গারানিয়া)
৪৬। „ গোষ্ঠ বিহারী পাত্র (থানা চন্দ্রকোণা)
৪৭। „ গদাধর দাস (কানাই দীঘি)
৪৮। „ রাধানাথ দাসঅধিকারী (অমরপুর)
৪৯। „ অরবিন্দ সরকার (গড়বেতা)
৫০। „ গোপাল চন্দ্র রায় (কলিকাতা)
৫১। „ নির্মল কুমার মাইতি (শ্যামসুন্দরপুর, পাটনা)
৫২। „ ক্ষুদিরাম রাণা (জুখিয়া বাজার)
৫৩। „ অনন্ত কুমার মণ্ডল (খাড়র)
৫৪। „ অমূল্যকুমার পড়্যা (বজবজিয়া)
৫৫। „ পঞ্চানন জানা (মৌহাটি)
৫৬। „ মাখন লাল দাস (কাঁথি)
৫৭। „ হৃষিকেশ মাইতি (বড়বাড়ী)
৫৮। „ ভবানী তোষ সিংহ (কাঁথি)
৫৯। শ্রীমতী বন্দনা বেরা (কাঁথি)
৬০। শ্রীপরেশ চন্দ্র প্রামাণিক (বকশিষপুর)
৬১। " শিবরাম আদিত্য (বসন্তপুর)
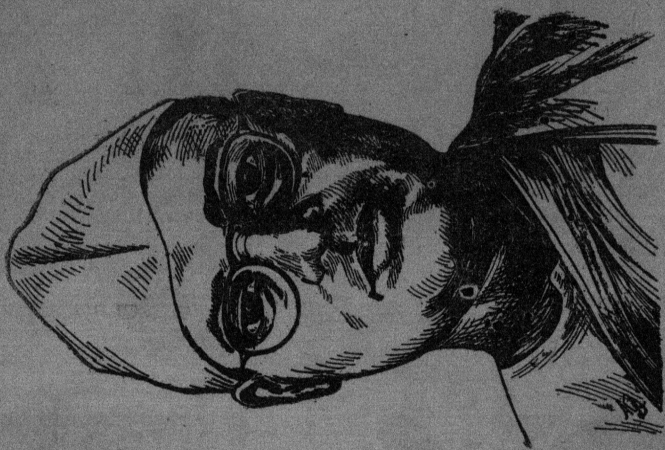
দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
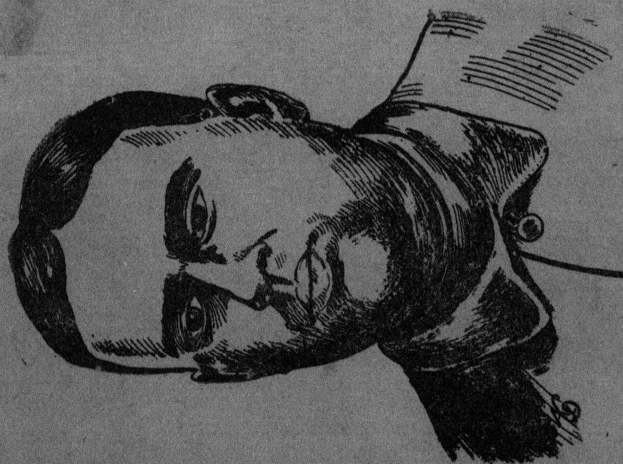
৬২। " শ্যামাপদ মান্না (লুটুনিয়া)

৬৪। " অজিত কুমার বসু (কলিকাতা)

৬৪। " নারায়ণ চন্দ্র বর (সমুদ্রপুর)

৬৫। " সুরেন্দ্র নারায়ণ ভূঁঞ্যা (কলিকাতা)

৬৬। " জগদীশচন্দ্র দাস (বসানচক্)

৬৭। " সুবলচন্দ্র দাস (ব্রজলালচক্)

৬৮। " সব্যসাচী রায় (আটিলা গড়ি)

৬৯। " জিতেন হাওলাদার (ঝাড়গ্রাম)

৭০। " ধনঞ্জয় রায় (বক্শীষপুর)

৭১। " বিভূতি ভূষণ পাত্র (বারাতলা)

৭২। " অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল (অজানবাড়ী)

৭৩। শ্রীমতী বিজন প্রতিমা মাইতি (বালী)

৭৪। শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল (কলিকাতা)

৭৫। শ্রীমতী ঊষা পাত্র (কুঞ্জপাড়া)

৭৬। শ্রীরামচন্দ্র মাহাতো (চিঙুড়কস্যা)

৭৭। " শিশিরকুমার দাস (চৈতল)

৭৮। " অনন্তকুমার জানা (কাঁথি)

৭৯। " রাধাগোবিন্দ বিশাল (রামনগর)

৮০। " প্রকৃতিকুমার মণ্ডল (কলিকাতা)

৮১। শ্রীমতী অনিমা রায় (তমলুক)

৮২। শ্রীবনবিহারী পাল (মেদিনীপুর)

৮৩। " শুভ্রাংশু শেখর সাহু (কাঁথি)

৮৪। " পি, বি, রায়(T. P. O. 1612)

৮৫। ,, সুশীলকুমার রায় (গড়বেতা)

৮৬। ,, হরেকৃষ্ণ আদক (মদনমোহনচক)

৮৭। ,, নগেন্দ্রনাথ সেন (আলোককেন্দ্র)

৮৮। ,, সত্যরঞ্জন পাড়ই (কুমারপুর)

৮৯। শ্রীমতী নিত্যময়ী গোল

৯০। কুমারী রিতা দাস (কলকাতা)

৯১। শ্রীহরিহর দাস (ভাঙনমারা)
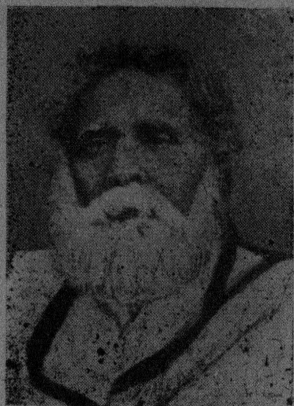
রাজ নারায়ণ বসু
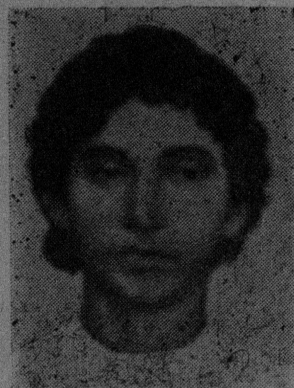
জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু

ক্ষুদিরাম বসু

সত্যেন্দ্র নাথ বসু
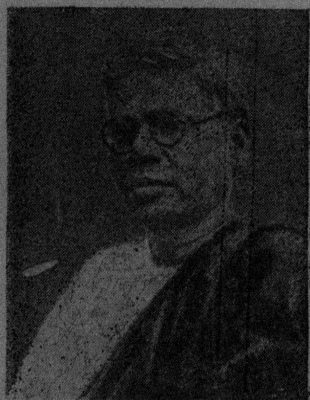
হেমচন্দ্র কানুনগো

মানবেন্দ্র নাথ রায়

মুখবন্ধ

'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' পুস্তকখানির প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হল। আরও আগে পুস্তকখানি পাঠকগণের হাতে দেওয়া সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি। এই পুস্তক রচনার ভারপ্রাপ্ত ইতিহাস সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবসন্ত কুমার দাস তথ্য সংগ্রহ কার্য্যে রত থাকা কালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হন। 'পেসমেকার' যন্ত্র সহযোগে চিকিৎসার ফলে আরোগ্য লাভ করে পুনরায় কাজ আরম্ভ করতে তাঁর অনেক সময় লেগে যায়। তথাপি ঈশ্বরের আশীর্বাদে প্রথমখণ্ড পুস্তকখানি সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য প্রস্তুতি চল্‌ছে।

মেদিনীপুরবাসী চিরদিন অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে। বৃটিশের অধীনতা পাশ ছিন্ন করার জন্য মেদিনীপুরের অগণিত নরনারী অশেষ ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছে—ধন প্রাণ তুচ্ছ ক'রে স্বরাজ সাধনায় লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান পুস্তকে তারই কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনের জন্য ইতিহাস সমিতিকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এর আর্থিক সমস্যা সমাধানের দিক থেকে সর্ব প্রধান সাহায্য এসেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (১৯৭৫) সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবকান্ত বড়ুয়া ও কমিটির অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা পূরবী মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (১৯৭৫) সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার মৈত্র ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসুর নিকট থেকে। সুলভ মূল্যে কাগজের ব্যবস্থা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কমার্স বিভাগের মন্ত্রী ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় ও টিটাগড় পেপার মিলস্ লিঃ-এর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কনক ঘোষের আনুকূল্যে। এঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস্ অধ্যাপক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদিগকে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই ইতিহাসের রচনা ও প্রকাশ কার্য্যে আমাদের সাহায্য করেছেন; তাঁদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। জীবিত ও স্বর্গতঃ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি

কলিকাতা
১লা আগষ্ট ১৯৮০
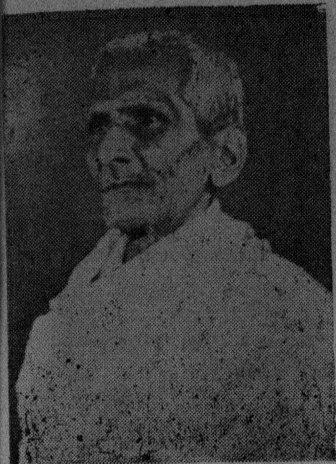
কিশোরী পতি রায়
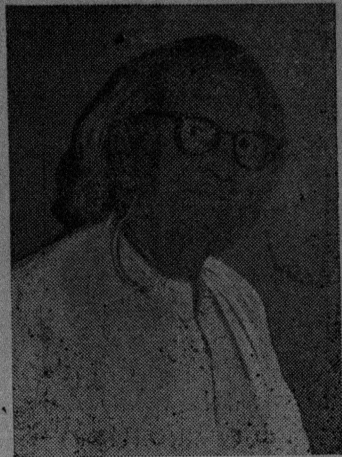
মন্মথ নাথ দাস

রাম সুন্দর সিংহ

সাতকড়ি পতি রায়
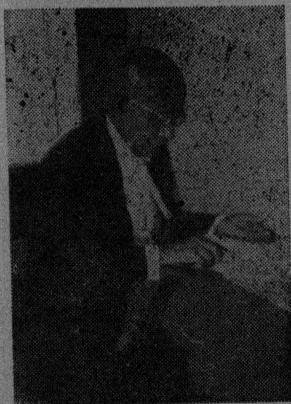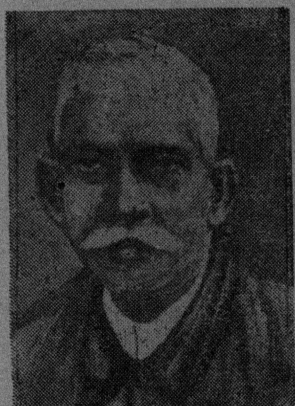
অতুল চন্দ্র বসু
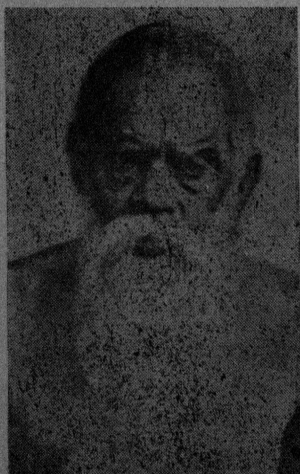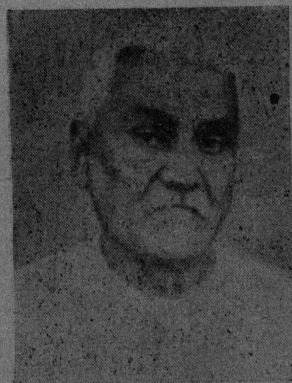
বসন্ত কুমার সরকার

নিবেদন

'মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম' সমিতির নির্দেশে জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের একখানি ইতিবৃত্ত রচনা কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে একটি অসম সাহসের কার্য্য হয়েছিল। কঠিন হৃদরোগের আক্রমণ হ'তে জীবন রক্ষা এবং বয়স ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র বিধাতার অসীম করুণার বলে। প্রথমে সেই সর্ব নিয়ন্তার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

মেদিনীপুর জেলাতে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সহিংস বিপ্লবের পথে এবং বহুব্যাপী ত্যাগ ও দুঃখের মধ্যে অহিংস গণ আন্দোলনকে অবলম্বন করে। এই উভয় ধারার সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রসারিত ছিল এই বিশাল জেলার গ্রামে-গঞ্জে, সহরে নগরে, লোকবিরল দুর্গম প্রান্তে ও জনবহুল লোকালয় ও পথে-ঘাটে। যাঁরা ছিলেন এসব ঘটনার নায়ক ও প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের অধিকাংশই এখন লোকান্তরিত এবং তাঁদের লিখিত বিবরণ একান্ত বিরল। বারংবার আইন ও অর্ডিন্যান্সের বন্ধনে সংবাদ পত্রগুলির কণ্ঠ রোধের ফলে সত্য ঘটনা প্রকাশে গুরুতর বাধা এসেছে শাসক শক্তির নিকট থেকে। সরকারী মামলা মোকদ্দমাগুলিতেও প্রায়ই ঘটনার বিকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সংগ্রামীগণের মুখপত্র স্বরূপ প্রকাশিত 'বুলেটিন'গুলি পুলিশের বাজেয়াপ্তি এবং ঘূর্ণীব্যাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস লুক্কায়িত স্থানের স্বাভাবিক অসুবিধা ইত্যাদির ফলে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবিত প্রধান কর্মীগণের মধ্যে যাঁরা পুনঃ পুনঃ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা বহু ঘটনার আনুপূর্বিক পারম্পর্য্য অনুসরণ করতে পারেননি, কাজেই তাঁদের নিকট পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এই অবস্থায় জেলার থানাগুলিতে কর্মীগণ একক বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যথেষ্ট পরিশ্রম করে যে সব বিবরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন প্রধানতঃ সেগুলিকে ভিত্তি করে এবং কয়েকটি স্থানীয় পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়ে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সকল পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে যথাস্থানে তাঁদের ঋণ স্বীকার করা হয়েছে।

'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' পুস্তকখানির এই ১ম খণ্ডে চিরসংগ্রামী
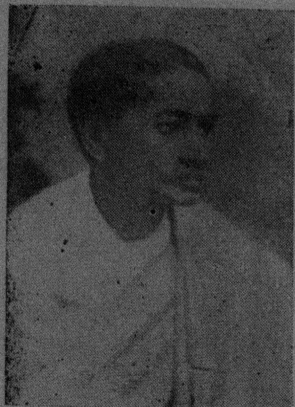
মহেন্দ্রনাথ মাইতি
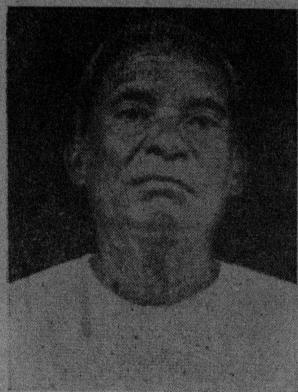
কুমার চন্দ্র জানা
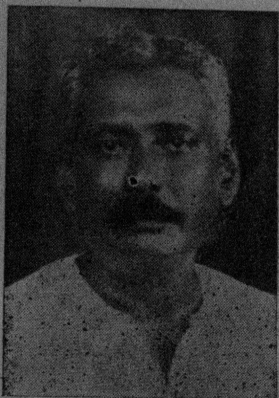
শৈলজানন্দ সেন
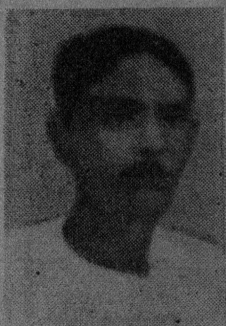
গুনধর হাজরা
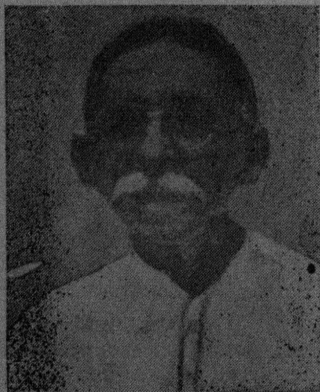
মোহিনী মোহন দাস
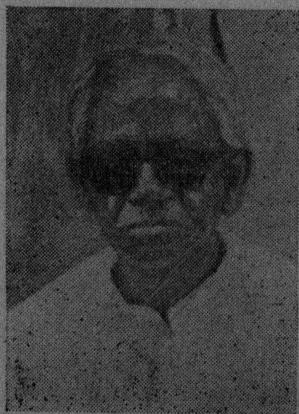
জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

মেদিনীপুরের খণ্ডবিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলাবাসীর যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রাম চলেছিল সেই থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব এবং স্বাধীনতার শপথ ও সঙ্কল্প গ্রহণ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে ব্রিটিশ শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিবরণ—যা ঘটেছিল গণ আন্দোলনের মাধ্যমে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টায় যুব-সমাজের আত্মবলিদানের কার্য্য পরাম্পরায়।

ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহের দুরূহ কার্য্যে এবং অন্যান্য বহু কার্য্যে অনেক ব্যক্তি আমাদের সমিতিকে সাহায্য করেছেন আমরা তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ!

আমরা যে আর্থিক সাহায্য লাভ করে গত পাঁচ বৎসরের অধিককাল ইতিহাস সমিতির কার্য্য পরিচালনায় সক্ষম হয়েছি সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (১৯৭৫) সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবকান্ত বড়ুয়া মহাশয়কে ও কমিটির অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় মহাশয়াকে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (১৯৭৫) সভাপতি শ্রীযুক্ত তরুণকুমার মৈত্র ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণের অর্থ সাহায্য ও উৎসাহই ইতিহাস সমিতির কার্য্যারম্ভের প্রধান সহায় ছিল। অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার কিস্কু ও প্রাক্তন লোকসভা সদস্য ডাঃ পশুপতি মণ্ডল মহাশয়গণের শ্রম ও যত্ন আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। সমিতির আজীবন সদস্যগণের তালিকা পৃথক ভাবে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ও সাধারণ সদস্যদের অর্থানুকূল্য আমাদের যথেষ্ট সাহায্যের উপায় স্বরূপ হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন প্রখ্যাত সুধীও ঐতিহাসিক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়। তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক এবং অধুনালুপ্ত 'মেদিনীবাণী' ও 'মেদিনীপুর পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ তথ্যাবলী ও তাঁর সংগৃহীত পুস্তকাবলীর সাহায্য প্রদান করে আমাদের পুস্তক রচনার কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অবসর প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর পরিমলকুমার রায়, শিবায়ন গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী অধ্যাপক নির্মল
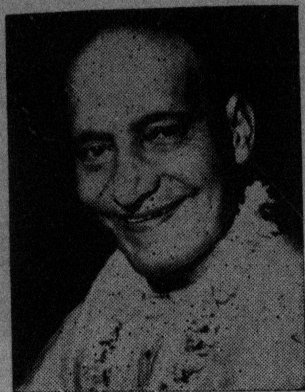
চারু চন্দ্র মোহান্তী
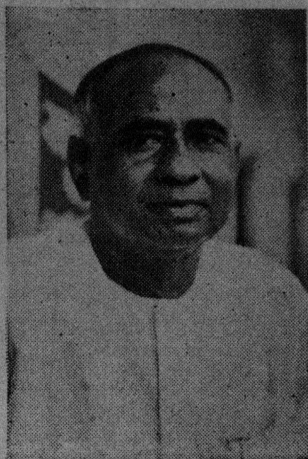
রজনীকান্ত প্রামাণিক।
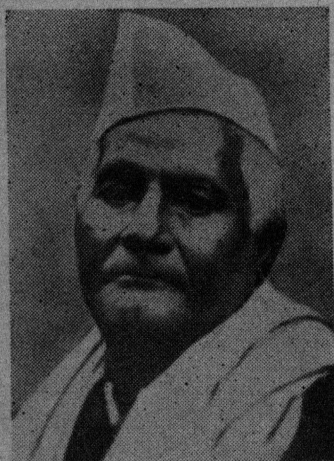
শ্রীনাথ চন্দ্র দাস
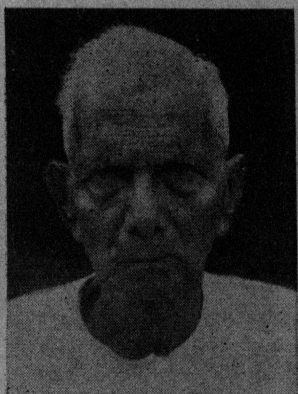
সুরেন্দ্র নাথ দাস
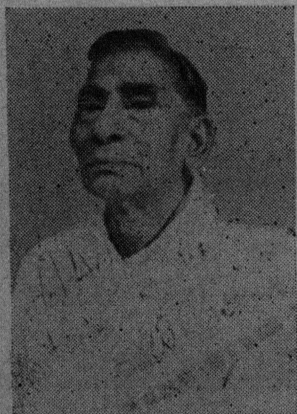
সতীশচন্দ্র সাহু
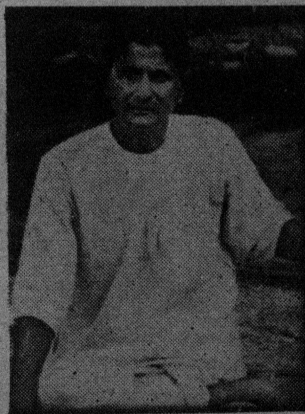
কালিপদ রায়

কুমার রায়, খড়্গপুর আই, আই, টির মানবিক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন ডেপুটি গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান সরকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মণ্ডল, সাহিত্য সেবী শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ কুমার সরকার ও অক্ষয় কুমার কয়াল, কবি শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ এই পুস্তক রচনায় নানাভাবে সাহায্য করে আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মাইতির পুস্তক সমালোচনা এবং অবসর প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র প্রমাণিক, অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, এবং প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বিশাল মহাশয়গণের সহায়তা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়।

কাঁথি 'নীহার' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তথ্যসংগ্রাহক কর্মী প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত ভূতেশ্বর পড্যা ও জেলার বিশিষ্ট সর্বোদয় কর্মী শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মাইতি মহাশয়গণকে তাঁর পত্রিকার পুরাতন ফাইলগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ দিয়ে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে প. ব. সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দাস, ডাঃ রাসবিহারী পাল এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত বলাই লাল দাসমহাপাত্র এম, এল, এ, প্রাক্তন এম এল এ স্বর্গতঃ ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান ও প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার বাঁকুড়া, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস অধিকারী ও শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন দাস, 'বাংলার হলদি ঘাট তমলুক' পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গোস্বামী ও প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কর ও মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমন চক্রবর্তী, ঘাটালের স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মাইতি, শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ মাজী ও শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মুখার্জী মহাশয়গণ আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। এঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মুরারীপুকুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী, বর্ষীয়ান বিপ্লবী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন (৯৫ বৎসর) তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ তথ্যাদির বিবরণ দিয়ে আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন এজন্য আমরা তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের কমার্স বিভাগের মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য ও টিটাগড় পেপার মিলস্-এর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কণক ঘোষ মহাশয়গণ সুলভ মূল্যে পুস্তকের মুদ্রণোপযোগী কাগজের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন এজন্য তাঁরা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর চন্দ্র মাল

নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি

বিজয় কৃষ্ণ মাইতি

হরিপদ পাহাড়ী
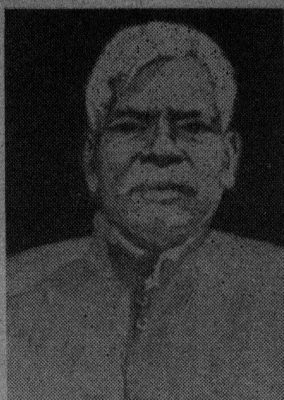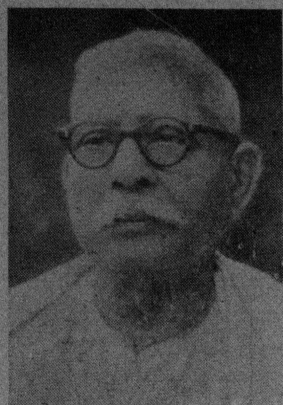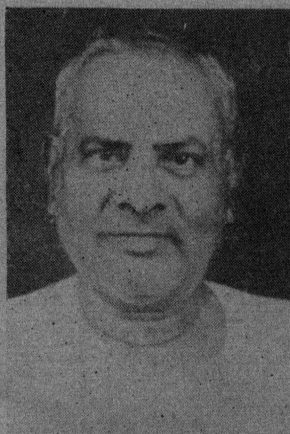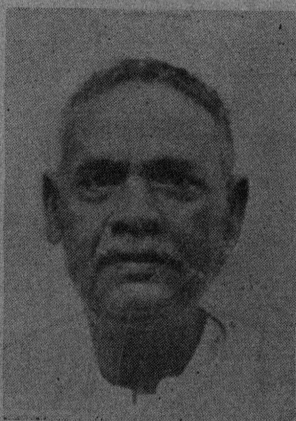
সতীশ চন্দ্র জানা

শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চন্দ্র, ডি, জি, প্রেসের সত্বাধিকারী শিল্পী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দত্ত, পঞ্চানন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কসের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দত্ত, সমিতির অফিস গৃহের ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মণ্ডল এবং বিভিন্ন কর্মের ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত বাঁশরীলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস মহাশয়গণকে তাঁদের আন্তরিক পরিশ্রম ও সহায়তার জন্ম ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জেলার ৩৩টি থানা (অধুনা ৩৯টি) থেকে যে সকল কর্মী, প্রভৃত চেষ্টায় তথ্যাবলী সংগ্রহ ক'রে দিয়ে এই পুস্তকের ভিত্তি গঠনের উপকরণ যুগিয়েছেন তাঁরা আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। যতদূর সাধ্য তাঁদের একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হ'ল :

সদর মহকুমা—সর্বশ্রী নগেন্দ্রনাথ সেন, মোহিনীমোহন পতি, বলাই চন্দ্র হাজরা (ইনি ডেবরা থানার বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রেছেন) গোপাল চন্দ্র দাসঅধিকারী, আদিত্য কুমার বাঁকুড়া, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভূঁঞ্যা, পুলিন বিহারী ভূঁঞ্যা, কেদার নাথ প্রামাণিক, বিজয় কুমার ভক্ত, হরিপদ ভৌমিক, ভীমাচরণ ঘোড়ই, ৺পুলিন বিহারী রায়, কৃষ্ণদাস রায়, পুলিন বিহারী মণ্ডল (নারায়ণগড় ও খড়্গপুর উভয় থানার বিবরণ দিয়েছেন), নটবর দলুই, বিপিন বিহারী মাইতি, বরদাকান্ত রায়, অহিভূষণ বল্লভ অধিকারী, বিষ্ণুপদ সামন্ত, ধূর্জটি কুমার চক্রবর্ত্তী, মদনমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, সরোজ রঞ্জন রায়, রামগতি মুখার্জি, পাঁচকড়ি মুখার্জী, শিবসুন্দর চৌধুরী, অনিল কুমার হাজরা, বাসুদেব দাস, ৺ফণীভূষণ খান, বঙ্কিমচন্দ্র খাঁন, প্রদীপ কুমার খাঁন, সন্তোষকুমার খাঁন, গোবিন্দ কুমার সিংহ, ফণীন্দ্রনাথ সিংহ, সুশীল কুমার রায়, পঞ্চানন সিংহরায়, পীযুষকান্তি রায়, কানাইলাল কুণ্ডু, অরবিন্দ সরকার, নলিনীরঞ্জন সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় জানা, ৺সুরেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ মাইতি, যোগেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, বৈকুণ্ঠ নাথ দাস, দেবেন্দ্র নাথ দাস, রাধারমণ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ দাস, শশধর পাল, সুকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, ফনীভূষণ কুণ্ডু, ফণীভূষণ দাস, ৺বঙ্কিম বিহারী পাল, ভূপতি ভূষণ মণ্ডল, ৺গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধীর ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্র নাথ বসু, সনাতন রায়, সতীশচন্দ্র মল্লিক।

ঝাড়গ্রাম মহকুমা—সর্বশ্রী বিহারীলাল পড়্যা, ধনঞ্জয় কর, গোপীনাথ পতি, বিষ্ণুপদ হাজরা, ৺সুরেন্দ্র নাথ মাহাত, মহেন্দ্র নাথ মাহাত, ৺রমেশ চন্দ্র কুণ্ডর, রাজেন্দ্রনাথ সৎপতি, ফনীন্দ্রনাথ আচার্য্য, সুধীর চন্দ্র মহাপাত্র, শত্রুঘ্ন পতি,
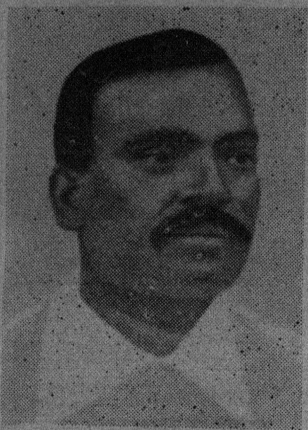
জগদীশচন্দ্র মাইতি
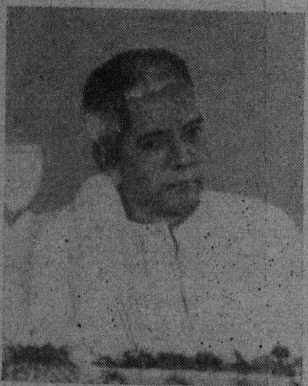
রঘুনাথ মাইতি
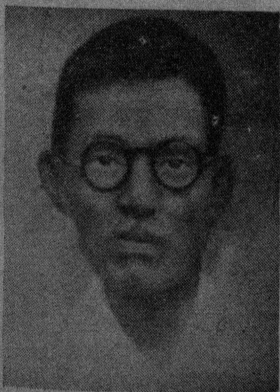
রাজেন্দ্রনাথ ভূঁঞ্যা

সতীশচন্দ্র দাস অধিকারী

কাঙাল চাঁদ গিরি
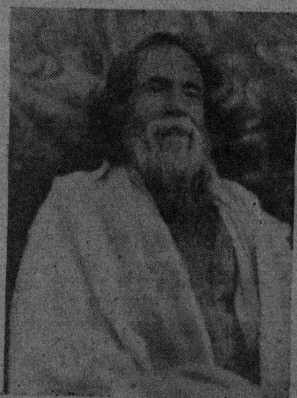
অঘোরচন্দ্র দাস

রামচন্দ্র মাহাত, গোলকবিহারী পতি, মৃগাঙ্ক ঘোষ, রাধানাথ পতি, অমরেন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণপদ মজুমদার, হরিপদ বারিক, বগলারঞ্জন আচার্য্য, রামশঙ্কর গোস্বামী, গোষ্ঠ বিহারী মাহাত, ধরনীধর দাস, শশীভূষণ পাণ্ডে।

ঘাটাল মহকুমা—সর্বশ্রী অরবিন্দ মাইতি, ভূপতি চরণ মাজী, সত্যগোপাল মুখার্জী, স্বামী চিন্ময়ানন্দ সরস্বতী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, রামমনোহর সিংহ, কানাই লাল হাজরা, কিশোরী মোহন গোস্বামী. প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায়।

তমলুক মহকুমা—সর্বশ্রী নীলমণি হাজরা, হংসধ্বজ মাইতি, রমেশচন্দ্র কর, অনঙ্গ মোহন দাস, শ্রীধর চন্দ্র সামন্ত, ৺শ্রীপতি চরণ বয়াল, ভবতোষ দাস, গুণধর ভৌমিক, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, অসিতবরণ সামন্ত, নির্মল কুমার মাইতি, জগদীশ প্রসাদ গৌরী, কনক ভূষণ মাইতি, ললিত কুমার ধাড়া, গোপীনন্দন গোস্বামী, বিরাজ মোহন দাস, দেবেন্দ্রনাথ কর, বঙ্কিম ব্রহ্মচারী, (ইনি সুতাহাটার বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন, বিল্বপদ জানা, হরিহর দেব, সুধাংশু শেখর ভূঁঞ্যা, বলরাম দাস, কৃষ্ণপদ বেরা, পরমেশ্বর মাইতি, বঙ্গভূষণ ভক্ত, ৺সতীশচন্দ্র সাহু, কৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র, ভাগবত চন্দ্র প্রধান।

কাঁথি মহকুমা—সর্বশ্রী ভূতেশ্বর পড়্যা, রাসবিহারী পাল, সুধীরচন্দ্র দাস, গিরিশ চন্দ্র রাণা, ৺শ্রীনিবাস মিদ্যা, ৺কাঙ্গাল চাঁদ গিরি, ৺পুলিন বিহারী পাল, ধনঞ্জয় রায়, ঝাড়েশ্বর দাস, জ্ঞানদাচরণ মাইতি, প্রতাপ চন্দ্র শাসমল, গোবিন্দ মাইতি, নরেন্দ্রনাথ মান্না, শরৎচন্দ্র মান্না, পশুপতি মণ্ডল, অবিনাশ চন্দ্র মাইতি, ৺মৃত্যুঞ্জয় ভূঞ্যা, শরৎচন্দ্র দাস, ৺নগেন্দ্রনাথ দাস, সতীশচন্দ্র মাইতি (বাদলপুর) ঈশ্বর চন্দ্র বেরা, বলাইলাল দাস মহাপাত্র, শ্রীনাথ চন্দ্র মাইতি, সিতাংশু শেখর নন্দ, রাধাগোবিন্দ বিশাল, ডাঃ জীবনকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র, জ্ঞানদাকান্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমার জানা, সর্বেশ্বর পণ্ডা, ৺দিগম্বর পণ্ডা. রাখাল চন্দ্র মাইতি, নরেন্দ্রনাথ মাইতি, অমূল্য কুমার দাস, বসন্ত কুমার সাহু, বঙ্কিম চন্দ্র দাস (ইনি গগরা থানার বিবরণ প্রকাশ করেছেন) বঙ্কিম চন্দ্র নায়ক, গিরিজাকান্ত মহাপাত্র, নবীন মহাপাত্র, হৃষিকেশ চক্রবর্তী, জীবন কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পরেশ চন্দ্র দাস, শ্রীকান্ত কুমার খাঁড়া, শশিশেখর মণ্ডল, প্রসন্ন কুমার ত্রিপাঠী, শ্যামাচরণ বেরা, রাধানাথ দাস অধিকারী, ৺কালীপদ রায় মহাপাত্র, আশুতোষ রায়চৌধুরী, গোপীকান্ত ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ পট্টনায়ক, সুরেন্দ্র নাথ সাঁতরা, তারাপদ চক্রবর্তী, রাখাল চন্দ্র সাঁতরা, সজনীকান্ত সাঁতরা, ভীমাচরণ পাত্র, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, হৃষিকেশ গায়েন (ইনি ভগবানপুর থানার বিবরণ প্রকাশ ক'রেছেন), দেবেন্দ্র

মহেন্দ্র নাথ করণ

মণীন্দ্র নাথ মণ্ডল

শশীভূষণ ভৌমিক

দাশরথি পণ্ডা
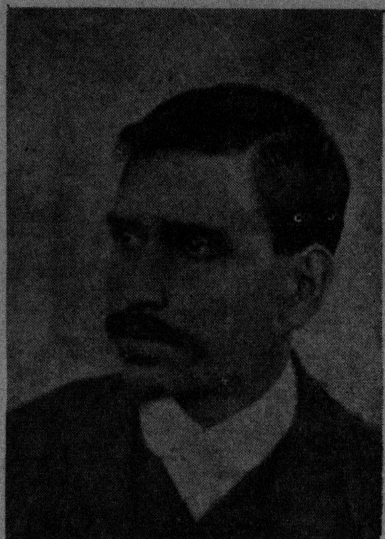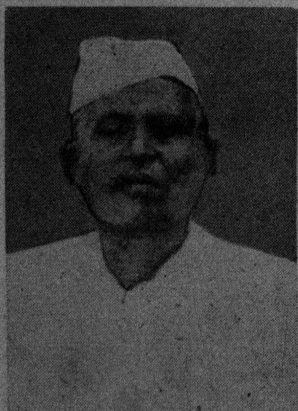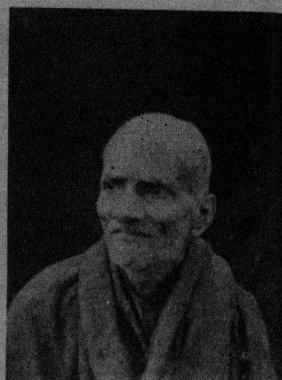
কাশীনাথ মাইতি
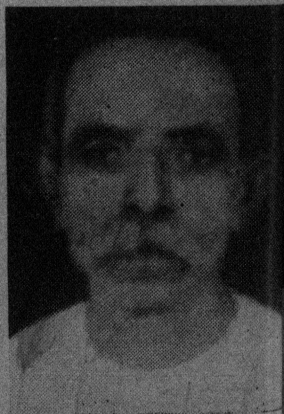
বিপিন বিহারী অধিকারী

নাথ মাইতি, নগেন্দ্র নাথ বেরা, ৺অশ্বিনী কুমার মাইতি, রজনীকান্ত প্রধান, ভূপেন্দ্রনাথ মাইতি, সতীশচন্দ্র গিরি, ৺বিপিন বিহারী গায়েন, ৺পীতবাস দাস, প্রিয়নাথ পাণ্ডা, অমরেন্দ্র নাথ মাইতি, সর্বেশ্বর মাইতি, সুরেন্দ্র নারায়ণ ভূঞ্যা, ঈশ্বর চন্দ্র প্রামাণিক, উপেন্দ্রনাথ প্রধান, পঞ্চানন প্রধান, গোপাল চন্দ্র জানা পঞ্চানন জানা পূর্ণেন্দুশেখর ভৌমিক, বিভূতিভূষণ মাইতি, ভূপেন্দ্রনাথ মাইতি, উপেন্দ্রনাথ জানা, ফণীভূষণ মাইতি, প্রভাত কুমার মাইতি, বসন্তকুমার মাইতি, শীতলপ্রসাদ হাজরা পুলিন বিহারী সেন, ৺ভাগবত চন্দ্র গিরি, নগেন্দ্রনাথ গিরি, ৺বিভূতিভূষণ দিণ্ডা ৺অমৃতলাল দাস, ৺বিপিনবিহারী মাইতি, যামিনীকান্ত পাহাড়ী, পূর্ণচন্দ্র মিশ্র, দিলীপ কুমার মাইতি, তড়িৎ কুমার খাটুয়া, কোহিনুর কান্তি করণ।

এই পুস্তকে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হ'য়েছে, যে সব বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীগণের প্রতিকৃতি এবং যে সকল বিভিন্ন বিষয়েব তালিকা দেওয়া হ'য়েছে সে গুলির পরিপূবক ঘটনা ও প্রতিকৃতি ও তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন হ'লে ২য় খণ্ড পুস্তকে তা দেওয়া হবে। বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এবং বিলম্বে প্রাপ্ত ফটোগুলিও দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোগ করার ইচ্ছা রইলো।

পরিশেষে আমি পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য মার্জনা চাই। ইতিহাস সমিতির সর্বপ্রকার সহায়তা সত্বেও এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনে আমার শক্তির অভাব ঘটে থাকলে তাঁরা যেন তা ক্ষমার চক্ষে দেখেন।

কলিকাতা
১লা আগষ্ট, ১৯৮০

শ্রীবসন্ত কুমার দাশ
সাধারণ সম্পাদক
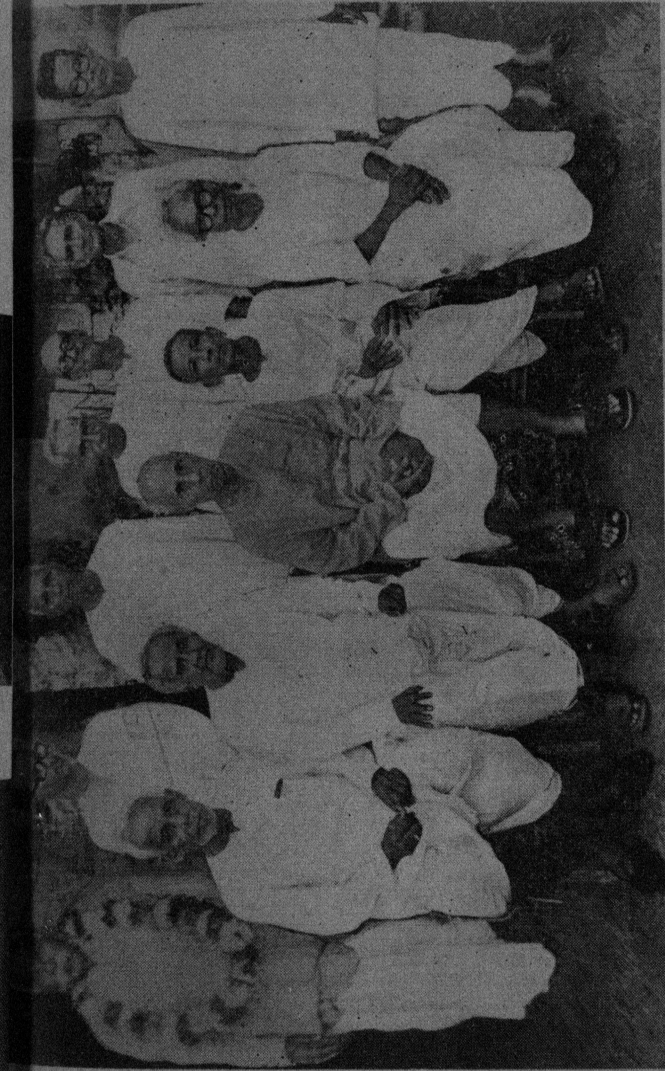
ইতিহাস সমিতির কর্মপরিষদের সদস্য ও কর্মীগণ

দণ্ডায়মান : বাম হইতে দক্ষিণে সর্বশ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অনিলকুমার দত্ত, (শিল্পী) অরবিন্দ মাইতি, বসন্তকুমার দাস, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্মী), বাঁশরী লাল দত্ত, অবিনাশ চন্দ্র মণ্ডল (কর্মী), উপবিষ্ট : সর্বশ্রী আদিত্য কুমার বাঁকুড়া, রাস বিহারী রায়, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ভূপতি চরণ মাজি, গোপীনন্দন গোস্বামী।
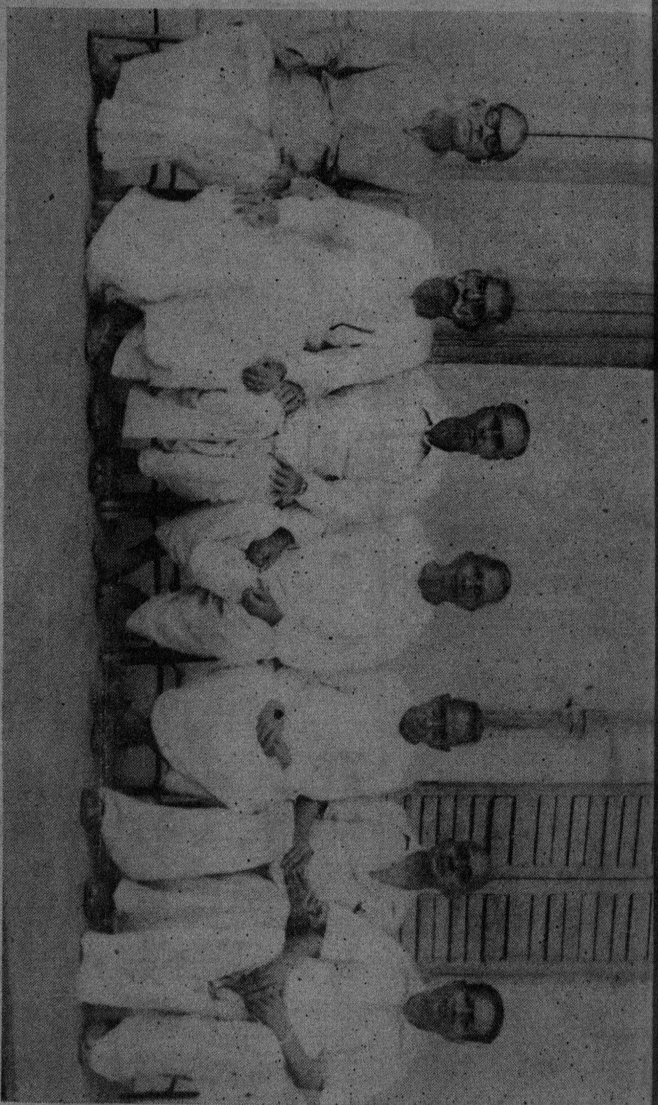
ইতিহাস সমিতির কর্মপরিষদের সদস্যগণ

বাম হইতে দক্ষিণে সর্বশ্রী রাধারমণ চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রায়, পঞ্চানন সিংহরায়, অরবিন্দ মাইতি, বসন্তকুমার দাস, নরেন্দ্র নাথ দাস, বিরাজ মোহন দাস।

ভূমিকা

এ বই খানার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখবার জন্য আমাকে অনুরোধ ক'রেছেন একদা কাঁথির জননায়ক, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীবসন্ত কুমার দাস মশায়। বইটির অনুপ্রেরণা ও যোজনা, রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, অর্থাৎ বসন্তবাবু স্বয়ং, শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন, এঁরা সকলেই আমার গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। জীবনের একটি পর্বে আমি এঁদের অনুযাত্রী ছিলাম, একটি পরমতীর্থের উদ্দেশে। আজ এঁরা সকলেই প্রায় বৃদ্ধ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য ; অথচ এঁদেরই উদ্যম ও উৎসাহ, একাগ্রনিষ্ঠা ও সাগ্রহ চেষ্টার ফলে এ গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ সম্ভব হ'লো। আমি এঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধিত সাধুবাদ জানাই।

গ্রন্থটির বারোটি অধ্যায়ের শেষ ছ'টিতে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকার যে-বিবরণ বিধৃত তার নায়ক তো ছিলেন এঁরাই এবং এঁদেরই অগণিত বন্ধু বান্ধব ও স্বজন পরিজন-সহকর্মীরা যাঁদের অনেকেই আজ আর ইহলোকে নেই। আমার সৌভাগ্য, মৃত ও জীবিত এঁদের অনেকের সঙ্গেই এককালে আমার যোগাযোগ ছিল। এক'টি অধ্যায়ে মেদিনীপুরের যে উজ্জীবন উদ্ঘাটিত, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করে এনেছেন এঁরাই যাঁরা এই বিস্ময়কর জন-উজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। যতটা সম্ভব নিজেদের আড়ালে রেখে, স্বচ্ছ সততায়, বর্ণলেপহীন বর্ণনায়, আবেগ বিহীন কথকের নিরুত্তাপ ভাষায় এই উজ্জীবনের কথা এঁরা বলেছেন। মাটির কাছাকাছি জীবনের ইতিহাসে যারা বিশ্বাসী, আশাকরি তাদের কাছে এ ইতিহাস গ্রাহ্যতর বলে মনে হবে।

কিন্তু এ-গ্রন্থ শুধু কংগ্রেসের গান্ধীপর্বের এবং গান্ধীজী-প্রবর্তিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকার বর্ণনামাত্র নয়। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় মেদিনীপুরের মাটি ও মানুষ নিয়ে। তারপর পর পর

পাঁচটি অধ্যায়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের খণ্ড বিদ্রোহের কথা, জাতীয়তার উন্মেষ, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের কথা, বিপ্লবী গুপ্তসমিতির কথা, বীর বিপ্লবী নায়কদের সংগ্রাম ও আত্মদানের ইতিহাস, বোমার মামলার কথা ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে একই ধরণের নিরুত্তাপ ভাষায়। এ ক্ষেত্রেও যতটা সম্ভব সমস্ত সাক্ষ্য আহরণকরা হয়েছে সরকারী দলিল পত্র থেকেই, কিছুটা স্থানীয় কাগজ পত্র থেকে এবং ব্যক্তিগত সাক্ষ্য থেকেও। অর্থাৎ, সজ্ঞানে ঐতিহাসিক সততার পথ থেকে যাতে তাঁরা বিচ্যুত না হ'ন সেদিকে সংকলকদের দৃষ্টি সজাগ।

শ্রদ্ধেয় বসন্ত বাবু, সতীশ বাবু, অজয় বাবুরা একটি মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন এই গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশ করে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কৃতজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করবেন, সন্দেহ নেই। কাঁথি-তমলুকের গান্ধীপর্বীয় জন-জাগরণের এবং গণ-সংগ্রামের ঐতিহ্য হয়তো অনেক অঞ্চলেই নেই, কিন্তু সাধারণ ভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নানা উল্লেখ্য ভূমিকা অনেক অঞ্চলেরই আছে। সে সব অঞ্চলকে এ-ধরণের ইতিবৃত্ত-কথা সংগ্রহে কি একটু উদ্যোগী করা যায় না?

কলকাতা
৮ জুন, ১৯৮০

নীহার রঞ্জন রায়

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

মেদিনীপুর পরিচিতি

মাটী ও মানুষ

মেদিনীপুরের মাটিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়েছিলো। সে সংগ্রামের সৈনিক ছিলেন মেদিনীপুরের নরনারী—পল্লীবাসী, নগরবাসী জনগণ।

সেই মেদিনীপুর কোথায়, কি তার আকৃতি-প্রকৃতি, কি তার শোভাসম্পদ? যারা তার ফলে জলে মানুষ হ'য়েছিলো, তারাই বা কারা? যুগে যুগে তারা কী জীবন বহন ক'রে চলেছে? কোন 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা' অনুসরণ ক'রে তারা মানুষরূপে প্রতিভাত হ'য়েছে! কখনো তারা প্রকৃতির রুদ্ররোষে পর্যুদস্ত হ'য়েছে, কখনো আক্রমণকারীর তরবারির আঘাতে তাদের বুকের রক্ত ঝ'রে পড়েছে, কখনো তারা দাঁড়িয়েছে প্রকৃতির ভয়ঙ্করী মূর্তিকে উপেক্ষা ক'রে। কখনো বা তাদের একতাশক্তি জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কারা ছিলেন তাদের মধ্যে শক্তিমান জীবনের আধার, কারা দিয়েছিলেন তাদের বাঁচার ও মরার এবং অবশেষে জয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার নেতৃত্ব, কারা এনে দিয়েছিলেন তাদের জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ী সম্পদ? কাদের কীর্তি ভাস্বর হ'য়ে র'য়েছে মঠে মন্দিরে, মস্‌জিদে গীর্জায়, কাদের নাম স্মরণীয় হ'য়ে র'য়েছে বিদ্যার গৌরবে ও চরিত্রের সৌরভে—কারা বরণীয় হ'য়ে র'য়েছেন দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনের জন্য বীর যোদ্ধারূপে!

আজ পরিচয় নিতে হবে মেদিনীপুরের সেই মাটির ও সেই মানুষের—স্মরণ করতে হবে তাদের মরণজয়ী সঙ্কল্পের কথা, নিরলস

কর্মসাধনার কথা, দুঃখ ও ত্যাগবরণের মহনীয় কাহিনী—অবশেষে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র বুকে নিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতির অপূর্ব অবদান !

জেলার নামের উৎপত্তি ও জেলা গঠন

মেদিনীপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি প্রাচীন পুঁথি থেকে যে শ্লোকটি পান তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ "উড়িষ্যার শাসক প্রাণকর নামে নৃপতি যাঁহার মহানপুত্র মেদিনীকর 'মেদিনীকোষ' নামে গ্রন্থ প্রণেতা, উড়িষ্যা ছেড়ে মেদিনীপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন।" তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে এই স্থানের নাম মেদিনীপুর হয়।

অপর একটি মতে মেদিনীমল্ল রায় নামে উড়িষ্যার প্রতাপশালী রাজা ১৫২৪ খৃঃ অব্দে বিস্তীর্ণ অংশ জয় করে মেদিনীবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত জেলা। জেলার দক্ষিণ সীমানা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গোপসাগর বিধৌত। ইহার পশ্চিমে উড়িষ্যার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং বিহারের মানভুম ও সিংভূম জেলা। উত্তরে বাঁকুড়া জেলার ও বর্ধমান জেলার সীমানা এবং পূর্বে হুগলী জেলার সীমানা এবং রূপনারায়ণ ও হুগলী নদী। কতকটা আয়তক্ষেত্রের ন্যায় এই জেলাটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৯০ মাইল বা ১৪০ কি.মি. লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে অল্প কিছু কম। জেলার আয়তন ১৩,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার। এটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। এই জেলা বর্তমান আকারে পরিণত হওয়ার পূর্বে জেলাতে বহু প্রকারের পরিবর্তন ঘটেছে।

মেদিনীপুর এক সময়ে অনেকাংশে উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। উড়িষ্যা মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে এলে মেদিনীপুরের অধিকাংশ এলাকা 'সরকার জলেশ্বর'এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। 'সরকার জলেশ্বরে'র অধীনে ছিল ২০টি মহাল। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল

সরকার মান্দারণের ৪টি মহাল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাশিম 'মেদিনীপুর' জেলা "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে" ইজারা বন্দোবস্ত দিলে 'চাকলা মেদিনীপুর' গঠিত হয়। তার অধীনে ছিল ৫৪টি পরগণা।

এই ৫৪টি পরগণার মধ্যে ৮টি পরগণা পরবর্তী বাঁকুড়া ও বালেশ্বর (উড়িষ্যা)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেকগুলিই আবার উড়িষ্যার অন্তর্গত মহারাষ্ট্রীয়দের অধীনস্থ ছিল।

সম্রাট শাজাহানের আমলে ২৮টি মহাল নিয়ে 'চাকলা হিজলী' গঠিত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে চাকলা হিজলীতে ৩৫টি মহাল ছিল। পরবর্তীকালে ৬টি মহাল মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত হয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানী পেয়েছিলেন মোগল দরবার থেকে। এই দেওয়ানী প্রাপ্তির ফলে 'চাকলা হিজলী'ও ইংরাজের অধিকারে আসে। তৎকালে ৩২টি পরগণা চাকলা হিজলীর অন্তর্গত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই ৩২টি পরগণা মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৭৬৫—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত পরগণাগুলির কিছু কিছু সংযোজন ও বিয়োজন ঘটে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরগণা বিভাগ রহিত করা হয়। চাকলা মেদিনীপুরের ৪২টি পরগণা, চাকলা হিজলির অন্তর্গত বর্তমান কাঁথি ও তমলুক মহকুমা নামে পরিচিত ভূখণ্ড এবং চাকলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বর্তমান ঘাটাল নামে পরিচিত ভূখণ্ড একত্র করে ১০০টি পরগণা নিয়ে মেদিনীপুর জেলা গঠিত হয়। পুনর্গঠিত জেলাটি ১৮৭২ খৃঃ অঃ থেকে একই প্রকার রয়েছে। জেলার লোক সংখ্যা ৫৫,০৯,২৪৭।*

* Census of India 1971 & District Statistical Handbook, Midnapore 1971 & 1972 Combined.

জেলার মহকুমা ও থানাগুলির নাম নিম্নরূপ ঃ

থানার সংখ্যা মোট ৩৯।

মহকুমা—সদর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম।

থানা—সদর মহকুমার অন্তর্গত ঃ মেদিনীপুর, শালবনী, কেশপুর, গড়বেতা, ডেবরা, সবং, পিংলা, খড়্গপুর (local), খড়্গপুর, (town) নারায়ণগড়, দাঁতন, মোহনপুর, কেশিয়াড়ি, গোয়ালতোড়।

কাঁথির অন্তর্গত ঃ কাঁথি, খেজুরি, ভগবানপুর, রামনগর, পটাশপুর, এগরা, দীঘা।

তমলুকের অন্তর্গত ঃ তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়না, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, হলদিয়া, দুর্গাচক।

ঘাটালের অন্তর্গত ঃ ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোণা।

ঝাড়গ্রামের অন্তর্গত ঃ ঝাড়গ্রাম, জামবণী, বিনপুর, গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম।

জেলার কৃষি ও শিল্প

জেলার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভাগে গড়বেতা থানা ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার মাটি পাথুরে ও শক্ত (ল্যাটারাইটসয়েল) ; দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব অংশের কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার মাটি নোনা—এঁটেল, এঁটেল—বেলে, দোআঁশ ইত্যাদি রকমের এবং মধ্যবর্তী সদর মহকুমার থানাগুলিতে অধিকাংশ এঁটেল ও দোআঁশ মাটি দেখা যায়। এঁটেল ও দোআঁশ মাটিযুক্ত থানাগুলি ধান ও সব্জিচাষের বিশেষ উপযোগী। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ অধিকাংশই কৃষিনির্ভর জীবন যাপন করে। বস্তুতঃ সমগ্র মেদিনীপুর জেলাতে মানুষের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ কৃষির সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনও ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল।

এই জেলার প্রধান শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল মূলতঃ কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর নির্ভর করে। চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর,

রাধানগর, নিমপুর, অমর্শি প্রভৃতি স্থানের বস্ত্রশিল্প কৃষিজ তুলা থেকে প্রস্তুত সুতা বুনে চলত এবং কেশিয়াড়ি, আনন্দপুর, খড়ার প্রভৃতি স্থানে তসর, কেটে বা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য যে তন্তু ব্যবহৃত হ'ত তা উৎপাদনকারী কীটের জীবন নির্ভর করত তুঁত বৃক্ষের উপর। চিনি ও মিছরি শিল্পের উৎপাদনও ছিল কৃষিজাত; ধান, পাট, তুলা, আখ কাঠ প্রভৃতি কৃষিজ পণ্যই জেলার অধিবাসীগণের সমগ্র আর্থিক জীবনের ভিত্তি গঠন করেছিল, কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প এই জেলাতে স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ জীবনযাত্রার আধার ছিল। জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২ জন কৃষিকার্যে, ৭ জন কুটিরশিল্পে, ৫ জন ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং ৬ জন অন্যান্য উপায়ে জীবিকা অর্জন করত।

ইংরাজ শাসনের কালে বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পকে নানাভাবে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল এই জেলার শিল্পীগণ তারই শিকার হয়ে ক্রমে অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। তারই ফলে এই জেলার অসংখ্য গ্রামের সুখ, সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়েছে এবং গ্রামগুলি আর্থিক দুর্দশাতে নির্জীব হয়ে পড়েছে। চন্দ্রকোণা, কেশিয়াড়ি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পপ্রধান স্থান ম্যালেরিয়ার আক্রমণে উজাড় হয়ে গেছে।

এখনও মেদিনীপুর জেলাতে উৎপন্ন হয় বিবিধ প্রকার ধান, পাট, পান, আলু, আখ, সরিষা, মুগ, খেসারি, নারিকেল, কাজুবাদাম ইত্যাদি। এখানকার ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতের কাপড়, লবণ, মাদুর, শিংএর চিরুণি, শাঁখা ও শঙ্খ জাত বিভিন্ন দ্রব্য, পিতল কাঁসার বাসন, মাটির পুতুল ও হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি, খেজুর গুড়, তাল গুড় ও আখের গুড়, কাজু (শাঁস), শুটকি মাছ প্রস্তুত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি কিছু বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছে। হলদিয়া বন্দর ও হলদিয়া শিল্পাঞ্চল তমলুক মহকুমার হুগলী নদী তীরবর্তী অংশে স্থাপিত হয়েছে। তৈল শোধন (পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স), সার প্রস্তুত (ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন), জাহাজ মেরামত প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বৃহৎ আয়োজনগুলি কেবল জেলা বা প্রদেশ স্তরে নয় সমগ্র ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধির পরিপুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়েছে।

ক্রমে আরও আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইহার অধিকতর পরিপুষ্টি সাধিত হবে এবং ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও শিল্পাঞ্চলরূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। এখানে নানা প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে।

খড়্গপুরের রেলওয়ে কারখানাটি থেকে রেল সংক্রান্ত বহু যন্ত্রাংশ প্রস্তুত হয়ে আসছে। এটি ভারতীয় রেলওয়ে সংস্থার অন্যতম বৃহৎ কারখানা।

কোলাঘাটে একটি বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে।

কাঁথির জুনপুটে ও রামনগরের আলমপুরে মৎস্যচাষ প্রকল্প, এবং দীঘার নিকটবর্তী সমুদ্রে মৎস্য ধরার প্রকল্পগুলি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার সুতী ও রেশমবস্ত্র, পিতল কাঁসার বাসন, দুগ্ধজাত ভোগ্য দ্রব্য প্রভৃতির খ্যাতি সুদূরপ্রসারী ছিল। কাঁথি মহকুমার দুবদা, খড়িগেড়িয়া প্রভৃতি স্থানের এবং সদর মহকুমার সবং ও দশগ্রামের বিভিন্ন প্রকারের মোটা ও মিহি মাদুর, কাঁথি এবং তমলুকের পান, কাঁথির লবণ, কাজু বাদাম, নারিকেল, শুটকী মাছ, চন্দনপুর, চাঁদলেদা, পাঁচরোল, পটাশপুরের কাঁসা পিতলের বাসন, সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার শাল ইত্যাদি বৃক্ষজাত কাঠ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেলার অধিবাসীগণ নূতন নূতন উদ্যোগের জন্য আগ্রহী এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবিকা সংস্থানের উপযোগী শিল্প বাণিজ্যের সন্ধানে উৎসুক কিন্তু জেলার শতকরা দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেচ, সার ও বীজ সরবরাহের নিমিত্ত যথেষ্ট সংখ্যক প্রকল্পের ব্যবস্থা না হওয়ায় কৃষিকার্যের উন্নতি অত্যন্ত ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে দুধ ও মাছের দুষ্প্রাপ্যতা রোধের যথেষ্ট ব্যবস্থা না হওয়ায় পুষ্টির অভাব জেলাবাসীগণের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ হয়েছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

মেদিনীপুরের ন্যায় বৃহৎ এবং নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় কবলিত জেলাতে একটি মাত্র ব্যাপক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার স্বাভাবিক সুযোগ

ছিল না। রাজনৈতিক বিভাগগুলির বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এক এক অংশে এক এক প্রকার শাসনের অধীনে জনগণের জীবনধারণ তাদের বিচিত্র ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির কারণ হয়েছে। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের দীর্ঘকালব্যাপী বিশেষ সামাজিক প্রভাব জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিশেষ একটি রূপ দিয়েছিল। এই সংস্কৃতি বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল। চীন জাপান ও ভূমধ্য সাগর সংলগ্ন কতকগুলি দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে। বঙ্গের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র তাম্রলিপ্ত তার সমৃদ্ধ রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে এই দেশগুলির সহিত যুক্ত ছিল এবং সেই কারণে এইগুলির সঙ্গে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও সংযোগ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে ঐ সভ্যতা অধিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং ইংরাজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী জাতির প্রাধান্য ও বিজিতের দৈন্য প্রকাশ পেতে থাকে।

তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির যুগে জৈন তীর্থংকরেরা জৈন ধর্ম প্রচার করে এই জেলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিলেন।

পাল রাজত্বের অবসানে এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রভাব পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। বিজয়ী উড়িষ্যা রাজাগণের প্রভাবে জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম অংশে জনজীবনের বহু ক্ষেত্রে উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আচার বিচার প্রচলিত হয়েছিল। মেদিনীপুরের সহিত উড়িষ্যার শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের পরিচয় এখনও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়।

মুসলিম রাজত্বের যুগে ইসলাম প্রভাব এই জেলার অনেকাংশে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায়। রাজপুত মহাজন শ্রেণী, এবং মুসলমান, রাজপুত ও শিখ সৈন্যগণ জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে গুরুতর প্রয়াস করেছিল তার ফলও নিতান্ত সামান্য হয়নি। এইরূপে একটি সংমিশ্রিত সংস্কৃতি ইংরাজ প্রভুত্বের পূর্বাবস্থা পর্য্যন্ত এই জেলার বহুলাংশে বিস্তৃত হয়েছিল। মেদিনীপুরের উত্তরে বাঁকুড়া জেলার

অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমায় অবস্থিত বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি জেলার উত্তর ভাগকে প্রভাবিত করেছিল।

জেলার পূর্বভাগ এবং আংশিকভাবে উত্তর ভাগ হুগলী ও হাওড়া জেলার সহিত যুক্ত। এজন্য রাঢ়ীয় সংস্কৃতির প্রভাব এই অঞ্চলে প্রবল।

মেদিনীপুরের পূর্ব হতে পশ্চিমে অথবা উত্তর হতে দক্ষিণে বৈচিত্র্য-পূর্ণ সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন এই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ও সামাজিক ব্যবহারকে লোপ করে দিতে পারেনি। কৃষি-নির্ভর গ্রামবাসীগণ মূলতঃ এক মিশ্রিত সাংস্কৃতিক জীবন বহন করে চলেছে। অঞ্চলভেদে ও মানবিক গোষ্ঠী ভেদে এক এক প্রকার আচার বিচারে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিমাণ ও মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তনের তরঙ্গে দেশকে প্লাবিত করতে করতে নবদ্বীপ হতে মেদিনীপুরের পথে নীলাচলে গমন করেছিলেন। তাঁর প্রেমধর্মের প্লাবনে জেলার বহু অংশ উদ্বেলিত হয়েছিল। তাঁর নীলাচলের প্রেমোন্মাদ উদ্ভাসিত জীবনের ভাবোচ্ছ্বাস উড়িষ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হ'য়ে মেদিনীপুর জেলাতে গভীর ভাবে পরিব্যপ্ত হয়েছিল। জেলার অধিবাসীগণের সহজ সরল গ্রামীন জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রচারিত প্রেম ধর্মের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব জেলার জনগণের প্রাতাহিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট দেখা যায়।

ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিক্ষা, ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক আচার-বিচার প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। নাগরিক ও গ্রামীন জীবনে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি মানসে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত বহুভাবে কখনও উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং কখনও কখনও বাহ্যিক অসার বস্তুগুলি ভারতীয় সাধনার মূল ভিত্তিকে শিথিল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তথাপি এই জেলার জনজীবনে যে এক বহু প্রাচীন দৃঢ়-মূল সংস্কৃতি ছিল তার ধ্বংসসাধন করতে সক্ষম হয়নি।

এই জেলাতে যে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা প্রচলিত আছে সেই-গুলি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। বিশেষ বিশেষ আপদ বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতা পূজার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

আদিবাসী অঞ্চলে 'বড়াম' পূজা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে শীতলা, বরুণ ও ভৈরব পূজা বহু প্রচলিত। বনদেবীর পূজা, চণ্ডীর পূজা, কৃষি কার্যের আরম্ভে দেবতার করুণা ভিক্ষার জন্য পূজার অনুষ্ঠান হয়। মেদিনীপুরের উত্তরাংশে ধর্ম্মপূজার আধিক্য দেখা যায়। সমগ্র জেলাতে গ্রামে গ্রামে গ্রাম-দেব-দেবীর পূজা বার্ষিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শীতলা, মনসা, কালী অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। শিবের ব্রত ও শিবের গাজন খুব জনপ্রিয়। এই পূজাগুলির উপলক্ষ্যে গ্রাম অঞ্চলে উৎসবের সাড়া পড়ে। পূজা ও উৎসব সম্পন্ন করার জন্য অনেক স্থানে দেবতার নামে জমির ব্যবস্থা আছে। গ্রামবাসীগণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তির উপর এইরূপ জমির চাষ আবাদের ব্যবস্থা এবং পূজাদি পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে। যাত্রা, কীর্তন, কবিগান ও মেলাদি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে গ্রাম্য পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে প্রবল সাড়া সৃষ্টি করে। শিবের গাজন একটি বিশিষ্ট গ্রাম্য উৎসব। গাজনের সময়ে গাজন গানে ও বাজনাতে গ্রামগুলি মুখরিত হয়ে ওঠে। দুর্গোৎসব, শ্রীকৃষ্ণের দোল ও রাস উৎসব সাধারণতঃ গ্রামে জমিদার ও বিত্তবানদের গৃহে বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমান অর্থ নৈতিক কারণে এই সব পূজা বিশেষতঃ দুর্গাদেবীর আরাধনা সর্বসাধারণের উদ্যোগে সার্বজনীন পূজার আকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেবীর নিকট অঞ্জলি দান বা ভোগের বস্তু গ্রহণে বিত্তবান ও দরিদ্র জলাচরণীয় ও অনাচরণীয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য বিলোপের উদ্দেশ্যে সার্বজনীন পূজাগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। দুর্গা, কালী, মহামায়া প্রভৃতির পূজা ব্যাপক হ'লেও গ্রামে গ্রামে হরি-সংকীর্ত্তন, বৈষ্ণবীয় অন্ন বা চিড়ামহোৎসব, আনন্দোৎসব, রোগ-শোক বিপদ আপদ ইত্যাদি শান্তির নিমিত্ত প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। জেলার

কতক অঞ্চলে কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসগুলিতে ভাগবত পূজা ও পাঠ প্রচলিত আছে। তালপাতাতে লোহার লেখনীর সাহায্যে ওড়িয়া বা বাংলা হরপে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও লীলা কাহিনী লিখিত থাকে। ভাগবতসেবক বৈষ্ণবগণ ঐ তালপাতার পুঁথিকে ফল-পুষ্প অর্ঘ্য দিয়ে নিত্য পূজা করেন এবং গৃহস্থগণের আহ্বানে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে সাধারণতঃ এক মাস কৃষ্ণ চরিত্র পাঠ করে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবতী মহিলাদিগকে শোনান। তাঁরা এই একমাস নিরামিষ আহার করে নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণের লীলাকাহিনী মনোযোগ দিয়ে শোনেন। উড়িষ্যার ভক্তকবি জগন্নাথ দাসের রচিত এই ভাগবত কাঁথির নীহার পত্রিকা প্রেস হতে এক সময়ে বাংলা হরপে মুদ্রিত হয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য সরলমতি গ্রাম্য নরনারী-গণের ধর্মচর্চার মাধ্যম এখন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। কুলদেবতা হিসাবে এখনও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, শালগ্রাম বিগ্রহাদির পূজা বহুলভাবে প্রচলিত। এইসব কুলদেবতা বা গৃহদেবতার পূজা অবলম্বন করে এখনও গ্রামঅঞ্চলে বহু উৎসব প্রতিপালিত হয় এবং কীর্তন পালাগান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান, মঙ্গল কাব্য গান এখনও জনপ্রিয়। লোকশিক্ষার ও আনন্দলাভের মাধ্যম হিসাবে কথকতা, কবিগান, পট প্রদর্শন প্রভৃতি লুপ্ত প্রায় হয়ে উঠেছে কিন্তু যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি—নূতন আকাবে ও নূতন ভাবে বহু প্রকারের যাত্রা গ্রাম অঞ্চলে ও শহরে সমানভাবে চলছে।

এই জেলাতে গ্রাম্য পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা। এই জেলার কতকগুলি অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ প্রভূত খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘাটাল অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। মেদিনীপুর, কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে কাঁথি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পূর্বে মুগবেড়িয়া মহাবিদ্যালয় ভগবানপুর থানাতে স্থাপিত হয়েছে। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে আরবী-ফারসী শিক্ষা দিবার জন্যে মাদ্রাসা স্থাপিত

হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রভাবে অমুসলমানগণও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে রাজ দরবারে সম্মান লাভ করতেন। পটাশপুরের মাদ্রাশাটি বহু পুরাতন। মারাঠাগণ পটাশপুর অধিকার করার পরও মাদ্রাশাটি পরিচালনার জন্য তাঁরা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর এই জেলা শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল না। শ্রীযুক্ত তপনদেব ভট্টাচার্য তাঁর "মেদিনীপুর" পুস্তকে লিখেছেন—"উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই জেলায় দ্রুত শিক্ষা প্রসার হতে থাকে। বিংশশতাব্দীর শুরুতেই এক পরিসংখ্যান রিপোর্টে দেখা যায় হাওড়া জেলা ছাড়া বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় এখানে শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারিত। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগের উপর লিখতে পড়তে জানতেন। পুরুষদের ভিতর এই শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২০ ভাগের উপর, মেয়েদের ভিতর এক ভাগেরও নীচে।" (L. S. S. O. Mally)

খড়্গাপুরে যে কারিগরী শিক্ষা মহাবিদ্যালয় (I. I. T) ভারতের মধ্যে সর্ব প্রথম স্থাপিত হয়ে এই জেলার গৌরব বর্ধন করেছে, তাতে জেলার মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ কারিগরী শিক্ষার পথ প্রশস্ততর হয়েছে। অচিরে এই জেলাতে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামানুসারে "বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে জেলার কৃতী সন্তান খড়্গপুর ইনস্টিটিউটের গণিত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক স্বর্গত ডঃ অনিল কুমার গায়েন মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম করে জেলাবাসীর সম্মুখে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এই জেলার কয়েকজন কৃতী সন্তানের নাম বিখ্যাত ঃ—কার্তিক চন্দ্র মিত্র, এম. এ. বি. এল., পি. আর. এস (জেলার প্রথম এম. এ, ও প্রথম পি. আর. এস—লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল), সূর্য্যকুমার অগস্তি এম. এ. পি. আর. এস (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার), নীলকণ্ঠ মজুমদার, এম. এ. পি. আর. এস (কটক র‍্যাভেন্‌সা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল), বিপিন বিহারী দত্ত, বি. এল,

(রায় বাহাদুর, সরকারী উকীল), চন্দ্রশেখর সরকার এম. এ. বি. এল. (ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল), স্যার আবদার রহিম এম. এ বার-য়্যাট্-ল (মাদ্রাজ-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি), ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত (মেদিনীপুর জজকোর্টের এবং পরে পাটনা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এবং মেদিনীপুরের অন্যতম নেতা) বীরেন্দ্র নাথ দে—কেম্ব্রিজের সিনিয়ার র‍্যাঙ্গলার আই. সি এস (সি. আই. ই, মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব রাজস্ব কমিশনার) —এঁরা সকলেই স্বর্গত হয়েছেন।

মেদিনীপুরের প্রখ্যাত সুরাবর্দ্দি পরিবারের কৃতীসন্তানগণ কেহই মেদিনীপুর সহরে বা জেলার অন্য কোথাও বাস করেন না। আবদুল্লা, জহিদ, হাসান, সহিদ সুরাবর্দি নামগুলি বিদ্যা উচ্চপদ প্রভৃতির জন্য জেলা ও জেলার বাহিরে বহু খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল। ডঃ আবদুল্লা সুরাবর্দি (বার এট-ল) ছিলেন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের প্রথম মনোনীত বেসরকারী চেয়ারম্যান। সহিদ্ সুরাবর্দি অবিভক্ত বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ইহাদেব পরিবারগুলি এখন মেদিনীপুরের সহিত সম্পর্ক শূন্য।

কাঁথি মহকুমার বাল্যগোবিন্দপুর নিবাসী ৺মধুসূদন রায় ছিলেন জেলার প্রথম স্নাতক। ইনি ১৮৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বি. এ, পাস করেন।*

* মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশ চন্দ্র বসু

ঐতিহাসিক কীর্তি ও স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ

মেদিনীপুর জেলার পূর্ব কীর্তি ও গৌরব স্মরণযোগ্য। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লিখিত হ'ল।

সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্তি (তমোলুক) রাজ্য সম্বন্ধে সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—

"তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব হইতে একটি শ্রেষ্ঠ সাগরতীর্থ বা বন্দর বলিয়া প্রাচ্য দেশের সর্বত্র পরিচিত ছিল। চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ হইতে সাগর পথে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে তমোলুকেই সকল জাহাজ ভিড়াইতে হইত। ভারতবর্ষ হইতে সাগরপথে প্রাচ্য দেশে যাইতে হইলে এই তাম্রলিপ্তির বন্দরে—অর্ণব পোত আরোহণ করিতে হইত।

বাংলার তমলুক ভারতবর্ষের পূর্বদ্বার স্বরূপ ছিল।

তমোলুকের কল্যাণে বৌদ্ধকালের সকল সভ্যদেশের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতা, মানবতা প্রভৃতি সবই সর্বাগ্রে বঙ্গদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইত। তমোলুক বাঙালীকে একটা বিশিষ্টতা দিয়া রাখিয়াছে। মহাভারতীয় যুগেও তাম্রলিপ্ত রাজ্য বিশেষ গণনীয় প্রদেশ ছিল।" যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় মেদিনীপুরের ইতিহাসে লিখেছেন "তাম্রলিপ্তরাজ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ উদ্দেশ্যে গমন, রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিতি ও সুশিক্ষিত সুসজ্জিত, সহস্রহস্তী উপঢৌকন প্রদান এবং পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে।"

'শু-ই-চিন্ত-চু' নামক চৈনিক গ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আনুমাণিক খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তের কোন নৃপতি চীন রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন।

এইযুগে বাঙালী নাবিকগণ মসলীন বস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে নিজস্ব অর্ণবপোতে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে রপ্তানি করতেন। পণ্যমূল্য বিনিময়ে তাঁরা সুবর্ণমুদ্রা ব্যবহার করতেন।

বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক 'ফা-হিয়েন' (৫ম শতাব্দী প্রথম ভাগ) এবং 'হুয়েন সিয়াং' (৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ) তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হুয়েন সিয়াং লিখেছেন যে তাম্রলিপ্তি রাজ্য সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় আয়তনে এক হাজার পঁচিশ লি অর্থাৎ প্রায় ২৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল। তখন এখানে ৫০টি হিন্দুদের মন্দির ও ১০০০ পুরোহিত সমন্বিত ১০টি বৌদ্ধমঠ ছিল। সম্রাট অশোক নিজে এসে স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখান থেকেই বিখ্যাত বোধিদ্রুম সিংহলে পাঠানো হয়েছিল। তাম্রলিপ্তের গৌরব অন্ততঃ ১০০০ বৎসর স্থায়ী ছিল।

বর্তমান তমলুক শহর থেকে বঙ্গোপসাগর প্রায় ৬০ মাইল দূরবর্তী।

বগড়ীরাজ্য

বর্তমান গড়বেতা থানা ও চন্দ্রকোণা থানার একাংশ নিয়ে বগড়ী-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বিষ্ণুপুরের রাজা সুরমল্ল এই রাজ্য অধিকার করেন। গজপতি সিংহ পনের শতকের প্রথমদিকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি চন্দ্রকোণা অধিকার করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চৌহান সিংহ বগড়ী অধিকার করেন। এঁর পুত্র আউচ সিংহের কাছ থেকে চন্দ্রকোণার রাজা ছত্র সিংহ বগড়ী রাজ্য কেড়ে নেন। ছত্র সিংহের সময় বিখ্যাত 'নায়েক বিদ্রোহ' ঘটে। এই বিদ্রোহের নেতা অচল সিংহকে ছত্রসিংহ ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

বগড়ীর কৃষ্ণরায় নামক দেবতা বিশেষ বিখ্যাত। দোলযাত্রার সময় এখানে লক্ষাধিক লোকের মেলা হয়।

গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মন্দিরের গায়ে কিন্নর, অপ্সরা প্রভৃতির দর্শনযোগ্য মূর্তি আছে। মন্দিরটি—উত্তরমুখী, ইহা মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কর্ণগড়

মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত কর্ণগড়ে ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রায় আড়াইশত বৎসর যাবৎ কর্ণগড় রাজবংশ রাজত্ব করেছিলেন।

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্য "শিবায়ণে" লিখেছেন ঃ

"রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যেব ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজারাম সিংহ মহাবীর॥
তস্য পুত্র যশোবন্ত সিংহসর্বগুণমন্ত
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড় অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
রাজা রণে ভৃগুরাম দানে কর্ণ, রূপে কাম
প্রতাপে প্রচণ্ড হেন রবি।
শক্রের সমান সভা জ্বলন্ত পাবক প্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ-কবি॥
দেবীপুত্র নৃপবরে স্মরণে পাতক হরে
দরশনে আনন্দ বর্ধন।
তস্যপোষ্যৎ রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করিঘর
বিরচিল শিব-সংকীর্তন॥"

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নবাব নাজিম সরফরাজ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। তাঁর পুত্র অজিত সিংহের সৈন্যসংখ্যা ছিল পনের হাজার। তাঁর মৃত্যুর পর দুই রাণী ভবানী ও শিরোমণি জমিদারীর অধিকারিণী হন। ১৭৯৯-১৮০০ সালে যে চুয়াড় বিদ্রোহ হয়, রাণী শিরোমণি তাতে নেতৃত্ব করেছিলেন—এই সন্দেহে ইংরাজরা তাঁকে এবং তাঁর সহযোগী নাড়াজোলের জমিদার

চুনীলাল খাঁনকে বন্দী করেন (৬ই এপ্রিল ১৭৯৯)। ব্রিটিশ রাজত্বে প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী হিসাবে রাণী শিরোমণি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

চিতুয়া বরদা

চিতুয়া বরদার জমিদার বংশের আদি পুরুষ রঘুনাথ সিংহ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে চিতুয়াতে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। রঘুনাথের পুত্র কানাইলাল কিছু জমিদারী কিনে জমিদার বংশের পত্তন করেন। কানাইলালের পৌত্র শোভা সিংহ একজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। তিনি মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে ১৬৯৫-৯৬ সালে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহের বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে। বর্ধমানের রাজকুমারীর হাতে শোভা সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হিম্মত সিংহ চিতুয়ার জমিদার হন। তিনি শিবায়ণের কবি রামেশ্বরকে যদুপুর থেকে উৎখাত করেন। রামেশ্বর লিখেছেন—

"পূর্ববাস যদুপুরে হিম্মত সিংহ ভাগে ঘরে
রাজারাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে, বরিয়া পুরাণ-পাঠে
রচাইল মধুর সংগীত ॥"

খাজনা আদায় দিতে অসমর্থ হওয়ায় হিম্মত সিংহ দেশ ছেড়ে পালান। জমিদারী চলে যায় বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের কাছে।

ময়না

তমলুক মহকুমার ময়না থানার রাজবাড়ী ময়নাগড় নামে পরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়নাগড়ের রাজবংশের সূচনা হয়েছিল। ময়নাগড়ে বৌদ্ধ নরপতি লাউ সেনের রাজধানী ছিল। তিনি বৃন্দাবনচকে ধর্ম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে খ্যাতি আছে। ময়নাগড় এখনও ধর্মপুজার প্রধান পীঠস্থান বলে পরিচিত।

এক সময়ে এখানকার রাজারা উৎকল রাজ্যের অধীনে ছিলেন।

এঁদের সংগীত ও মল্লবিদ্যার দক্ষতার জন্য এঁরা উৎকল রাজ থেকে "রাজা" ও "বাহু বলীন্দ্র" উপাধি লাভ করেছিলেন।

কাশীজোড়া

কাশীজোড়া পরগণা, পাঁশকুড়া ও ডেবরা থানাতে বিস্তৃত ছিল। কাশীজোড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গঙ্গানারায়ণ রায়। তিনি উৎকল রাজার সেনাবিভাগে কাজ করতেন। তাঁর সেবার পুরস্কার স্বরূপ উৎকল রাজার নিকট থেকে তিনি ১৫৭৩ সালে কাশীজোড়ার অধিকার লাভ করেন। কাশীজোড়া থেকে দুইশত অশ্বারোহী, আড়াই হাজার তীরন্দাজ ও মশালধারী সৈন্য রাজসরকারে প্রেরণ করা হ'ত।

এই বংশের রাজা লছ্‌মী নারায়ণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র দর্পনারায়ণও মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নরনারায়ণ হিন্দু-ধর্মেই আস্থাবান ছিলেন। তিনি অনেক দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

'যামিনী দীঘি' বা 'জাম্বু দীঘি', 'জিতসাগর' প্রভৃতি সরোবর এবং জয়চণ্ডী, অনন্ত বাসুদেব, গোবর্ধনধারী, গোপাল জীউ প্রভৃতি মন্দির এই বংশের কীর্তিস্বরূপ।

দাঁতন

দাঁতন একটি অতি পুরাতন স্থান। বহু ঐতিহাসিকের মতে ইহা দণ্ড ভুক্তি নামে সুপরিচিত ছিল। কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোল (১০১২ খৃঃ) দিগ্বিজয়ে এসে 'মধুর নিকর পরিপূর্ণ' উদ্যান বিশিষ্ট দণ্ডভুক্তি অধিকার করেছিলেন কিন্তু তিনি প্রথম বাধা পেয়েছিলেন দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্মপালের নিকট। ধর্মপাল রাজেন্দ্রচোলের বিপুল সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। দাঁতন জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজপুত বংশীয় লছমীকান্ত সিংহ। তিনি মোঘল বাহিনীর একজন সেনানায়ক ছিলেন।

দাঁতনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী গমন করেছিলেন। দাঁতনের

বিত্তাধর পুষ্করিণী ১৬০০ ফুট দীর্ঘ ও ১২০০ ফুট প্রস্থ। রাজা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী বিত্তাধর এটি খনন করিয়েছিলেন। শরশঙ্ক দীঘি রাজা শশাঙ্ক খনন করিয়েছিলেন এরূপ ইতিহাস প্রচলিত আছে। এই সরোবরটি ৫০০০ ফুট লম্বা এবং ২৫০০ ফুট চওড়া।

ঘাটাল

রাজা টোডরমলের সময় মান্দারুন ও পেস্কোস নামে যেত্নটি সরকার ছিল তা বর্তমান ঘাটাল মহকুমা গঠন ক'রেছে ইদানীন্তনকালে ঐ মহকুমা চাকলা বর্ধমানের ও পরে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহু পূর্বকাল থেকে ঘাটাল মহকুমা ও শহর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুপরিচিত। মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, খড়ার প্রভৃতি কতকগুলি স্থান শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

নারায়ণগড়

পূর্ব বা উত্তর অঞ্চল থেকে পুরী যাওয়ার পথে নারায়ণগড় ছিল একটি বিশিষ্ট স্থান।

চৈতন্যদেব নারায়ণগড়ের পথেই পুরী গিয়েছিলেন। এখানকার রাজভবন ও দুর্গ নারায়ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (১২৬৪ খৃঃ অঃ) গন্ধর্বপালের পুত্র দ্বিতীয় রাজা নারায়ণবল্লভ তৈয়ার করেছিলেন। গড়ের চারিটি দরজা ছিল। পুরী যেতে হলে নারায়ণগড় রাজার নিকট থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে যেতে হত। পাল বংশ প্রায় সাড়ে ছয়'শ বছর নারায়ণগড়ে রাজত্ব করেছিলেন।

শাজাহান, পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে জাহাঙ্গীর নারায়ণগড়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সৈন্যদল পরিচালনা করেছিলেন। এজন্য নারায়ণগড়রাজ শ্যামবল্লভ জঙ্গল কাটিয়ে এক রাত্রির মধ্যে এই অভিযান চালাবার পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। সম্রাট শাজাহান সিংহাসন লাভ করে এঁদের উপাধি দিয়েছিলেন—'মাড়-ই-সুলতান' বা পথের রাজা।' মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাব আলিবর্দীর অভিযান নারায়ণগড়ের মধ্য দিয়েই হয়েছিল।

চন্দ্রকোণা

চন্দ্রকোণা একটি অতি পুরাতন স্থান। আইন-ই-আকবরীতে চন্দ্রকোণা সরকারের উল্লেখ আছে। চন্দ্রকোণার প্রাচীন নাম ছিল মানা। চন্দ্রকোণা একসময়ে বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল। রাঢ়ী রাজা গজপতি সিংহ চন্দ্রকোণা অধিকার করেছিলেন। পরে রঘুনাথ সিংহ মাতুল বংশের সম্পত্তি লাভ করে চন্দ্রকোণার রাজা হ'ন। ইনি চিতুয়া বরদার রাজা শোভাসিংহের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।

চন্দ্রকোণার বাহান্নবাজার ও ছাপ্পান্ন গলির খ্যাতি বহুবিস্তৃত। তাঁত শিল্পের জন্য এই নগরী এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।

শিলদা

১৫২৪ খৃঃ অব্দে মেদিনীমল্লরায় শিল্‌দার তখনকার রাজা বিজয় সিংহকে পরাজিত করে এদেশ অধিকার করেন। এখানে পুর্বে যে ডোমরাজ্য ছিল বলে অনুমান করা হয় বিজয় সিংহ তাদের পরাজিত ক'রে রাজা হয়েছিলেন। বাগদী সেনাপতি গোবর্ধন দিক্‌পতির নেতৃত্বে যে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' ঘটে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের এপ্রিলে শিল্‌দাতেই সর্বপ্রথম সেই আগুন জ্বলে উঠে।

শিলদা আদিবাসীদের একটি দৃঢ় ঘাঁটি।

গোপীবল্লভপুর

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগোস্বামী শ্যামানন্দের জন্মস্থান ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানাতে অবস্থিত। এখানকার গোবিন্দজীর মন্দির স্থানীয় গোস্বামী বংশের নির্মিত। জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে যে দণ্ড মহোৎসব হয় তাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আগত বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের সমারোহ হয়। এটি একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব তীর্থস্থান ব'লে পরিচিত।

বাহিরী—দেউলবাড়

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত বাহিরি গ্রামটি অতি প্রাচীন। এখানে

পালটিকুরী, শালটিকুরী, ধনটিকুরী ও গোধন টিকুরী নামে চারটি বৃহৎ মাটির স্তূপ আছে। এগুলি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা হয়। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এখানে বিরাটরাজার গো-গৃহ ছিল। এখানে ভীমসাগর, হেমসাগর ও লোহিত সাগর নামে কয়েকটি বৃহৎ সরোবর আছে।

খেজুরী

বঙ্গোপসাগরের সহিত হুগলী নদীর মিলন স্থলে খেজুরীবন্দর নামে একটি বৃহৎ বন্দর গড়ে উঠেছিল। ইউরোপ থেকে আগত বিশাল জাহাজগুলি ঐস্থানে মাল নামিয়ে দিত। ওখান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে ঐ মালগুলি কলিকাতা বন্দরে প্রেরণ করা হতো। এই পোতাশ্রয়টি ইংরেজ ও পর্তুগীজ নাবিকগণের বিশেষ আশ্রয়স্থল ছিল। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে খেজুরীতে ভারতের প্রথম তারঘর স্থাপিত হয়েছিল। কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার, কুকুড়াহাটি প্রভৃতি স্থানকে যুক্ত করে খেজুরী পর্যন্ত ৮২ মাইল পথ টেলিগ্রাফ তার দ্বারা যুক্ত হয়েছিল। ঘূর্ণীব্যাত্যা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, জলদস্যুগণের অত্যাচার ইত্যাদি কারণে খেজুরী বন্দর এখন ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। আজও ১৮০০ সালের পূর্ব থেকে নির্মিত মৃত নাবিকগণের কবরগুলি পূর্বগৌরবের সাক্ষ্য দেয়।

হিজলী রাজ্য—

তাজ-খাঁ-মসনদ-ই-আলা

রসুলপুর নদীর মোহনার নিকট নদীর পূর্বভাগে (কাঁথি মহকুমার খেজুরী থানা) তাজখাঁ মসনদ-ই-আলা ছিলেন হিজলী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৬২৮-১৬৬১ খৃঃ অঃ পর্যন্ত হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন—(মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত হিজলীর মসনদ-ই-আলা)। তিনি ছিলেন প্রায় স্বাধীন। তাঁর পরাক্রম সর্বজনবিদিত ছিল। তাঁর পরম প্রিয় ভ্রাতা' শিকান্দার একজন প্রভূত বলশালী পুরুষ ছিলেন। একটি ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটায় তাজ খাঁ সংসারে

বীতরাগ হন এবং অমর্ষি কস্‌বার হজরৎ মকতুম শাহ্‌ চিস্তির কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর নির্মিত সুবৃহৎ মসজিদ এবং 'হুজরা' বা শেষ আশ্রম ও সমাধিক্ষেত্র আজিও বিদ্যমান আছে। এটিকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসর মুসলমানদের 'উরস্‌' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের একটি বৃহৎ সমাবেশ ঘটে। তাজ খাঁর পুত্র ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলার রাজত্বকালে মহারাজা প্রতাপাদিত্য হিজলী রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ঈশাখাঁর মৃত্যু হয় এবং হিজলী রাজ্য প্রতাপাদিত্যের অধিকার ভুক্ত হয় পরে উহা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কালক্রমে হিজলীরাজ্যের রাজধানী হিজলী পুর্বপ্রদেশের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই প্রদেশে তখন অপর্য্যাপ্ত ধান্য ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হত এবং নানা প্রকার সুতার কাপড়, চিনি, ঘৃত ও মাখনাদি পাওয়া যেত। হিজলী বন্দরের খ্যাতি ইউরোপ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে প্রথমে পর্তুগীজ ও ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী ব্যবসায়ীগণ এখানে ব্যবসার জন্য আসেন। পর্তুগীজ জলদস্যুগণের উপদ্রবে জনসাধারণ অত্যন্ত নির্যাতন ভোগ করে।

হিজলীর লবণ কারবার বহু বিস্তৃত ছিল। নবাবী আমলে এদেশ থেকে লবণ নেওয়ার জন্য দলে দলে কাশ্মীরী, শিখ, মুলতানী, ভাটিয়া প্রভৃতি নানা দেশের ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন।

হিজলীরাজ্যের অন্তর্গত হুগলী নদীর মোহানাতে অবস্থিত খেজুরী বন্দরের ব্যবসায়ও সুবিস্তৃত আকার ধারণ করেছিল।

নরমপুর মসজিদ

মেদিনীপুর সহরে অবস্থিত নরমপুর মসজিদটির খ্যাতি সুপ্রাচীন। এই মসজিদটি শাজাহানের মেদিনীপুর আগমনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অথবা ঔরঙ্গজেবের উপাসনার জন্য নির্মিত হয়েছিল তা' এখনও নির্ণীত হয়নি।

কিন্তু জেলার একটি প্রধান মসজিদ হিসাবে এটি সম্মানিত। এখানে যে বার্ষিক পর্বটি ('উরস') সম্পন্ন হয় সেটিকে অবলম্বন করে

দূর-দূরান্তর থেকে সহস্র সহস্র মুসলমান নরনারী এখানে আগমন করেন। কয়েকদিনের উৎসবে সমগ্র সহর মুখরিত হয়ে ওঠে।

ঝাড়গ্রাম রাজবংশ

ঝাড়গ্রাম ও চিয়াড়া পরগণার প্রায় ২০০ বর্গমাইল স্থান নিয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এই রাজ্যের সঙ্গে ছিল কংসাবতী, সুবর্ণরেখা ও বুড়াবলং নদীর তীরবর্তী জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চলগুলি। এই রাজ্য প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বীরবিক্রম মল্লদেব ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ও তাঁর পরবর্তী রাজারা ছিলেন বীর ও দানশীল। সেজন্য তাঁরা 'উগাল ষণ্ডদেব' ও 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

কেশিয়াড়ি

কেশিয়াড়ির তসরশিল্প বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এখান থেকে প্রচুর তসর বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হত। কেশিয়াড়ির সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির দর্শনযোগ্য, ইহা উড়িষ্যার স্থাপত্য অনুসারে নির্মিত। মন্দিরের প্রস্তরফলকে উড়িয়া ভাষায় লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে জমিদার রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধর ভুঁইয়া ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মন্দিরটি উৎসর্গ করেন।

কেশিয়াড়ি গ্রামের পূর্বদিকে একটি শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ওড়িয়া ভাষায় লিখিত শিলাফলক থেকে জানা যায় কপিলেশ্বর দেবের সময় (১৪৩৪-১৪৬৯ খ্রীঃ অঃ) এই মান্দর নির্মিত হয়েছিল।

গ্রামের পশ্চিম দিকে যে মসজিদটি দেখা যায় তা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দে নির্মিত হয়েছিল।

এখানকার মোগলপাড়া, মসজিদ ইত্যাদি আওরঙ্গজেবের সময়কার মোগল প্রতিপত্তির নিদর্শন।

বর্গভীমার মন্দির

তমলুক সহরে অবস্থিত বর্গভীমার মন্দিরটি অতি প্রাচীন।

অনুমান করা হয় যে এটি একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। পরে এটিকে একটি হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কালো পাথরে খোদাই করা বর্শা তলোয়ার দৈত্য মুণ্ডাদি ধারিণী দেবীর উগ্রতারামূর্তি বিশেষ দর্শনযোগ্য। মন্দিরটির চারিটি ভাগ আছে—মূল মন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। মন্দিরটি একটি উচ্চ বেদীর উপর সংস্থিত। এই বেদীও প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ। দেবী ও দেবীর মন্দির দর্শনের জন্য বহু দর্শনার্থী এখানে আসেন।

বীরসিংহ

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামটি প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বলে বিখ্যাত হয়ে থাকবে। 'বীরসিংহের সিংহশিশু' নামে আখ্যাত পৌরুষ ও বীর্যের আধার এবং 'দয়ার সাগর' নামে কীর্তিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ভারতবিদিত।

নাড়াজোল

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত নাড়াজোল গ্রাম রাজবংশের কীর্ত্তির জন্য খ্যাতিলাভ করেছে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উদয় নারায়ণ ঘোষ। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল প্রায় ষোড়শ শতাব্দী। এঁরা নবাব সরকার থেকে 'রায়' ও 'খাঁন' উপাধি পেয়েছিলেন। ইঁহারা বহুকাল থেকে খাঁন উপাধিই ব্যবহার করে আসছেন। ইংরাজ সরকার মহেন্দ্রলাল খাঁনকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। এঁর পুত্র নরেন্দ্রলাল খাঁনও 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন। মেদিনীপুরের বোমার মামলাতে নরেন্দ্রলালকে গ্রেপ্তার করে অন্যতম আসামী করা হয়েছিল। এঁর পুত্র দেবেন্দ্রলাল দেশভক্তির জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অকুণ্ঠভাবে অর্থদান করতেন।

মহিষাদল

মহিষাদল রাজবংশের জমিদারী এক সময়ে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম বৃহৎ জমিদারী ছিল।

এই বংশের প্রতিষ্ঠিত রথের মেলা বঙ্গবিখ্যাত। জমিদার জ্যোতিপ্রসাদ গর্গ 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন। এই পরিবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা ও জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত।

গত আগষ্ট বিপ্লবের সময় মহিষাদল থানা আক্রমণ ও অন্যান্য ঘটনার জন্য স্থানটি অতি সুপরিচিত হয়েছে।

জমিদার সতীপ্রসাদ গর্গ ১৯০৭ সালে 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন।

মসলন্দপুর

মহিষাদলের নিকটবর্তী মসলন্দপুর নামক ক্ষুদ্রগ্রামটি একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান। এখানে একটি বহু পুরাতন খৃষ্টান কলোনী আছে। মারাঠা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মহিষাদল রাজা যে পর্তুগীজ কামানধারী সৈন্য আমদানী করেছিলেন ইহারা তাদের বংশধর বলে পরিচয় দেয়। এদের মধ্যে অনেকের পর্তুগীজ নাম আছে।

এখানে মূল্যবান মিহি মাদুর 'মসলন্দ' তৈয়ারী হত। শিল্পটি এখন লোপ পেয়েছে।

বালিসাহীর ভুঁইয়া বংশ

আইন-ই-আকবরীতে বালিসাহী মহালের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের ২০ জন জমিদারের নাম ১৮০৮ সালের পর থেকে পাওয়া যায়। জমিদার বিশ্বনাথ দাস উড়িষ্যা রাজ সরকারের কাছ থেকে চৌধুরী উপাধি পেয়েছিলেন।

মোগলমারির যুদ্ধের সময় ভুঁইয়া জগদীশচন্দ্র মোগলদের সাহায্য করেছিলেন। মারাঠা অধিকারের সময় এঁদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য এঁরা 'বলিয়ার সিংহ' উপাধি লাভ করেছিলেন।

পাঁচেটের চৌধুরী বংশ

এঁরা দীর্ঘকাল নিজেদের জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মারাঠা যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানী এই জমিদারী হস্তগত করেন এবং তদানীন্তন জমিদার রেণুকা দেবীর সঙ্গে এঁদের

একটি বন্দোবস্ত হয়। এই জমিদার বংশের 'রাসের' মেলা বিখ্যাত ছিল।

উত্তর কালে এই বংশের অনেক ব্যক্তি শিক্ষা ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। এই বংশের চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র মহাশয় পাঁচেটগড়কে একটি সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কিশোরনগর রাজবংশ

কাঁথি শহরের নিকটবর্তী কিশোরনগর গ্রাম (গড়) এই জমিদার বংশের বাসভূমি। দানশীলতার জন্য খ্যাতিমান যাদবরামের নাম প্রবাদবাক্যের ন্যায় নিম্নলিখিত ছড়াটির সহিত যুক্ত করা হ'য়েছে ঃ

"দানে চন্নু, অন্নে মানু রঙ্গে রাজনারায়ণ,
বিত্তে ছকু, কীর্তে নরু, রাজা যাদবরাম।।"

এই ছয় জন ব্যক্তিই ছিলেন মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী।

এই খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ ছিলেন—রাজবল্লভ গ্রামের দাতা চন্দ্রশেখর ঘোষ (চন্নু), অতিথি সেবার জন্য বিখ্যাত পুঁয়াপাটেব মান গোবিন্দ ভঞ্জ (মানু), সৌখিনতাব জন্য সুপরিচিত মেদিনীপুর শহরের রাজনারায়ণ রায়, মারাঠা দমনে বহুধনেব অধিকারী মালিঘাটির ছকুরাম চৌধুরী (ছকু), ব্রহ্মোত্তর জমিদানের জন্য বিখ্যাত এগরার নরনারায়ণ চৌধুরী (নরু) এবং কিশোর নগর রাজবংশের খ্যাতনামা দাতা যাদবরামের নাম নিয়ে এই গাথাটি রচিত হয়েছিল।

তমলুক রাজবংশ

তমলুকের শেষ ক্ষত্রিয় রাজা নিঃশঙ্কনারায়ণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে মাহিষ্যবংশীয় প্রতাপশালী কালু ভুঁইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি উড়িষ্যা থেকে চারিশত জ্ঞাতিকুটুম্ব সহ এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন।

কীর্তিমান ব্যক্তিগণ

কাশীরাম দাস

মহাভারত বাংলা মহাকাব্যের রচয়িতা কাশীরাম দাস মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ না করে থাকলেও তিনি মেদিনীপুরের অন্নজলে পুষ্ট হয়ে মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সিংগী গ্রাম। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থেকে শিক্ষকতা করতেন। রাজবাড়ীতে যে সকল কথক ও পুরাণপাঠক পণ্ডিত আসতেন তাঁদের মুখে মহাভারত শুনে তাতে তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মে এবং তিনি পাঁচালির ছন্দে মহাভারত অনুবাদ করেন। এই রচনার কাল অনুমান ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর, ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম ও আত্মীয় ভৃগুরাম মিলিত হয়ে মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন।

শ্যামানন্দ

শ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে বিরাগী হয়ে তিনি বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে তিনি শ্রীবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জীব গোস্বামী তাঁদের তিনজনকে উৎকলে, গৌড়দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। গুরুর আদেশমত শ্যামানন্দ মেদিনীপুরে এসে ধর্মপ্রচারে রত হন। তিনি বার্ণপুর (বেনাপুর), পঞ্চটি (পাঁচেট), নারায়ণগড়, মোহনগড় (মোহনপুর) প্রভৃতি স্থানের শত শত ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর শিষ্যগণ দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত ছিল।

অদ্বৈত তত্ত্ব, উপাসনাসার সংগ্রহ ও বৃন্দাবন পরিক্রমা শ্যামানন্দের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন।

রসিকানন্দ

শ্যামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে রসিকানন্দের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ ও বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত

রোহিনীর রাজবংশে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণ-রেখা নদীর তীরে গোপীবল্লভপুর গ্রামে গোপীবল্লভরায় নামক সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সমগ্র উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর অঞ্চলকে অপার ভগবত প্রেমে প্লাবিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত "শাখাবর্ণণ" ও "রতি বিলাস" নামে ছুখানি গ্রন্থ আছে। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনা গ্রামে তাঁর পবিত্র সমাধি আছে।

বাসুদেব ঘোষ

বাসুদেব ঘোষ মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী না হলেও এই জেলাতেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল ব্যয়িত হয়েছিল। এই জেলাতেই অবস্থান কালে তাঁর পদাবলী এবং 'গৌরাঙ্গচরিত' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামক গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী রচয়িতার মধ্যে বাসুদেব শীর্ষস্থানীয় ।"

দুঃখী শ্যামদাস

দুঃখী শ্যামদাস মেদিনীপুর সহরের আটক্রোশ পূর্বে কেদার কুণ্ড পরগণার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'গোবিন্দমঙ্গল' দুঃখী শ্যামদাসের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কায়স্থ বংশীয় হলেও তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট হিন্দুগণের দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মেদিনীপুর জেলাতে ভূমিষ্ঠ হন নি বটে কিন্তু এই জেলাতেই মধ্যযুগের এই শ্রেষ্ঠ কবিরই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল। কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তিনি বর্ধমানের অন্তর্গত দামুন্যা গ্রাম পরিত্যাগ করে মেদিনীপুরের কেশপুর থানার আড়রাগড়ে চলে আসেন। কেশপুর থানার নেড়াদেউলের কমেশ্বর শিব কবির কাব্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

কবি লিখেছেন ঃ—

"কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দোঁ। কোঙাঞি নগরে।
চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দোঁ। মল্লেশ্বরে ॥

কাইত্তির বানেশ্বর বন্দিগাব আগে।
মৌলার রঙ্গিনী বন্দোঁ মস্তকের পাগে ॥”

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা পরগণার যত্নপুর গ্রামের অধিবাসী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'শিবায়ণ' অত্যন্ত সুপরিচিত কাব্য। আঠার শতকের প্রথম ভাগে চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহের অত্যাচারের ফলে কবি স্বগ্রাম ত্যাগ করে মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্ত্তী কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁর 'শিবায়ন' কাব্য রচনার স্থান ছিল।

অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তী

কবি অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তী তাঁর কবিত্ব শক্তির জন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট থেকে 'কবীন্দ্র' উপাধি লাভ করেছিলেন। ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাইর নিকটবর্ত্তী আটঘড়া গ্রাম তাঁর জন্মস্থান ছিল। তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল' 'গঙ্গামঙ্গল' ও 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের এবং দুর্গা ও শ্যামাসঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন। অনেক স্থলে তিনি চিত্রবর্ণনা ও প্রাকৃতিক বর্ণনাতে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাণবল্লভ ঘোষ

কবি প্রাণবল্লভ ঘোষ, সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলাতে জন্মলাভ করেছিলেন কিন্তু পরে ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া পরগণার বাসুদেবপুর গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছিলেন। তাঁর রচিত 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্যের ভাষা অতি সুললিত ছিল। তিনি লিখেছেন—

“জাহ্নবী মঙ্গল গীত অমৃত লহরী
পিবত ভকতলোক কর্ণপুট ভরি।”

নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী

কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী কাশীজোড়া পরগণার কানাইচকে বাস করতেন। তিনি কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ

ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্য 'শীতলামঙ্গল' শীতলা পূজা উপলক্ষ্যে বহুস্থানে গীত হয়ে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে। কৈশোর ও যৌবনে আর্থিক অভাবগ্রস্ত পিতার নানা অসুবিধার মধ্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এবং পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক হিসাবে প্রবেশ করে নিজ প্রতিভা ও কার্যক্ষমতার গুণে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সমগ্র ভারতে 'বিদ্যাসাগর' বললে একটিমাত্র ব্যক্তিকেই বুঝায়, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দুঃখী, দরিদ্র, পীড়িতের প্রতি অনুরাগ ও তাদের সেবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় 'দয়ার সাগর' খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নারী-সমাজকে অকাল-বৈধব্যের যন্ত্রণা ও দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রচলিত সংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ণের ও প্রচলনের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়—

> "বিদ্যাসাগর করুণা সাগর, শৌর্য্য সাগর তুমি,
> তোমারে পাইয়া আমরা ধন্য,
> ধন্য ভারত ভূমি।"

তিনি বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করেন। তাঁর চরিত্রবল, সমাজ সেবা, শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনা এবং বঙ্গভাষা সংস্কার তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে ভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তাঁর পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথ খননের জন্য

বাঙ্গালীর মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক দিয়ে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে, তত্ত্বজ্ঞানে, ইতিহাসে, আরেকটা প্রকাশ ভাবের বাহন রূপে রস সৃষ্টিতে, এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলার এই ভাষাই দ্বিধাহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে, তাঁর সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।

আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড় কথা নয়, কিন্তু যে দেশে অপরাজেয়, নির্ভীক, চরিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রত পালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। তাঁর জীবনীতে দেখা গেছে ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন, তেমনি যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রবর্তনায় দণ্ডপাণি সমাজ শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেননি সেও কঠিন সঙ্কটের বিপক্ষে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। দীন-দুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা দয়া করেছেন। সে কথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করেন, কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন তার শ্রেষ্ঠতা আরও অনেক বেশী, কেননা, তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়— তাঁর বীরত্ব।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্ম হয়েছিল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায়। তিনি নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকট ও অন্যান্য স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে ১৫ বছর কাজ করার পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। ইনি গোঁড়া পণ্ডিত

হয়েও রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে সংস্কৃত ভাষায় এই মত লিপিবদ্ধ করেন যে, "চিতারোহণ অপরিহার্য নয়—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র, অনুগমন ও ধর্ম-জীবন যাপন উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর।"

বহু গ্রন্থ প্রণেতা সুপণ্ডিত মার্শম্যান সাহেব তাঁর পাণ্ডিত্যকে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত গ্রন্থকার ডঃ জনসনের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে ইনি অবিস্মরণীয় নাম রেখে গেছেন। এঁর রচিত বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলী ও প্রবোধ চন্দ্রিকা পুস্তকে যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা বাংলা গদ্যের—নবযুগ সৃষ্টির ভূমিকারূপে গণ্য হয়। ইনি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বসুরী হিসাবে আদৃত।

তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রাজনারায়ণ বসু

২৪ পরগণা জেলার বোড়াল গ্রামের অধিবাসী মনীষী রাজনারায়ণ জন্মেছিলেন ১৮২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। তিনি মেদিনীপুর আসেন ১৮৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর জেলায় জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে এবং ১৮৬৬ সালের ৬ই মার্চ অবসর গ্রহণ করেন। এই ১৫ বৎসর কাল তিনি মেদিনীপুরে যে সব কাজ করে গিয়েছেন তাতে শুধু মেদিনীপুর জেলা নয় সমগ্র বঙ্গ তার সুফলভাগী হয়েছে। মেদিনীপুরের বেলীহল পাঠাগার (বর্তমান রাজনারায়ণ বসু পাঠাগার), অলিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় (বর্ত্তমান অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়), সুসংস্কৃত ব্রাহ্মসমাজ আজিও তাঁর কীর্তির অন্যতম চিহ্নস্বরূপ হয়ে রয়েছে। মেদিনীপুরে বাসকালীন তিনি গঠন করেছিলেন—জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, সুরাপান নিবারণী সভা, পারস্পরিক উন্নতি বিধায়ক সভা, জ্ঞানদায়িনী সভা, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে যথা সময়ের পূর্বে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল—কিন্তু তাঁর বহুসংখ্যক ছাত্র ও জনসাধারণের

মধ্যে তিনি যে সুশিক্ষা ও স্বাদেশিকতার বীজ বপন করেছিলেন মেদিনীপুর জেলাতে তথা বঙ্গদেশে তার প্রভাব ছিল অমোঘ। তিনি 'মেদিনীপুরকে এতদূর আপন করে নিয়েছিলেন যে তিনি বলতেন—লোকে তাঁকে 'বোড়ালের রাজনারায়ণ' অপেক্ষা 'মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ' রূপে অধিক চিনত।

তাঁর উদ্দীপনাময় স্বদেশপ্রেম, নিরলস জন-জাগরণ প্রচেষ্টা এবং নির্মল জ্ঞানগরিমা ও ধর্মপ্রাণতা তাঁকে 'ঋষি' ও 'স্বাদেশিকতার পিতামহ' আখ্যায় ভূষিত করেছিল। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দের নাম জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রেব পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে ডেপুটী কালেক্টর রূপে কর্মরত থাকাকালীন মেদিনীপুরে বালক বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। তিনি কয়েকবৎসর মেদিনীপুর জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সেখানে সর্বদাই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যেত। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন স্নাতকের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর দ্বিতীয় কর্মস্থল মেদিনীপুর জেলার নেঁগুয়া (কাঁথি) মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হয়ে ঐ মহকুমায় যান ১৮৬০ সালে। কাঁথিতে মহকুমা কার্যালয় স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি কাঁথি সহরে মহকুমা শাসক রূপে বাস করতেন। তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা'তে কাঁথি মহকুমার দারিয়াপুর ও দৌলতপুব গ্রাম, রসুলপুর নদী, ও শ্যাম বনানী শোভিত অপূর্ব ভীমকান্ত শোভামণ্ডিত বালুয়াড়িকে অমর করে রেখে গেছেন। এই স্থানটি 'কপালকুণ্ডলা'র পরিকল্পনা ক্ষেত্ররূপে সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত ও আদৃত হয়ে আসছে। বঙ্কিম শতবার্ষিকী পালনের সময় ইহা সাহিত্যিকদের একটি তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কাঁথির তথা মেদিনীপুর জেলার অচ্ছেদ্য

সম্পর্ক স্মরণ করে কাঁথিতে তাঁর স্মৃতিরক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য একটি ট্রাষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। মেদিনীপুরের সুসন্তান ডঃ পরিমল কুমার রায় ও তাঁর ভ্রাতাগণ তাঁদের কাঁথির সম্পূর্ণ বাসভূমি (১·৩০ একর) ট্রাষ্ট কমিটির হস্তে দান করেছেন। সমগ্র স্থানটির নাম হয়েছে "বন্দেমাতরম্ পার্ক"।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জাতীয় ধ্বনি (Slogan) ও মন্ত্র 'বন্দেমাতরমে'র স্রষ্টা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র দিয়েছেন—ইহা ভারতের পুনরুজ্জীবনের ও নবসৃষ্টির মন্ত্র। এজন্য তিনি পরবর্তী যুগের ঋষিদের অন্যতম সন্দেহ নাই।"

মেদিনীপুরের শহীদগণ "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছেন—লাঠি ও গুলির সম্মুখীন হয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান রাজ কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের অন্তর্গত সুজামুঠা পরগণার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হয়ে কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত কাজলাগড়ে আসেন। প্রায় তিন বৎসরের অধিক তিনি ভগবানপুর থানার বিভিন্ন ক্যাম্পে সময় কাটান। কাজলাগড়ের বিরাট দীঘি ও বকুলতলা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁর কবি-মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বিখ্যাত 'শাজাহান' নাটকের "আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।" গানটি এইখানেই রচিত হয়েছিল। তাছাড়া 'ঘুমন্ত শিশু' প্রভৃতি অনেক কবিতাতে 'বকুলতলা' ও 'কালোদীঘির কালো জলের' উল্লেখ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সুজামুঠা সেটেলমেণ্টে প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মন্তব্য ক'রে 'নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও' সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপী একটি উপকার সাধন করেছিলেন।

উল্লিখিত বকুলতার নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের একটি স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

সাহিত্য সেবার ধারা ঃ—জন্ম বা কর্ম্মসূত্রে মেদিনীপুরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্মরণীয় কবি, সাহিত্যিক ও ভাষাস্রষ্টা ব্যক্তি কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারকালে নীলকণ্ঠ মজুমদার, রামদয়াল মজুমদার, রামজয় তর্কালঙ্কার, রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন, ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, ত্রৈলোক্যনাথ পাল, শ্রীধরচন্দ্র ভক্তিরত্ন, মধুসূদন জানা, গণেশচন্দ্র তলা, দেবদাস করণ, মনীষীনাথ বসু সরস্বতী, বামাচরণ দাস, যোগেশচন্দ্র বসু, মহেন্দ্রনাথ করণ, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ভাগবতচন্দ্র দাস, অতুলচন্দ্র বসু, হরিসাধন পাইন, গজেন্দ্রনাথ গুছাইৎ, মহেন্দ্রনাথ দাস, রাসবিহারী রায়, নগেন্দ্রনাথ সেন, শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রমুখ ব্যক্তিগণ তত্ত্বমূলক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে, নিবন্ধ, কাব্য ও কবিতা রচনা ক'রে এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র পরিচালনা করে এই জেলার সাহিত্যসেবা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে আজহারউদ্দীন খান, ঋষি দাস, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, সুশীল জানা, চিত্তরঞ্জন মাইতি, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, রঘুনাথ মাইতি, স্বদেশরঞ্জন দাস, প্রমথনাথ পাল, ভবানীরঞ্জন পাঁজা, কল্যাণী প্রামাণিক, দীপ্তি ত্রিপাঠী (ডঃ) প্রভৃতি লেখক লেখিকা বিভিন্ন বিষয়ে রচনার জন্ম সুনাম অর্জন করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই স্থাপিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র মেদিনীপুর শাখা। প্রবীণ সাহিত্যসেবী রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ইহার বর্ত্তমান সভাপতি। কাঁথির 'সারস্বত সম্মেলন', 'মির্জ্জাপুর সৎ সাহিত্য সম্মেলন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও বহু বৎসর যাবৎ স্থানীয় সাহিত্য চর্চ্চার কেন্দ্ররূপে কাজ করেছিলেন। সাহিত্য ও স্বদেশ সেবামূলক পুস্তকের প্রকাশক রূপে ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের খ্যাতি সুপরিচিত। এই জেলার অধিবাসীগণের সাহিত্য-সেবা সাহিত্যিক সমাজে জেলার সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

মানবেন্দ্র নাথ রায়

মানবেন্দ্র নাথ রায়ের প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। তিনি ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্বপুরুষ ক্ষেপুতেশ্বরীর পূজক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সে বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের দলে যোগদান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে বিপ্লব কার্যের সহায়তার জন্য ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ করেন। ইনি ১৯১৭ সালে মেক্সিকোতে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিষ্ট দল গঠন করেন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তিনি মানবেন্দ্র নাথ রায় নামে পরিচিত হন। ১৯১৯ সালে লেনিনের আহ্বানে রাশিয়াতে গিয়ে লেনিন ও ট্রটস্কীর সহিত কার্য করেন। কিছুকাল পরে ভারতে ফিরে এসে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৬ সালে ইনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং নেতৃবৃন্দের সহিত মতের মিল না হওয়ায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইনি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে ইনি একটি জাতীয় অভ্যুত্থানের সংকল্প নিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ ও অন্যান্য বিপ্লবী কার্য্যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীদের সঙ্গে কার্য করেন। ইনি শেষে Neo Humanism প্রচার করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ইঁহার মনীষা নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ইনি বহু গ্রন্থের লেখক ও বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। ইঁহার নাম বিশ্ব বিখ্যাত।

বিপর্যয়ের আবর্তে জনজীবন

বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত সমুদ্রতটবর্তী মেদিনীপুর জেলা প্রধানতঃ অবস্থান বৈশিষ্ট্যের কারণে যুগে যুগে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের, ধন ও রাজ্যলোলুপ জাতিবর্গের স্বার্থদ্বন্দ্ব ও লুণ্ঠন পিপাসার এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর রঙ্গভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর কৃষিসম্পদ ও কৃষিজ উপকরণ সম্ভূত পণ্যরাজি আকর্ষণ করেছিল বিদেশী বেনিয়ার লুব্ধদৃষ্টি এবং দুর্বিবহ পীড়ন সৃষ্টি করেছিল এক ভয়াবহ দুরবস্থা। নৈসর্গিক বিপদপাতও তাদের অল্প দুঃখের কারণ হয়নি, তথাপি এই

জেলার অধিবাসীরা নানাপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বহুবিধ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মেদিনীপুরবাসীর এই সংগ্রামী মনোভাব ও অদম্য প্রাণশক্তির।

সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়কালে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিল —শতসহস্র জীবন বলিদানের ফলে। কলিঙ্গ প্রদেশের অতি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসাবে মেদিনীপুরের অধিবাসীগণকেও বহন করতে হয়েছিল মহাপরাক্রান্ত সম্রাটবাহিনীর নির্মম আঘাত। শত শত পল্লী ও নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আকাশভেদী হাহাকারে দিকদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়েছিল, নির্বাপিত হয়েছিল কত মনুষ্যের জীবন-দীপ। সহজ জীবনযাত্রা কতকাল পরে ফিরে এসেছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। যদিও দেখা যায় জীবন সংহারের রক্তরঞ্জিত করালরূপ অশোকের দুর্দমনীয় সাম্রাজ্যলিপ্সাকে গভীরভাবে বিচলিত করে ফেলেছিল—যার ফলে 'চণ্ডাশোক' হয়েছিলেন 'ধর্মাশোক'।

গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীতে মেদিনীপুরের অনেকাংশ অধিকার করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বঙ্গদেশ সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। সেই অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিহিত করা হয়। এই অবস্থা চলতে থাকে প্রায় এক শতাব্দী কাল। মেদিনীপুরবাসীকে অবশ্যই এই দুঃখের অংশভাগী হতে হয়েছিল।

পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুরের দুঃখ-দুর্দশা এক গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের মেদিনীপুরের ইতিহাস পুস্তকে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি পাওয়া যায়—

"পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুরের দুঃখের অন্ত ছিল না। পাঠান মোগলের নিয়ত বিবাদে, জমিদারদের অত্যাচারে মেদিনীপুরের প্রজাসাধারণ নিতান্ত অশান্তিতে দিন কাটাত। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে হিন্দুরাজত্বের শেষ অবস্থায় তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ

পাইয়া ক্ষমতাশালী দেশাধিপতিগণ একপ্রকার অর্দ্ধ-স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠান রাজত্বেও তাঁহারা কতকটা করদ-মিত্র রাজার ন্যায় ছিলেন। সাধারণ প্রজার চিন্তা, দেশরক্ষণের ভার তাঁহাদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। সেইজন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনে বিস্তর সৈন্য ও সৈন্যদিগের গমনোপযোগী যানবাহন থাকিত। নির্দিষ্ট রাজকর দিলেই তাঁহারা স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজেদের এলাকায় চলিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা ছিল না। তাঁহাদের কর্মচারিরাও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। পাঠানরাজ সহজে তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ঐ সুযোগে প্রজা-সাধারণের উপর তাঁহারা যথেচ্ছাচার করিতেন, অথচ কোন প্রতীকার হইত না। সে সময় প্রজাগণের ধন-প্রাণ একেবারেই নিরাপদ ছিল না। বেদেরা ছেলে চুরি করিত, পথ বিপদ-সঙ্কুল ছিল, প্রজাদিগকে নানা প্রকার কর দিতে হইত, দিতে না পারিলে দুষ্ট জমিদারগণ প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দিত, কুলবধুগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অবমাননা করিত। পাছে তাহারা এই সকল অত্যাচারের ফলে গৃহত্যাগ করিয়া পালাইয়া যায়, এইজন্যে তাহাদের উপর পাহারা নিযুক্ত করা হইত। দরিদ্র উৎপীড়িত প্রজাগণ অগত্যা গরু, বাছুর, হাল, বলদ, গৃহ সামগ্রী যাহা কিছু থাকিত, তাহাই বিক্রয় করিয়া কর দিত কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় এক টাকার জিনিষ দশ আনায় বিক্রয় হইত। পোদ্দার বা মহাজনগণ প্রজাদিগের নিকট সাক্ষাৎ যমের ন্যায় পরিলক্ষিত হইত। টাকায় দশ পয়সা করিয়া বাটা দিতে হইত এবং এক টাকার দৈনিক সুদ এক পাই হিসাবে নির্দ্ধারিত ছিল।* এইরূপে কত প্রকারে যে প্রজাসাধারণ নির্য্যাতিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। তৎকালীন অনেক বৈষ্ণব কবির গ্রন্থে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডী কাব্যের (১৫৪৪ খৃঃ) ভূমিকায়ও উহার পরিচয় পাওয়া যায়। হোসেন শাহ কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের পর হইতেই এক প্রকার এই অশান্তির সূচনা হইয়াছিল এবং

*'A Glimpse of Bengal, Calcutta Review 1891 PP 852-58)

যতদিন না পর্য্যন্ত এই মোঘল রাজত্ব এদেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই অশান্তি স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে মোগল কুলতিলক আকবর সাহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইলে দেশের শান্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে।”

মুঘল যুগে যুবরাজ খুরম (শাজাহান) পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে তাঁর সৈন্যচালনা ঘটেছিল নারায়ণগড়ের মধ্য দিয়ে। তিনি নারায়ণগড় রাজার নিকট থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। সন্দেহ নাই নারায়ণগড় ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসীগণ এই অভিযানের ফলে বহু দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ও দুঃখভোগ করেছিলেন!

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে চিতুয়া-বরদার দুর্ধর্ষ জমিদার শোভা-সিংহ মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় ঐ অঞ্চলে (ঘাটাল মহকুমা) যে যুদ্ধোদ্যম আক্রমণ ও লুণ্ঠনাদির তাণ্ডব সৃষ্টি হয়েছিল তাতে প্রজাসাধারণকে বহু দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

এদিকে মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থান বর্গীর হাঙ্গামার ফলে যে ভীষণ উপদ্রব ও ভয়াবহ দুর্দশা কবলিত হয়েছিল তার তুলনা খুব কম। সেই অত্যাচারের স্মৃতি বহুকাল ধরে ঘুম পাড়ানিয়াগান রূপে বাংলার মায়েদের মুখে ঘরে ঘরে ধ্বনিত হ'ত।

'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এই দুর্দশার কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'সিরাজউদ্দৌল্লা' পুস্তকে বর্গীর হাঙ্গামার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ—

“সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী পঙ্গপালের মত বাংলাদেশেব বুকের উপর ঢুকে আসতে লাগল। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এতদিন যাদেব 'পার্বত্য মুষিক' বলে উপহাস করতেন, তোষামোদ পরায়ণ পারিষদগণ যাঁদের পিপীলিকাবৎ নখাগ্রে টিপে মারবেন বলে আস্ফালন করিতেন সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ কঙ্কন প্রদেশের গিরিগহ্বরে দীর্ঘ দিন আত্মগোপন করে থাকেনি, মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতন কাল নিকটবর্তী বুঝে বাহু বলে, হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করবার আশায় তারা দলে দলে অসি হস্তে

দেশ বিদেশে ছুটে বেড়াতেন। অচিরকাল মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ তাদের হস্তে ক্রীড়া-বন্দুক হয়ে উঠলেন। তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রাজকরের চতুর্থাংশ 'চৌথ' আদায়ের ফর্মান পেয়ে বাহুবলে ন্যায্য পাওনা বুঝে নেবার জন্য বাংলাদেশেও পদার্পণ করল। বাংলার ইতিহাসে ওর নাম "বর্গীর হাঙ্গামা"।"

নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রথম যুদ্ধে সাফল্য লাভ করলেও (১৭৪১ খৃঃ অঃ) মারহাট্টা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিষ্ণুপুরেব বনেব মধ্য দিয়ে চন্দ্রকোণার প্রান্ত পার হয়ে তাঁর অভিযান চালিয়েছিলেন। আলিবর্দ্দী অত্যন্ত হীন কৌশল অবলম্বন কবে ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করল। এর পরবর্তী ঘটনাবলী যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত মেদিনীপুরের ইতিহাসে Holwells Interesting Historical Events ও রিয়াজ উস্ সালাতীন প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হ'ল ঃ—

এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মারহাট্টারা বাংলার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে লাগল। মেদিনীপুরের উপর দিয়েও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ব্বরোচিত নির্দ্দয়তা ও ভয়াবহ অত্যাচারের যাহা কিছু নিদর্শন আছে বর্গীর অত্যাচার, তুলনায় তাহার কোনটি অপেক্ষা অল্প ভীষণ নহে, বর্গীদিগের শানিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা, হিন্দু, মুসলমান কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা গ্রাম, নগর পুড়াইয়া শস্যের ভাণ্ডারে আগুন লাগাইয়া এবং শেষে মানুষের নাক, কান ও পুরস্ত্রীর স্তন কাটিয়া দিয়া নির্দ্দয়রূপে বাংলার সেনা ও প্রজাকুলকে সংহার করিতে আরম্ভ করে।' মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার সুম্ভাজীর সেনাপতি নীলু পণ্ডিত বার হাজার অশ্বারোহী, ছয় হাজার পদাতিক ও এক হাজার বন্দুকধারী সৈন্যসহ (১৭৬৯ খৃঃ অঃ) সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে বঙ্গ দেশের সীমায় উপস্থিত হয় এবং সমগ্র মেদিনীপুর প্রদেশকে ধ্বস্ত

বিধ্বস্ত ক'রে বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের ভীষণ অত্যাচারে মেদিনীপুর শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। শস্যের অভাবে, ক্ষুধার জ্বালায়, মনুষ্য কলাগাছের তেউড় এবং পশুরা খড় ও পোয়ালের অভাবে গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি করেছিল। যখন তাও জুটেনি তখন লোকে গৃহ, গ্রাম ও আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটিয়ে যে যে দিকে পেরেছিল পালিয়ে গিয়েছিল। বিশেষতঃ নদীর ধারে যে সকল গ্রাম ছিল সেগুলি প্রায় মনুষ্যশূন্য হয়েছিল।

এইভাবে বাংলার পশ্চিম দুয়ার মেদিনীপুরের উপর দিয়ে অভিযান, দিগ্বিজয় লুট ইত্যাদি অত্যাচার মৌসুমী বায়ুর মত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এক সময়ে মারাঠাদের অভিযানে কলিকাতা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। কাঁথি মহকুমার পটাশপুর অঞ্চলে তাদের প্রভুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

এদিকে বিদেশীদের লুব্ধ দৃষ্টি ভারতের ঐশ্বর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি জলপথে ভারতের মাটিতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিল। পর্তুগীজরা ভারতের পূর্ব উপকূলে এসে মেদিনীপুরের হিজলী বন্দর, খেজুরী বন্দর প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থায়ী করার চেষ্টা করে। এই সুযোগে পর্তুগীজ জলদস্যুরা যে লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালিয়েছিল সে কাহিনীও অতি নির্ম্মম।

১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তোন্মুখ হওয়ার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা সুস্থির হতে পারেনি। বাংলার মসনদ দখলের প্রতিযোগিতা ও ষড়যন্ত্র, ইরাজের বণিকবুদ্ধির খেলা এবং দেশে সুস্থ শাসন ব্যবস্থার অভাবে তাদের ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজদণ্ড অধিকারের জন্য কুট-কৌশল, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ঘৃণ্যপন্থা অবলম্বন তখন একটা নিয়ম হয়ে উঠেছিল। তার দুর্ভার বহন করতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। তার শিকার হয়েছিল চাষী, শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—গ্রাম্য জীবনের শান্তি ও সুস্থতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিদেশী বণিকের দালালদের অত্যাচারে অবারিত সমুদ্রের

লবণাক্ত জল দিয়ে লবণ প্রস্তুত করা, হাতের তাঁতে ঘরের ও প্রতিবেশীর কাপড় বোনা—আর উৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলি বিস্তৃততর বাজারে পণ্যরূপে পাঠিয়ে দেশের বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা বিদেশীর গুপ্ত ও প্রকাশ্য অত্যাচারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজের দেশ থেকে এল লবণ, চিনি, কাপড আরও কত কি, রাজশক্তির সহায়তায় বণিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হতে লাগল দেশে। মেদিনীপুর জেলার মত জেলার অধিবাসী যারা চাষী, শিল্পী ও উৎপাদক—তাদের 'গোলায় গোলায় যে ধান ছিল এবং গলায় গলায় গান ছিল' তার সর্ব্বনাশ ঘটল। সে নিঃস্ব পরমুখাপেক্ষী বণিকের দাদনের ভিখারী রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবন কাটাতে লাগল। লবণ ব্যবসায়, বস্ত্র ব্যবসায়, রেশম, তসর, চিনির উৎপাদন সবই তার হাত থেকে চলে গেল। তাদের ভাগ্যে রইল 'খোসাভূষি' শেষে 'হায়রে রাজা সুকঠিন' চরম অত্যাচারের দিন এল নীল চাষের প্রবর্ত্তনে। চলল গ্রামে গ্রামে ভয়াবহ জবরদস্তি। অনিচ্ছা ও আদেশ পালনের ত্রুটির প্রতিফল পেতে হল বেত, লাঠি, ফাঁসি কাঠের দণ্ড ভোগ করে। জেলার মানুষের যা ছিল শক্তি সামর্থ্য তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল বিদেশীর অত্যাচারে। যে জেলার আর্থিক জীবন ছিল কৃষি ও গ্রামীন শিল্পনির্ভর তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। রইল পড়ে এক শক্তি সম্বলহীন কঙ্কালবৎ সত্ত্বা। মেদিনীপুববাসী এই দুঃখী দুর্গত জীবন বহন করে এসেছে বছরের পর বছর ধরে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ। এই জেলাতে মধ্যে মধ্যে ঘটেছে অজস্রা: সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিবাত্যা নদীর বন্যা প্রভৃতি প্রকৃতিব নিষ্করুণ ভয়াল মূর্তি সৃষ্টি করেছে দেশ ব্যাপী হাহাকার।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষ দেশে অতি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিকগণের অনুমাণ এর ফলে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

১৭৬৯-৭০ সালের বাংলা-দেশে এবং ১৮৬৫-৬৬ সালে উড়িষ্যাতে বৃষ্টির অভাবে যে শস্যহানি হয় তার ফলে দুর্ভিক্ষ ঘটে। এই জেলার সঙ্গে তার ভীষণ স্মৃতি জড়িত হয়ে রয়েছে। ১৮৬৬ সালে সমগ্র

উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রদেশ এবং মেদিনীপুরে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতে সমগ্র জেলা ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং এই জেলার প্রায় ৫০ হাজার লোক প্রাণ হারায়। জীবিত ব্যক্তিদের দুর্দশার অবধি ছিল না।

১৮৬৪ সালে ৫ই অক্টোবর কাঁথি ও তমলুক মহকুমাতে একটি নির্মম ঝটিকাবর্ত ও বন্যার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমৃদ্ধিশালী খেজুরী বন্দর ধ্বংস হয়ে যায়। হাণ্টার সাহেব এই অবস্থার একটি হৃদয়-বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন। সে সময় দেশ এরূপ জনসমাগম শূন্য হয়েছিল যে ক্ষেত্রের সুপক্ক শস্য ছেদন করারও লোক ছিল না। এই বন্যা সম্বন্ধে 'খেজুরী বন্দর' ও 'হিজলীর মসনদ-ই-আলা' গ্রন্থের প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ করণ লিখেছেন—"মৃত্যু সংখ্যার বিশালতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে যে এতদঞ্চলে একটি দায়রা সোপর্দ মকদ্দমায় ৩২ জন আসামী ছিল কিন্তু বন্যার পর তাহাদিগের মধ্যে মাত্র ২ জনকে জীবিত পাওয়া গিয়াছে"।

যোগেশচন্দ্র বসু লিখিত মেদিনীপুরের ইতিহাসে (পৃঃ ৬৭৪) লিখিত হয়েছে—"বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি ঝটিকাবর্তে এই জেলাবাসীকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে তন্মধ্যে ১৮০৭, ১৮২৩, ১৮৩১, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৬৪, ১৮৬৭ ও ১৮৭৪ সালের ঝটিকাবর্তের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮০৭ সালে ১০ই মার্চ তারিখের ঝড়ে মেদিনীপুর জেলার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পর ১৮২৩ সালে ২৭শে মে তারিখের ঝড়ে বঙ্গোপসাগরের জল এত উচ্চ হইয়াছিল যে উহা কাঁথির তদানীন্তন কালেক্টরের কাছারি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুদয় কাগজপত্র ভাসাইয়া লইয়া যায়।

১৮৩১ থেকে ১৮৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত পর পর তিন বৎসরের বন্যায় দেশবাসী সর্বস্বান্ত হয়েছিল। শেষোক্ত বৎসরে বঙ্গোপসাগরের জল প্রবাহের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে সমুদ্র বেষ্টক সুউচ্চ বাঁধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কালেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায় এই বন্যায় ৮৬৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল এবং ৭১১২ জন মানুষ জলমগ্ন হয়েছিল।

১৯০৮ সালে একবার সুবর্ণরেখা নদীতে বন্যা হয়। তৎপরে ১৯১৩ সালে একদিকে সুবর্ণরেখার ও অন্যদিকে কেলেঘাই নদীর বন্যায় নদী দুটির বাঁধ ভেঙ্গে সমগ্র কাঁথি মহকুমা এবং সদর ও তমলুক মহকুমার কিয়দংশ প্লাবিত হয়ে যায়। বাংলা সরকারের তদানীন্তন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার য়্যাডামস্ উইলিয়াম বন্যা প্রতিকার কল্পে একটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তী ১৯২৬ সালের কেলেঘাই নদীর আরেকটি ভীষণ বন্যায় মেদিনীপুর সদর, তমলুক ও কাঁথি মহকুমার প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায় ১৯২৬ সালের বন্যায় ২৯,৪২,৮৩৪ টাকার ধান্য ৩,৫২,১৭০ টাকার মৎস্য ও ৭৬,২০০ টাকা মূল্যের পান নষ্ট হয়েছিল এবং ৮৮২৩টি গৃহ ভূমিসাৎ হয়েছিল। নষ্ট গৃহগুলির আনুমাণিক মূল্য ৩,৪৬,৭৪০ টাকা স্থির হয়েছিল। সে সময় কংগ্রেস, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী সম্প্রদায়, আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কর্মীসঙ্ঘ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান ও অনেক সদাশয় ব্যক্তিও চাউল অর্থ ও বস্ত্রাদির দ্বারা এদেশবাসীর সাহায্য করেন।

কেলেঘাই নদীর বন্যা ব্যতীত কংসাবতী ও শীলাবতী নদীর বন্যার দ্বারাও সময়ে সময়ে সদর ঘাটাল ও তমলুক মহকুমা বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে ঘটেছে অজস্র সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ঘুর্নীব্যাত্যা ও মহামারী। প্রকৃতির নিষ্করুণ, ভয়াল মুর্ত্তি সৃষ্টি করেছে দেশব্যাপী হাহাকার। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৬০ খৃঃ আঃ) ভয়াবহ দিনগুলি মেদিনীপুর জেলাবাসীর পক্ষেও ছিল চরম দুর্দ্দশার কাল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বর্গীর হাঙ্গামা প্রভৃতি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা।

তথাপি এই জেলার মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েনি, মানসিক দৈন্যভারে তারা নিঃস্ব হয়ে যায়নি। দক্ষিণের সমুদ্র বেলা ও শ্যাম-বনানীর সরসতা, উত্তরের কঙ্করময় মাটির দৃঢ়তা ও মধ্যভাগের স্বর্ণাভ শস্যের উজ্জলতা এই জেলার মানুষকে দিয়েছে এক অপূর্ব প্রাণশক্তি,

—তারই সবল চেতনায় সে শত বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেও কর্মচঞ্চল, অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর ও সংগ্রামশীল।

মেদিনীপুরের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস মেদিনীপুর বাসীর অপ্রমেয় প্রাণশক্তির পরিচয়ই বহন করে। কবির কথায় বলা যায়ঃ—

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশীষে অমৃতের টিকা পরি।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেদিনীপুরের কয়েকটি খণ্ড বিদ্রোহ

ভারতে ইংরাজদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গনে ভারতের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হয়েছিল। সেখানে শৌর্য্য-বীর্য্যের কোন প্রসঙ্গ ছিল না, ছিল মাত্র বিশ্বাসঘাতকতা, ছল ও চাতুরী। নবাব সিরাজদৌল্লার সেনাপতি মীরজাফরের রাজ্যলাভ-লালসা ঘটিয়েছিল সকল মনুষ্যত্বের বিলোপ। মোহনলাল-মীরমদনের বীরসুলভ যুদ্ধোদ্যম ব্যাহত হয়ে গিয়েছিল শঠতার পাষাণ প্রাচীরে আহত হয়ে। ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তাদের প্রাণপাত সংগ্রাম-কুশলতা। ক্লাইভ-মীরজাফরের গোপন চক্রান্ত যে কুহেলিকা সৃষ্টি করেছিল, তাতে ইংরাজই হয়েছিল জয়ী। শোনা যায় মোহনলাল ছিলেন মেদিনীপুরের এক বীরসন্তান। কিন্তু বীরের রক্ত সেদিন ভারতের গৌরব রক্ষা করতে পারেনি। হীনতা, কপটতা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতারই হয়েছিল জয়। মোঘল মহিমা তখন অবলুপ্ত, কাজেই দিল্লীর শক্তিও সেদিন নির্বীর্য্য হয়ে পড়েছিল।

রত্নপ্রসূ ভারতের ঐশ্বর্য্যের লোভে দিনেমার, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বণিকজাতি ভারতপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিল ধনরত্ন সংগ্রহের জন্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ হয়েছিল

ইংরাজ বণিকেরই। ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। ইংরাজকে সেজন্য অল্প পরিশ্রম, অল্প কৌশল ও অল্প কূটনীতি প্রয়োগ করতে হয়নি। রাজ্যলাভ, রাজ্য বিস্তৃতি, রাজ্য রক্ষা এবং সমস্ত বিরোধী শক্তি দমনে ইংরাজ প্রতিনিধিকুলকে অসীম শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। আক্রমণের প্রতিরোধ, বিদ্রোহ দমন বিপক্ষের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি নানা কৌশল ও অপকৌশলে বিচ্ছিন্ন ভারতীয় শক্তিসমূহকে নিষ্ক্রিয় ক'রে ইংরাজকে ভারতের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হয়েছিল।

মেদিনীপুরের বিদ্রোহী মনের প্রকাশ

ইংরাজ সৌভাগ্যের প্রথম সূচনাভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার অনতি-দূরবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলাতে ইংরাজকে যে দুর্বার বাধা অতিক্রম করে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল তারই কিছু পরিচয় সমকালীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রয়েছে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিমের নিকট থেকে ইংরেজদের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু মেদিনীপুর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে প্রায় ১০০ ক্রোশ দীর্ঘ এক শ্রেণীর কৃষকঅধ্যুষিত 'জঙ্গলমহাল' নামে পরিচিত অঞ্চলের প্রজাগণের উপর ক্ষমতার বিস্তার বা তাদের নিকট থেকে কর আদায় সহজকার্য্য ছিল না। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইংরাজশাসনের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলেছিল। ইংরাজ ইহার নাম দিয়েছিল 'চুয়াড়' বিদ্রোহ। 'চুয়াড়' একটী হীন গালাগালি বোধক শব্দ। সভ্যসমাজের অনুপযুক্ত, দুর্বিনীত অসভ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত, সর্ব্বদা মারমুখী ব্যক্তিদের প্রতি 'চুয়াড়' গালাগালি ব্যবহার করা হয়। এইসব অঞ্চলের স্বাধীনচেতা ভূম্যাধিকারী ও কৃষকগণের সহজবশ্যতার লক্ষণ না দেখে ইংরেজ এদের প্রতি 'চুয়াড়' শব্দ প্রয়োগ করেছিল। লোধা, মাঝি, কুড়মি, বাগদী, ভঞ্জ, কোরা, কুড়মালী, মুণ্ডারী প্রভৃতি সাহসী কৃষক ও মজুর সম্প্রদায়ভুক্ত

ব্যক্তিগণকে কোম্পানী দীর্ঘকাল আয়ত্তে আনতে অসমর্থ হয়ে এদেরকে 'চুয়াড়' ও 'বিদ্রোহী' বলে অভিহিত করেছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমভাগে অবস্থিত ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, শিলদা, জামবনি, প্রভৃতি স্থানের রাজা ও জমিদারগণ বহুকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবেই রাজ্য চালিয়ে আসছিলেন। এঁরা দুর্গম অরণ্যময় স্থানে পরিখাবেষ্টিত গড় স্থাপন করে বাস করতেন। এঁদের প্রজারাও ছিলেন নির্ভীক ও দুর্দ্ধর্ষ। ভূস্বামীদের প্রতি এই প্রজাদের গভীর আনুগত্য ছিল কিন্তু এরা কখনও ভূস্বামী-দের কোন অন্যায় অত্যাচার সহ্য করত না। কোন কোন সময় জমিদারি ত্যাগ করে এরা অন্য জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করত। এইরূপ স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যেই এরা ইংরাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিল।

প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ

'প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ' নামে অভিহিত ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে জঙ্গলমহল নামে একটি বিস্তৃত বনাঞ্চল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলটিকে মেদিনীপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। চোয়াড়গণ ছিল এই জঙ্গলমহলএরই অধিবাসী। কৃষিকার্য্য পশুপক্ষী শিকার এবং জঙ্গলমহলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করে এদের জীবিকা নির্বাহ হোত,—এদের অধিকাংশ লোকই স্থানীয় জমিদারের অধীনে 'পাইক' বা 'সৈনিকের' কাজ করতো। বেতনের পরিবর্তে তারা জায়গীর বা জমি পেত। তখন প্রায় সব সময়েই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। এদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর, টাঙ্গি, বর্শা, বাঁটুল প্রভৃতি।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী স্থির করেন যে মেদিনীপুর জেলার উত্তরপশ্চিম ভাগের জঙ্গল মহলে সৈন্য পাঠিয়ে সেই সকল

স্থানের অবাধ্য জমিদারদের রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করবেন আর তাঁদের দুর্গগুলি ভেঙে ফেলে তাঁদের দুষ্টনীড় নষ্ট ক'রে দেবেন। বৃদ্ধি খাজনা দিতে অপারগ জমিদারগণ মহাজনশ্রেণীর নিকট থেকে চড়া সুদে প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে তারা প্রায় ভিক্ষুক শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হয়েছিল। কোম্পানীর সিপাহীরা নিরন্ন 'চুয়াড়' রায়তদের উপর বর্বর অত্যাচার সুরু করলো এবং অরণ্যে পলায়নপর গ্রামবাসীদের উপর গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। তাই সংশ্লিষ্ট জমিদারদের নেতৃত্বে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই প্রায় ২০০ শত ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত জঙ্গলমহলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এরই নাম প্রথম 'চোয়াড় বিদ্রোহ'।

এরসঙ্গে আরও একটা কারণ জড়িত ছিল। মোঘল সরকারের মতো নবাগত ইংরেজ সরকারেরও ভূমিরাজস্ব এই জমিদারগণ আদায় করে দিতো কিন্তু এই নবাগত ইংরেজরা ভূমির রাজস্ব পরিমাণ এতো বেশী বৃদ্ধি করে যে তাতে অত্যাচারী জমিদারদের পক্ষেও তা আদায় করা সম্ভব হয়ে উঠতো না, ফলে আনুসঙ্গিক নির্যাতনও ভোগ করতে হোত এই নির্যাতন চরমে ওঠার ফলেই বিদ্রোহের আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে উঠতে থাকে।

১৭৮৬ সালের শেষভাগে মন্বন্তর সুরু হোল। ক্ষুধার তাড়নায় কুচাং, বামন ঘাটি, ঘাটশিলা প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদাররা ও তাদের প্রজারা জঙ্গলের কর আহরণ ক'রে কোনমতে বেঁচে থাকতো। তখন নেমে এলো তাদের মধ্যে শ্মশানের শান্তি। একদিন এইসব প্রজারা মারাঠা বর্গীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো, মুঘল, ইংরাজ সৈনিকদের এবং তাদের পশ্চাতের কুসীদজীবীদের রুখেছিলো, আজ তারা হীনবল হয়ে মৃত্যুকবলিত হতে থাকলো। ইংরাজ কোম্পানী তাদের জন্য কিছু খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলো বটে কিন্তু তাদের খাজনা মুকুব করেনি। মন্বন্তরের সময়ে বহুলোক নিকটবর্ত্তী মারাঠা রাজ্যে পলায়ন করেছিলো। জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় নূতন করে জমি

বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। ঐতিহাসিকদের মতে এই সময়ে দুই তৃতীয়াংশ গ্রামীণ অভিজাত বংশের বিলোপ ঘটে।

ঘাটশিলার বৃদ্ধ জমিদারই ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। যিনি অদম্য সাহস ও ভীষণ পরাক্রমের সংগে যুদ্ধ করেও দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত ও সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন, অনন্যোপায় হ'য়ে ইংরেজরা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধলকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানেই প্রথম 'চোয়াড়' বিদ্রোহের যবনিকা পড়ে।

তথাকথিত চোয়াড়দের মধ্যে পুনরায় একবার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিলো তা 'দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ

১৭৯৮--৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে একটি বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। এই বিদ্রোহই 'দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ' নামে খ্যাত।

চোয়াড়গণ এতদিন জঙ্গলমহলের যে সকল ভূমিতে বিনা খাজনায় এবং স্বাধীনভাবে চাষবাস ক'রে কোন প্রকারে নিজেদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতো, ইংরেজ শাসকগণ সেই সকল জমিজমা চোয়াড়গণের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে উচ্চ মূল্যে জমিদারদের কাছে বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। এতে চোয়াড়েরা প্রথমে প্রতিবাদ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয় এবং তা ভয়ংকর রূপ ধারণ কবে।

এই সময়ে ইংরেজ শাসকগণের উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হ'য়ে আর একটি শক্তি 'চোয়াড়'দের সঙ্গে যোগদান করেছিলো, এদের নাম 'পাইক'। ইংরেজ শাসনের পূর্বে 'পাইক' সম্প্রদায় ছিল এক প্রকারের 'পুলিশ'। এই কাজের জন্য তারা মোঘল সরকারের কাছ থেকে বিনা খাজনায় জমি ভোগ করতো। এ ক্ষেত্রেও ইংরেজ শাসকগণ সামরিক শক্তির সাহায্যে পাইকদের জমি থেকে উচ্ছেদ ক'রে সেই জমি কয়েকজন জমিদারদের কাছে বিক্রয় করে, ফলে প্রায় ২৫ হাজার 'পাইক'

গৃহজমি ও জীবিকা হারিয়ে 'চোয়াড়' বিদ্রোহে যোগদান ক'রে এর শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি করে।

এই সময়ে কয়েকজন জমিদার ইংরেজ শাসকগণের সর্ত্ত অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ করের বোঝা বহন করতে না পারায় তাদের জমি কেড়ে নিয়ে ইংরেজরা নূতন লোকদের কাছে ইজারা দেয়, এর ফলে জমিদারী হারিয়ে তারাও এসে 'চোয়াড়' এবং 'পাইক'দের সঙ্গে যোগ দেয়। এঁদের মধ্যে রায়পুর পরগণার জমিদার দুর্জন সিংহেব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চোয়াড় ও পাইকদের প্রভূত শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে বিদ্রোহের দাবানল দ্বিগুণ জোরে জ্বলে উঠেছিলো।

অত্যাচারিত জমিদারগণের মধ্যে মেদিনীপুব সহরের অনতিদূরে অবস্থিত কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির জমিদারি বাজেয়াপ্তি একটি অতি মর্ম্মান্তিক ঘটনা। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ আত্ম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাণী ও তাঁর কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাতে কালেক্টার রাণীর বাজ্য বাজেয়াপ্ত করেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্রবধূ শৌর্য্যের জন্য খ্যাত অজিত সিংহের বিধবা পত্নী রাণী শিরোমণি অতি অল্প বয়সে পবলোকগত নিঃসন্তান স্বামীর উত্তরাধিকারত্ব প্রাপ্ত হয়ে দয়াদাক্ষিণ্য এবং দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে প্রজাগণের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই স্বাধীন-চেতা মহিলার প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যেই অতি দ্রুত তাঁর রাজ্য বাজেয়াপ্ত ক'রে তাঁকে ক্ষমতাহীন করার চেষ্টা হল। অন্য দিকে নানা অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি প্রমুখ চোয়াড় প্রজারা তাঁর সহায়তা লাভে কৃতকার্য্য হওয়ায়, তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজরা কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বৃটিশ আমলে তিনি ছিলেন প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী। নাড়াজোলের রাজা চুনিলাল খাঁন তাঁর সহযোগী হওয়ায় তাঁকেও বন্দী করা হয়েছিলো। অবশেষে রাণীর মুক্তি ঘটেছিল কিন্তু তাঁর সাহস, দৃঢ়তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার শক্তির জন্য তাঁকে বহু ক্লেশও ভোগ করতে হয়ে

ছিল। মেদিনীপুরের ইতিহাসে তাঁর কীর্ত্তি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে

ইংরেজরাজের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ও উৎপীড়নই যে চোয়াড় বিদ্রোহের প্রধান কারণ তা তাঁরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ মেদিনীপুরের ইতিহাসে ভয়ংকর চোয়াড় বিদ্রোহেব ইতিহাস রূপে চিহ্নিত হয়ে রইলো। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মেদিনীপুর জেলায় একটি সৈন্যবাহিনী প্রেবণের ফলে সেখানে আংশিক শান্তি এসেছিল বটে, তবে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এদের নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর উপদ্রব সমানে চলেছিলো।

এর পরেই বিদ্রোহীদের আক্রমণ চরমে ওঠে। মেদিনীপুর সহর থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত এই পরগণাটি বিদ্রোহীদের আক্রমণে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা শালবনী সহরে অবস্থিত প্রধান তহশীলদারের কাছারী, সরকারী অফিস, সৈন্য বারাক সবকিছু লুণ্ঠন করে ধ্বংস করে দেয়। তারা দুজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে। দেখতে দেখতে শালবনী সহর জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হয়। বহু প্রজা মেদিনীপুর সহরের ১২ মাইল দূরবর্ত্তী আনন্দপুর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা জমিদারী সংক্রান্ত সকল দলিলপত্র একত্র করে বহ্ন্যুৎসব করে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে 'জঙ্গল মহল' এ রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কালেক্টর সাহেব 'জঙ্গল মহল' থেকে রাজস্ব আদায় করা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েন কারণ চোয়াড়গণ আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলো, যে এখান থেকে রাজস্ব আদায় করতে আসবে তাকেই তারা হত্যা করবে। এই সমগ্র অঞ্চলে বিশেষতঃ ট্যাপা বাহাদুরপুর পরগণার রাজস্ব আদায় করতে যেতে সম্মত হয় এরকম কোন লোক পাওয়াই সম্ভব হোল না। কালেক্টার সাহেব Revenue Board কে লিখে পাঠালেন যে "বিদ্রোহীরা মফঃস্বলের সরকারী কর্মচারীদের সকলকে হত্যা করবে

বলে ভীতি প্রদর্শন করায় তারা সকলে উধাও হয়েছে। আতঙ্কে অবশিষ্ট সকলে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। 'জঙ্গল মহল' থেকে রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।"

এর পরে চারদিকে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ পূর্ণবেগে চলতে থাকে, সর্বত্র লুণ্ঠন ও ছারখার করতে করতে তারা মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী হয়।—কিন্তু এই সময়ে একটি ইংরেজ সৈন্যদল উপস্থিত হওয়ায় তাদের আক্রমণ কিছু কালের জন্যে বন্ধ থাকে—শহরের উপরে আক্রমণ না হ'লেও বিদ্রোহীরা প্রতি রাত্রে গ্রামগুলি লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করতে থাকে।

এমন সময়ে গুজব রটে যায় যে ১৯শে মার্চ রাত্রিকালে অথবা পরদিন প্রত্যুষে দুই হাজার বিদ্রোহী চোয়াড় মেদিনীপুর শহর আক্রমণ ও লুণ্ঠন ক'রে পুড়িয়ে দেবে। কালেক্টর সাহেব আতঙ্কিত হ'য়ে Revenue Boardকে একথা লিখে জানান। এক জায়গায় লেখেন যে "বিদ্রোহীরা অবাধে সর্বত্র লুণ্ঠন ক'রে বেড়াচ্ছে। দুটি গ্রাম লুণ্ঠিত হয়েছে। মজুত শস্যে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে; বহু সরকারী দলিলপত্র বিনষ্ট হয়েছে। সর্বত্র ভয়ঙ্কর অরাজকতা চলছে।"

চোয়াড় বিদ্রোহীরা জানতেন যে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তাঁরা পারবেন না তাই বিদ্রোহীরা জেলার সকল জমিদার, তহশীলদার প্রভৃতিকে পত্র দ্বারা সতর্ক করেছেন যে তারা যেন ইংরেজ পক্ষের সৈন্যদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ না করে, তাহ'লে সৈন্যরা খাদ্যাভাবে এখান থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হবে।

এরপর মেদিনীপুরে বহু সৈন্য এসে উপস্থিত হ'লে মেদিনীপুরের উপরে আক্রমণের আশংকা দূরীভূত হয়।

এদিকে এতো চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্রোহ দমন করতে না পেরে কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় শাসকগণ বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েন। অবশেষে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে কেবল সামরিক শক্তির দ্বারা এই গণ বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন না। বিদ্রোহীদের শান্ত করবার জন্যে

তাদের দাবী সম্বন্ধে নূতন ক'রে বিবেচনা করা প্রয়োজন। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পাইকদের জমি ফেরৎ দিয়ে পূর্বের মতো নাম মাত্র খাজনা ধার্য্য করবার পরামর্শ দেন। এবারে Revenue Board বুঝতে পারেন যে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা ভুল হয়েছে।

ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবার জন্যে কেবল প্রথম যুগেই নয়, শেষ দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসকগণ জনগণের মধ্যে যে ভেদনীতি প্রয়োগ কবেছিলেন, সেই ভেদনীতির সাহায্যেই তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁরা বুঝেছিলেন, চোয়াড় ও পাইকদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। তা-ই তাঁরা করলেন। তাতে শুধু যে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হোল তাই নয়, যে জমিদারগণ এতো দিন শাসকগণের উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্যে বিদ্রোহীদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করছিলেন, তাঁরাও বিদ্রোহীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসকগণ চিরস্বাধীন চোয়াড় সর্দারগণকে অর্থের দ্বারা বশীভূত ক'রে তাদের দমন করবার ব্যবস্থা করলেন। মহাশক্তিমান ইংরেজ বণিকরাজের উন্নত অস্ত্র শক্তি যেখানে পরাজিত হয় তাঁদের অর্থ শক্তি সেখানে জয়লাভ করে। বলের দ্বারা নয়, কৌশলেব দ্বারাই চোয়াড় বিদ্রোহ দমন করা সফল হ'য়েছিলো। ঐতিহাসিকদের মতে এই সংঘর্ষে ৭০০০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু এতেও তাঁদের ভয় দূর না হওয়ায় এই বিদ্রোহী মানুষগুলির সকল শক্তি চূর্ণ ক'রে তাদের চিরদিন শাসন শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবার জন্যে এই অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুর শহরটিকে কেন্দ্র ক'রে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের দুর্গম বন অঞ্চলগুলি নিয়ে 'জঙ্গল মহল' নামে একটি বিশেষ জেলা গঠিত হয় এবং একজন দুর্ধর্ব প্রকৃতির ইংরেজ এই নূতন জেলার

শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই 'জঙ্গলমহল'ই বর্তমান কালের 'বাঁকুড়া' জেলা।

দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ মেদিনীপুর জেলায় বহু বিস্তৃত হয়ে উঠে ছিল। শিলদা, বগড়ী, কাশীজোড়া প্রভৃতি পরগণাতে এবং লালগড় আনন্দপুর, নাড়াজোল, চন্দ্রকোণা, বাসুদেবপুর (তমলুক মহকুমা) এবং কংসাবতী ও রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্তী অনেক স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। ব্রিটিশের ক্ষমতা কেন্দ্র মেদিনীপুর শহরও নিরাপদ ছিল না। মেদিনীপুরের নিকটবর্তী শালবনী, বাহাদুরপুর ও কর্ণগড়, বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি হ'য়ে উঠেছিল। চোয়াড় ও নায়েকদের মধ্যে মীর আলি, তারা নায়েক, সূর্য্য পণ্ডিত, দেবেশ্বর, মহেশ্বর প্রভৃতি ব্যক্তি তাঁদের বিপ্লবাত্মক কার্য্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হ'য়ে উঠে ছিলেন। ১৮০০ সালের প্রথম দিকে দেশে অনেকটা শান্তি ফিরে আসে, তথাপি অশান্তির জের মেটেনি।

এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশের বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির ইতিহাসে একটি অতি গৌরবময় ঘটনা। এই বিদ্রোহ এক সময়ে উক্ত অঞ্চলগুলির কৃষকদের ইংরাজ ও জমিদার বিরোধী সংগ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ক'রেছিল এবং একথাও সত্য যে সেই প্রভাবের রেশ আজও পর্যান্ত নিঃসন্দেহে এই সকল অঞ্চলের কৃষকদের মনে অনুরণিত হয়।

গভর্ণরের আদেশ অমান্যে
রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া

রাণী শিরোমণির সাহসিকতা ও দৃঢ়তা স্মরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার সাহসের কথাও স্মৃতিপটে উদিত হয়। রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া ছিলেন তমলুক রাজ বংশের রাজা কৃপানারায়ণের পত্নী। ইনি এবং রাজা নরনারায়ণের পত্নী সন্তোষপ্রিয়া বিস্তৃত জমিদারী পরিচালনা করতেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত মহারাজা নন্দ-কুমারকে রাণী তমলুকের ৫ মাইল দূরবর্তী অধুনা 'নন্দকুমার' নামে

পরিচিত ৬ খানি গ্রাম দান করেছিলেন। সন্তোষপ্রিয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে ৮ খানি গ্রাম দিয়েছিলেন। এই দুইজন শক্তিশালী ব্যক্তি দুই রাণীকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে তমলুক জমিদারী ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এই কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ দুই রাণী এঁদেরকে গ্রামগুলি প্রদান করেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী সন্তোষপ্রিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র রাজা আনন্দনারায়ণের সঙ্গে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার মনোমালিন্য ঘটে। তমলুক রাজপরিবারের দুর্গাপূজা 'বৈঁচবেড়িয়া' গ্রামে অনুষ্ঠিত হোত কারণ দেবী বর্গভীমার স্থান হিসাবে তমলুক শহরে চতুঃসীমার মধ্যে দুর্গাপূজাদি নিষিদ্ধ ছিল। উক্ত মনোমালিন্যের ফলে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া আনন্দনারায়ণকে বৈঁচবেড়িয়া গড়ে দুর্গাপূজা করতে না দেওয়ায় তিনি রাণীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেন এবং পূজার অধিকার লাভ করেন। এই অধিকার যাতে কার্যকরী হয় সেজন্য কোম্পানী একদল সিপাহী পাঠান। রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া এদের বাধা দেন এবং একটি খণ্ডযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্রিয়ার জমিদারী কোম্পানীর খাস দখলে চলে যায়।

যদিও ব্যাপারটি গৃহবিবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট তথাপি এটি স্মরণ যোগ্য ঘটনা এই জন্য যে এই সময়ে একজন মহিলা গভর্ণরের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস অবলম্বন করেছিলেন এবং গুরুতর বিপদের ঝুঁকি নিয়েও মস্তক অবনত করেননি।

নায়েক বিদ্রোহ

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে 'চোয়াড়' বিদ্রোহের পরেই 'বগড়ীর নায়েক বিদ্রোহ' মেদিনীপুর জেলার বিদ্রোহের প্রধান ঘটনা। নায়েক সম্প্রদায় চোয়াড়গণেরই প্রায় সমগোত্রীয়। বগড়ীর রাজবংশ কর্তৃক এঁদের জায়গীর নির্দিষ্ট করা ছিলো। নায়েক সম্প্রদায় সেই জায়গীর জমিতে চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করতো এবং

রাজার অধীনে পাইক বরকন্দাজের কাজ করতো এবং প্রয়োজন হলে এরা যুদ্ধবিগ্রহে রাজাদের সাহায্য করতো।

ইংরেজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East India Company) বঙ্গদেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে সর্বত্র উম্মত্তের মত ভূমি-রাজস্ব বর্দ্ধিত করতে থাকলে বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। ছত্রসিংহের পিতা স্বনামখ্যাত যাদব চন্দ্র সিংহ বা যদুসিংহ বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রদেশে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠার কালে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন এবং দীর্ঘকাল বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। তাঁর জমিদারীভুক্ত রায়পুর পরগণার প্রজাদের উপর সালভূম অভিজানের সময় প্রেরিত সৈন্যদলের অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালনার এবং তাঁর তহশীলদারদের বন্দী করে অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং বিদ্রোহ চালিয়ে বন্দী হন। বন্দীদশায় একটি বিষপূর্ণ অঙ্গুরীয় চুষে তিনি প্রাণত্যাগ করেন, এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর তেজস্বিতা ও সাহসের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন—তাঁর পুত্র ছত্র সিংহ। ইংরেজ শাসকগণ ছত্রসিংহকে তাঁর বিদ্রোহের জন্য রাজাচ্যুত করে বগড়ীর জমিদারী ভিন্নব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। এই সময় নায়েকদের জমিজমাও বাজেয়াপ্ত করা হয়—এবং নায়েকরা তখন জমিজমা হারিয়ে অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে এসে পড়ে।

এই সঙ্কটকালে অচল সিংহ নামে এক ব্যক্তি নায়েক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ শক্তির বিলোপ সাধন করে নায়েক সম্প্রদায়কে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলেন।

অচল সিংহ দীর্ঘকাল বগড়ীর রাজসরকারের অধীনে সৈনিক হিসাবে কাজ করে বিশেষ সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এঁদের অস্ত্রশস্ত্র ছিলো তীর ধনুক বর্শা ও তরবারি। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁরা কামান বন্দুকে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গেরিলা যুদ্ধ ছিলো এঁদের প্রধান কৌশল।

এই বিদ্রোহের আঘাতে বগ্‌ড়ীর পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুপুর ও হুগলীর ীর্ণ জনপদ পর্য্যন্ত কম্পিত হতে থাকে। বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসকগণের টনক নড়ে ওঠে। গভর্নর জেনারেলের আদেশে 'ও. কেলী' নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি একদল বৃটিশ সৈন্য নিয়ে বগ্‌ড়ী অঞ্চলে উপস্থিত হন এবং গনগনির অরণ্যে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারী সৈন্যদলেব খণ্ডযুদ্ধ চলে।

গেরিলা যুদ্ধে সুদক্ষ নায়েক বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে তারা সাধারণতঃ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে এসে হঠাৎ ইংরেজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু সংহার করে আবার অদৃশ্য হয়ে যেতো। ইংরেজরা অবশেষে নিরুপায় হয়ে একদিন রাত্রিকালে কয়েকটি কামান একত্রিত করে ক্রমাগত গোলাবর্ষণের দ্বারা সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করে ফেললো। এর ফলে নায়েকদের অনেকেই প্রাণ হারালো। পরদিন বৃক্ষশাখায়, বনান্তরালে ও নদীতীরে অনুসন্ধান কবে বহু সংখ্যক নায়েক নবনারীকে হত আহত ও বন্দী করা হোল কিন্তু নায়েকদের দলপতি অচলসিংহের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ইংরেজ শাসকরা বিদ্রোহীদের মনোবল সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে সক্ষম হোল না। অচলসিংহ গনগনির বন হ'তে পলায়ন করে জঙ্গলময় বগ্‌ড়ীর পশ্চিম প্রান্তস্থ অরণ্যে ঘাঁটি স্থাপন করেন। বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহীরা আবার একে একে এসে অচল সিংহের নূতন শিবিরে সমবেত হোল। এ ছাড়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ মহারাষ্ট্রীয়দের কবল থেকে উড়িষ্যা অধিকার করার পর বহু মহারাষ্ট্রীয় ও হৃতরাজ্য যোদ্ধা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিলো তারাও এই সময়ে এসে অচলসিংহের দলকে শক্তিশালী করে তুললো।

এই মিলিত বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের নষ্টঐশ্বর্য্য

পুনরায় উদ্ধার করতে লাগলো। ইংরেজরা এখন মরিয়া হয়ে অচল সিংহের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। এই সুযোগে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহ ইংরেজদের হিতসাধন করে তাঁর প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করবার আশায় বিশ্বাসঘাতকতা করে অচল সিংহকে ধৃত করে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করেন। ইংরেজগণ নায়েকবীর অচল সিংহকে গুলী করে হত্যা করে। নায়েক বীর অচল সিংহ রাজা ছত্র সিংহের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মস্তকে যে অভিসম্পাত বর্ষণ করেছিলেন পরবর্তী কালে তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিলো।

অচল সিংহ এই বলে অভিসম্পাত দেন যে, ইংরেজগণও তাঁর সঙ্গে এই রকমই বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তাঁর সমস্ত অভিসন্ধিই ব্যর্থ হয়ে যাবে। শেষ পর্য্যন্ত সেই ঘটনাই ঘটলো। ছত্র সিংহ অচল সিংহকে ইংরেজের হাতে তুলে দিলেও ইংরেজগণ ছত্র সিংহকে কখনো বিশ্বাস করতে পারেনি এবং তাকে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেয়নি।

অচল সিংহের মৃত্যুর পরে নায়েকগণ তাদের দলস্থ কয়েকজন সৈনিক পুরুষকে বিভিন্ন দলের দলপতি করে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলো। এই সময়ে একজন দুর্দ্ধর্ষ নেতা ছিলেন বিশ্বনাথ নায়ক—তিনি 'ভোন্দা বিশা' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বহু চেষ্টা করেও কোম্পানীর লোকেরা তাঁকে ধরতে পারেনি। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যদের পরাক্রমে নায়েকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। ইংরেজরা সেবারে প্রায় দুই শতাধিক বিদ্রোহীকে হত্যা করেছিলো।

'নায়েক বিদ্রোহ' বা 'নায়েক হাঙ্গামা' যে কী রকম ভীষণাকার ধারণ করেছিলো তা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হ্যামিলটন সাহেবের 'Description of Hnidusthan' নামক গ্রন্থের বিবরণ থেকে অতি স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন ঃ—"বৃটিশশাসনে বাংলার অন্যান্য প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হলেও বৃটিশ

রাজধানী কলকাতা থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরের প্রজারা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। ঐ স্থানের অবস্থা দেখলে মনে হোত যে, তারা যেন কোন রাজারই অধীন নয়; সে দেশে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কারও সাক্ষ্য দেবার বিন্দুমাত্র সাহস নেই; তাহলে বিদ্রোহীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে—চারিদিকেই অরাজকতার একটা ঘনঅন্ধকারছায়া সমস্ত অঞ্চলটাকেই যেন গ্রাস করেছিলো। সামান্য কোন কারণে প্রাণনাশ করতে তাদের হাত বিন্দুমাত্র কম্পিত হোত না।”

যাইহোক শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ সৈন্যদের প্রবল পরাক্রমে এই রকম একটি বিদ্রোহের স্মরণীয় প্রতিরোধ সম্পূর্ণরূপে বিধবস্ত হয়ে গিয়েছিলো।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭৩)

চুয়াড় বা নায়ক বিদ্রোহের সময়ে সন্ন্যাসী ও ফকিররা সারা বাংলা দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম সংঘটিত হ'য়েছিল। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মেদিনীপুরে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার না করলেও এই জেলার মধ্যেও যে তাদের সাড়া পড়েছিল তা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী ৭ হাজার পদাতিক ও ৫ শত অশ্বারোহী সন্ন্যাসী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই নামক স্থানে প্রবেশ করেছিল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল—সরকারী বিবরণ থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ ঘটনায় মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট সৈন্য পাঠিয়ে তাদের অনেককে হত, আহত ও কিছু বন্দী করে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের ছত্রভঙ্গ করেন।

ঐ বছর মার্চ মাসে আরও একদল বিদ্রোহী সন্ন্যাসী, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার সীমান্তে রায়পুরে প্রবেশ করেছিল। কাপ্তেন ফরবেন-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য যুদ্ধ যাত্রা করে। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে ফুলকুসমা

থেকে জঙ্গল মহলে প্রবেশ করে এবং আলমপুর ও গোপীবল্লভপুরের মধ্যে দিয়ে মারহাট্টা অধিকৃত স্থানে চলে যায়।

পরবর্তী জুন মাসে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন এডওয়ার্ডের যুদ্ধ বাধে। সৈন্যাধ্যক্ষ পরাভূত হয়ে ফিরে আসেন।

অক্টোবর মাসে আবার একদল সন্ন্যাসী বালেশ্বর জেলাতে প্রবেশ করে। মেদিনীপুরে সন্ন্যাসীরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য কাপ্তেন হর্মের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়।

নভেম্বর মাসে পুনবায় বিদ্রোহী সন্ন্যাসীগণ ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত হলে কাপ্তেন টমাসের অধীনে আবার সৈন্য প্রেরিত হয়—যাতে তারা মেদিনীপুরে প্রবেশ করতে না পারে।

এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। ১৮৮২ খ্রীঃ এ এই উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং এই উপন্যাসের মধ্যেই বিখ্যাত "বন্দেমাতরম্" সংগীতটি সংযোজিত হয়েছিল, যা সংগ্রাম ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর কাছে মহামন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য এই "বন্দেমাতরম্" সংগীতটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সংযোজিত হলেও এটি পৃথকভাবে লিখিত হয়েছিল এই উপন্যাস প্রকাশের ৭।৮ বৎসর আগেই।

মলঙ্গী বিদ্রোহ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলী প্রদেশের লবণ ব্যবসায় এক সময়ে প্রভূত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এই প্রদেশের যে সকল জমি জোয়ারের সময় লবণ জলে প্লাবিত হয়ে যেত সেই মাটি থেকে পরিস্রবণ করে কাঠের আগুনে ফুটালে তার জলীয় ভাগ বাষ্প হয়ে যেত এবং পাত্রে লবণ জমে যেত। এই পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুতকারীরা 'মলঙ্গী' নামে পরিচিত ছিল। এরা জীবিকার জন্য প্রধানতঃ লবণের উপরই নির্ভরশীল থাকত। বর্ষাকালে এই পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুতের অসুবিধা ঘটলে এদের মধ্যে যাদের অল্পস্বল্প জমি ছিল তারা চাষ আবাদের কাজ করত কিন্তু সাধারণতঃ এরা

দরিদ্র শ্রমজীবী। জমিদারদের সঙ্গে এদের যে চুক্তি হত সেই অনুসারে বর্ষার সময়ে এরা জ্বালানী কাঠের জন্য কিছু জমি পেতে পারত।

লবণাক্ত মাটি ও জলের মধ্যে বহু সময়ব্যাপী কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ছিল কিন্তু এদের মজুরী ছিল অত্যন্ত কম। কাজ ত্যাগ করে পলায়ন করাও এদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কোথাও পলায়ন করলে ইজারাদার বিভিন্ন পরগণার ফৌজদার ও পুলিশের সাহায্যে এদেরকে খুঁজে বের করত অথবা নূতন মলঙ্গী নিযুক্ত করে কাজে লাগাত। মধ্যে মধ্যে মলঙ্গীরা দলবদ্ধ হয়ে ধর্মঘটের আকারে স্বল্প মজুরী ও অন্যান্য উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত।

১৭৯৩ সালের মার্চ্চ এপ্রিল মাসে বিভিন্ন পরগণার বহু সংখ্যক মলঙ্গী দলবদ্ধভাবে কর্মত্যাগ করে ২৪ পরগণার মুড়াগাছা অঞ্চলে পলায়ন করে। কোন প্রকার প্রতিকার লাভে অসমর্থ হয়ে এদের বিক্ষোভ ক্রমে একটি আন্দোলনের আকার ধারণ করে। এঁরা একটি 'সঙ্কট' কমিটি গঠন করেন। রামু দীণ্ডা, ভগবান মাইতি, হারু মণ্ডল, হারু পাত্র, জয়দেব সাহু, বৈষ্ণব ভূঞ্যা, ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল কাঁথি মহকুমার বীরকুল এলাকার ও মীরগোদা অঞ্চলের সমস্ত মলঙ্গী একত্র সমবেত হয়ে শোভাযাত্রা ক'রে কাঁথিতে পৌঁছে। বীরকুলের মলঙ্গীদের নেতা বলাই কুণ্ড এদের পক্ষে একখানি আবেদন পত্র কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। মলঙ্গীদের লবণের মূল্য উপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি, বেগার ও ভেট্ প্রথা রহিত প্রভৃতি দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু এইসব উপদ্রবের কোন প্রতিকার হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চলতে থাকে কিন্তু কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সমানভাবে শোষণ ও শাসন চালিয়ে যেতে থাকে।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরমানন্দ সরকার নামক এক ব্যক্তি মলঙ্গীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নূতন উদ্যমে মলঙ্গীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধানে অগ্রসর হন। ব্যাপক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। মলঙ্গী-গণ দলবদ্ধভাবে কাঁথির ইংরেজ লবণ এজেন্টের কাছারী ঘেরাও

করে। এজেন্ট সাহেবের পাইক, বরকন্দাজগণ নায়ক পরমানন্দ সরকারকে গ্রেপ্তার করে এবং চারিদিকে গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এজেন্ট সাহেব মলঙ্গীদের দাবীগুলি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই বিদ্রোহ শান্ত করেন।

তখনকার দিনে দরিদ্র মলঙ্গীগণের কয়েক বৎসর ব্যাপী এই আন্দোলনে এবং কোম্পানীপক্ষের বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার সত্ত্বেও সঙ্ঘবদ্ধতা ও সাহসিকতা উপেক্ষণীয় ছিল না।

শোভা সিংহের বিদ্রোহ

শোভা সিংহ ছিলেন বরদা—চিতুয়া পরগণার (ঘাটাল মহকুমা) একজন ভূম্যাধিকারী। তাঁর জমিদারী বিশাল ছিল না কিন্তু তিনি ছিলেন সাহস, শৌর্য্য ও দক্ষতায় অগ্রগণ্য। সেই সময় দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন কুটনীতিক বাদশা ঔরঙ্গজেব এবং বাংলার নবাব ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। কতকগুলি অন্যায় করের বোঝা বহন করতে হতো জমিদার ও প্রজা উভয়কেই। তখন কর আদায়ের ভার ছিল বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের উপর। শোভাসিংহ কর দিতে অস্বীকার ক'রে কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৬৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। শোভা সিংহের আহ্বানে উড়িষ্যার আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁ এবং বিষ্ণুপুরে, জমিদার গোলাপ সিংহ ও চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুসিংহ শোভাসিংহের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

শোভাসিংহ ও রহিমখাঁর বিদ্রোহী সৈন্য বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হলে কৃষ্ণরাম রায় তার যা কিছু সৈন্য ছিল তাদের নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হতে পশ্চাৎপদ হলেন না। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে প্রাণ হারালেন। বিদ্রোহীরা তাঁর রাজপ্রাসাদ অধিকার ক'রে নিল এবং রাজপরিবারবর্গকে কারারুদ্ধ করল। কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগতরাম পলায়ন করতে সক্ষম হয়ে নবাবের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকায় উপস্থিত হলেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ যুদ্ধ-কুশলী ব্যক্তি না হয়েও এ অবস্থায় একেবারে নীরব থাকতে পারলেন না।

তিনি মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হিজলী, হুগলী ও যশোহরের তদানীন্তন যুক্ত ফৌজদার নূরউল্লাখাঁকে বিদ্রোহ দমনের জন্য আদেশ দিলেন। নূরউল্লা খাঁ যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ ক'রে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলেন বটে কিন্তু হুগলীর দুর্গে আশ্রয় নিয়ে চুঁচড়া নিবাসী ওলন্দাজ ধনিকদের সাহায্য গ্রহণই শ্রেয়ঃ মনে করলেন কিন্তু তিনি এত ভীত হয়ে পড়লেন যে, একদিন কৌপীনধারী হয়ে ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে পলায়ন করলেন। বিদ্রোহীরা হুগলী দখল করে ফেললেন।

এই সংবাদ পেয়ে নবাব ইব্রাহিম খাঁ ওলন্দাজদের সাহায্যে পুনবায় হুগলী অধিকাব করেন।

বিদ্রোহীবা তখন খণ্ড গ্রামেব দিকে অগ্রসর হল। শোভাসিংহ ইব্রাহিম খাঁকে বিভিন্ন অঞ্চল অধিকারের জন্য সৈন্যসহ পাঠিয়ে নিজে বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হলেন। দিল্লীর বাদশাহের আদেশে চুঁচুড়া চন্দননগর ও সুতানুটি সহরের ইউরোপীয়গণ শোভাসিংহের বিদ্রো ২ দমনের চেষ্টা করে ও কামানের সাহায্যে কুঠি রক্ষার ব্যবস্থা করে কিন্তু বিদ্রোহীগণ রাজমহাল ও মালদহ অধিকার ক'রে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ ক'রে অনেক সম্পত্তি হস্তগত করে। শোভা সিংহ বর্দ্ধমান পৌঁছে প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ চালিয়ে বর্দ্ধমানেব রাজপরিবারের অনেককে বন্দী করেন। শোনা যায় তাঁদের মধ্যে রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। শোভা সিংহ তাঁর উপর পাশব বল প্রয়োগ করার চেষ্টার ফলে এই বীর রমণীর ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। কন্যাও আত্মগ্লানিতে মর্মাহত হয়ে ছুরিকাঘাতে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হেমৎসিংহ বিদ্রোহীদের পরিচালনা করেন। হেমৎসিংহ অত্যাচারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিবায়নের কবি রামেশ্বরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। হেমৎ সিংহের দৌহিত্র কীর্ত্তিচাঁদের সঙ্গে বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সন্ধি হয়েছিল।

জমিদারদের ধর্মঘট

১৮৩৭ সালে মেদিনীপুর জেলার জমিদারদের ধর্মঘট হয়। নাড়াজোলের জমিদাররা এই ধর্মঘটে বিশেষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। কোথাও কোথাও ছিল রাজসরকারের প্রতি বহুকাল পোষিত বিতৃষ্ণা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তদানীন্তন কালেক্টার রবার্ট হোউষ্টনের অত্যাচারীসুলভ ব্যবহার। এই দুর্দ্ধর্ষ জেলা কালেক্টরটি তাঁর স্বভাবের জন্য জমিদারবর্গের নিকট একান্ত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে জমিদারগণকে একই দিনে একই স্থানে সমবেত হয়ে তাঁদের উপর ধার্য্য রাজস্ব আদায় দিতে হবে। জমিদাররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁরা এক পয়সাও সরকারী রাজস্ব দিবেন না—এবং এজন্য সম্পত্তি নীলামে উঠলে কেউই তা ক্রয় করবেন না। এই ধর্মঘটের ফলে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। গভর্ণমেণ্ট জমিদারী সম্পত্তি নীলামের ব্যবস্থা করলেন। সরকারী ডাক এক টাকায় আরম্ভ করা হয় কিন্তু একটি লোকও নীলাম ডাকেনি। মূল্যবান সম্পত্তি একরূপ বিনামূল্যে পাবার সুযোগ গ্রহণের জন্য একটি ব্যক্তিও অগ্রসর হননি। নাড়াজোলের সেই সময়কার জমিদার অযোধ্যা রাম খাঁনের বহুমূল্যের জমিদারী ১ টাকা মূল্যে সরকার ক্রয় করলেন।

এ সম্বন্ধে কালেক্টার হোউষ্টন লিখেছেন—

"Owing to the non-payment of revenue due to Government the bidding commenced with company's One Rupee which was repeated for half-an-hour in expectation that the purchasers in attendence would bid for it, but none of the persons present at the meeting of the sale did bid for any sum higher than that bid for on the part of the Government."

কয়েকজন জমিদারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এই ধর্মঘট শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। একটি আপোষ মীমাংসাতে এর অবসান হয়েছিল।

নীল বিদ্রোহ

'নীল বিদ্রোহ' একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। নীলগাছ থেকে প্রস্তুত নীল রঙ্গে রঞ্জিত বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র দেশ বিদেশের বাজারে সরবরাহ করা এদেশের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক নীল প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা অঞ্চলে সর্ব্বজন পরিচিত একটি 'টুসু' গানের প্রচার ছিল—

"নদীর ধারে নীল বুনিলাম
নীলে গুটি ধরে না,
ঘরে আছে কেলতা জামাই
নীল ধুতি বই পরে না।
কাপড় কাপড় করিস টুসু
কি কাপড়ে স্বাদ আছে,
ভাবে আঁচলা বিচ্ছেদের পাড়
কুসুম ফুলে ছাপ আছে"॥

যাহোক এই প্রচুর লাভজনক ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত ইংরেজ বণিক কোম্পানী দাদন প্রথা প্রচলিত ক'রে বঙ্গের অনেকগুলি জেলাতে ব্যাপক নীল চাষ প্রবর্তনের ফলে প্রভূত ধন সঞ্চয় করত; খাদ্য শস্যের পরিবর্তে নীলের চাষ প্রচলনের জন্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে চাষীদের বাধ্য করার ব্যাপারে নানা উপায় গ্রহণ করত। গ্রামে গ্রামে কোম্পানীর পেয়াদাগণ ঘুরে বেড়াত এবং গ্রামের চাষীরা যাতে নিজ নিজ জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য হয় তার ব্যবস্থা করত। প্রহার, জবরদস্তি ধরে নিয়ে গিয়ে নীল কুঠিতে আটক রাখা, নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন ক'রে নীল চাষের উদ্দেশ্যে দশ বৎসর চুক্তিতে বদ্ধ হওয়ার জন্য বাধ্য করায় গ্রাম অঞ্চলে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি হতো। যদিও নদীয়া, যশোহর, পাবনা প্রভৃতি জেলাতে নীল চাষ বহু ব্যাপক ছিল তথাপি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে এখনো নীল কুঠির প্রচুর ধ্বংসাবশেষ এ জেলাতেও যথেষ্ট নীল চাষের সাক্ষ্য দেয়। স্বনামখ্যাত

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ শ্যামকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় তাঁর চন্দ্রকোণার অন্তর্গত নূতনহাট গ্রামের বাসস্থান ত্যাগ ক'রে বীরভূম জেলার অন্তর্গত পুরুল গ্রামে বাস করার পর চন্দ্রকোণা থেকে বহু সংখ্যক তন্তুবায়কে সেখানে নিয়ে পুনর্বসতি করান এবং তাঁদের তৈরী 'গড়া' নামীয় থানগুলি নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়ে তৎকালীন নীলকুঠির ম্যানেজার জনচীপ সাহেবের নির্দ্দেশানুসারে বিলাতে নৌ সৈনিকদের ইউনিফর্ম তৈয়ারীর জন্যে প্রেরণ করতেন। তিনি এজন্য প্রতিদিন ১০০১ টাকা কমিশন স্বরূপ উপার্জন করতেন। এই ব্যবসায় ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে তন্তুবায়দের অঙ্গুলি কর্ত্তন ইত্যাদি নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী জড়িত।

১৮৫৯ সালে অত্যাচার নিপীড়িত প্রায় পঞ্চাশলক্ষ দরিদ্র নীলচাষী এক ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। বারাসত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাস্‌লিইডেনেব (পরে বঙ্গের ছোটলাট) একটি রায়ের ফলে প্রজারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই প্রকার প্রতিবাদের পথ অবলম্বন করতে উৎসাহিত হয়েছিল! ঐ রায়ে বলা হয়েছিল নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন। বারাসতেব (২৪ পরগণা) নিকটবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলাব অত্যাচারিত কৃষকেরা এই ধর্মঘটে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা জানা যায়নি কিন্তু তারা এইরূপ ঘটনার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকাতে, যশস্বী সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, খ্যাতনামা সাংবাদিক শিশির কুমার ঘোষ তাঁর অমৃতবাজার পত্রিকাতে, নীলচাষী কৃষকদের দুঃখদুর্দশারও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন তা অত্যন্ত সুবিদিত। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং উহার ইংরাজী অনুবাদক অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও উহার প্রকাশক রেভারেণ্ড জেম্‌স লং প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্থায়ী কীর্ত্তির অধিকারী হয়েছেন। যশোহরের নীলচাষীদের নেতা বিষ্ণু চরণ বিশ্বাস ও

দিগম্বর বিশ্বাসের নামও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। নিম্নলিখিত কবিতাটি বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল।

"নীলবানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'লো লং এর হোল কারাগার।"

মেদিনীপুর জেলার নীলকর সাহেব কোম্পানী যাঁরা 'মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী' নামে পরিচিত ছিলেন নীলচাষ ব্যাপদেশে কৃষকদের অনেক জমিতে গোচারণ অধিকার লোপ করার বিরুদ্ধে গড়বেতা থানার কয়েকজন রায়ৎ দীর্ঘকাল যে মোকদ্দমা চালিয়েছিলেন এবং অবশেষে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে জয়লাভ করেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা অবশ্যই স্মরণীয়। 'ইণ্ডিয়ান ল' রিপোর্টে মোকদ্দমাটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ—

Re : INDIGO CULTIVATION
INDIAN HIGH COURT REPORTS

(Cases of the Privy Council on appeals from India and of all the High Courts from the year 1901)
Calcutta Vol. II. (1903—1904) I.L.R. XXX and XXXI
CALCUTTA

R. CAMBRAY & CO.
9. Hastings Street,
CALCUTTA. (1923).

31C. 503—(31IA. 75 = 14 M.L.J. 152 = 8C, W.N. 425 = 8 Sar. 611)

(503) PRIVY COUNCIL.

Bhola Nath Nundi vs. Midnapur Zemindary Co.
(13th November, 1903 and 26th February, 1904)
APPEAL CONSOLIDATED

(On appeal from High Court at Fort William in Bengal)

Pasturage—Cultivators—Indigo Concern—Zeminders.

Waste lands—Decree, from of :

The plaintiffs, resident cultivators of villages belonging to the defendants, the propritors of an indigo concern claimed a right of free pasturage over the waste lands of the villages and the Sub-ordinate Judge made a decree in accordance with the finding of the two lower courts that the plaintiff had enjoyed the right without interruption from time immemorial.

The High Court in second appeal differing as to the nature of the right and the character in which it was claimed, set aside the decree and made an order of remand for the case to be decided in accordance with their remarks.

On appeal the Judicial Committee discharged the order of remand as un-necessary and restored the decree of the subordinate Judge with the addition of a clause that the decree should not present the defendants or their successary in title from cultivating or executing improvements upon their waste lands, so long as sufficient pasturage was left for the plaintiffs.

(Ref: 6 C.L.J. 218 ; 18C.W.N. 735=19 I.C. 890 ; 39 I.C. 868=2 Pal L.J. 323 ; 53I.C. 213—87 M.L.J. 284 -26 M.L.T. 223—1919 M.W.N. 610 ; 20 I.C. 467 ; Rel, on 2 Lal. L.J. 44)

CONSOLIDATED APPEALS FROM SEVEN DECREES (22ND MARCH 1898) of the High Court at Calcutta, which set aside seven decrees (12th November 1895) of the Munsiff at Garbetta in seven suits were affirmed with slight modifications.

The plaintiffs appealed to his Majesty in Council.

The suits were brought on 14th May 1894 by seven different sets of 'plaintiffs, who were resident

cultivators of certain villages situate in turef Paschim, the whole of which was held in (504) Patni right by the respondent company. The company had been unable to induce the cultivators of the villages to grow indigo for them in consequences of which they suffered loss. They therefore resolved to limit the area over which the plaintiffs exercised the right of free pasturage and with this object applied on 30th October 1892 to the Magistrate of Midnapur to depute an officer to fix the boundaries. The Magistrate declined to give the appearance of official sanction to proceedings of the merits of which he knew nothing and the company proceeded themselves to mark out certain lands as those over which alone the plaintiffs should be entitled to graze their cattle and the Magistrate on 4th May 1893 published a list of such lands and issued a notice calling on the tenants any objections that they might have to such pasture lands. Objections were made but on 13th May 1893, rejected, and in October 1893 the servants of the company prevented the plaintiffs from grazing their cattle on lands over which they had always exercised the right of free prasturage. There upon the plaintiffs instituted the seven suits, out of which the present appeal arose. In such appeal the appeal the plaintiffs served on behalf of themselves and the other persons entitled to the right claimed, in accordance with s. 30 of the code of Civil Procedure (Act XIV of 1882) and in each case annexed to the plaint a schedule of the lands described by their boundaries over which the right was claimed. The plaints varied as to the lands, but were otherwise similar. They stated that the plaintiffs had from time immemorial

and for a period for in execess of the twenty years openly and without interruption or disturbance exercised the right of free pasturage over the lands described in the schedule attached to each plaint. They referred to the dispute of the defendant company and the order of 13th May 1893 rejecting their objections, and claimed a declaration of their right to graze their cattle on the lands mention in the schedule to each plaint, and a perpetual injunction restraining the defendant company from interfering with the exercise of their rights........

Present :— Lord Macnaghten, Lord Lineley, Sir Andrew Scoble. and Sir Authur Wilson.

নীল কমিশন বসাব পর দেশের অবস্থার পবিবর্তন ঘটে এবং এই প্রকার অত্যাচারের অবসান হয়।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহেব' প্রবল ঝঞ্ঝা বঙ্গেব একপ্রান্তে (ব্যারাকপুব) উদ্ভুত হ'য়ে সমগ্র উত্তর ভারতকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল এবং দিল্লীব শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহের সিংহাসন প্রান্তে এক নূতন বিদ্যুতের স্ফুরণ সৃষ্টি করেছিল। এই অভূত-পূর্ব্ব অভ্যুত্থানকে অনেক প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলে অভিনন্দিত করেছেন—তাঁদের মধ্যে জ্ঞান-গবিমাভূষিত কোন কোন ঐতিহাসিকের নিকট এই অভ্যুত্থান সেই সুউচ্চ স্থানের অধিকার বঞ্চিত। তথাপি ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে উত্তর-ভারতের অন্ততঃ দুটি জেলা শাহাবাদ ও অযোধ্যা বৃটিশের ক্ষমতার উর্দ্ধে স্বাধীনতার শক্তি অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। অযোধ্যা জেলাতে একটি জাতীয় বিদ্রোহের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল—তা তদানিন্তন বড়লাট লর্ড ক্যানিং তাঁর ইংলণ্ডে প্রেরিত সরকারী বার্ত্তাতে স্বীকাব করেছিলেন।

এই ঘূর্ণাবর্ত্ত যে মেদিনীপুর জেলাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেনি ইহা সত্য হলেও এইরূপ একটি ব্যাপক বিদ্রোহ মেদিনীপুরের চির-বিদ্রোহী চিত্তে কিছু রেখাপাত অবশ্যই করেছিল একথা চিন্তা করা নিশ্চয়ই কষ্টকল্পনা নয়। মেদিনীপুরের কলিজিয়েট স্কুলের সম্মুখস্থ ময়দানে বিদ্রোহী এক তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। সন্ত্রাস সৃষ্টির এই চেষ্টা কতদূর সফলতা লাভ করেছিল জানা যায়নি কিন্তু এই ঘটনা অবলম্বন করে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী দূর দূরান্তরে প্রসার লাভ করে—এবং বৃটিশবিরোধী মনোভাবকে যে নূতনভাবে স্পন্দিত করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নাই। এই সময়কার অবস্থা মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁর আত্মজীবনীতে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ—

"১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সিপাহীবিদ্রোহের ভারত-ব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাটনগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টন ছিল তাহার নাম শেকাওয়াতী ব্যাটেলিয়ান। কর্ণেল ফষ্টার এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরেজরা ফাঁসী দেন। একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদেব পর আর একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ ফিনিক্স কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের

অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবার কথা। একদিন সাহেবরা ক্যান্টনমেণ্ট গিয়া সিপাহীদের ডাকিয়া একটা থালের উপব ধান দুর্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপে শপথ করিল কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে, বৃষ্টি পড়িলে প্রবহমান হয়। সাহেবরা ও কোন কোন বাঙালী ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়াছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টর সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদার কাছারীর কোন ভৃত্য শখ করিয়া একটি বোমা ছুড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপরাশির উপর চাপবাশা পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময়ে প্যান্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যান্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির কবিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহী-দিগের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। বিধবা বিবাহের উপর তাহাদের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। পরিবাব কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতব কোন এক বন্ধুর বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময়ে লাল কোর্তাধারী সিপাহীব স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদেব এরূপ আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরী নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্বোপ-লক্ষে সিপাহীরা হাতীর পিঠে চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা

বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে শহরের দিকে আসিতেছিল। আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম, আমরা মনে করিলাম সিপাহীরা শহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। ostrich পাখী যেমন চক্ষু বুঝিলেই মনে করে সে নিরাপদ, তেমনি ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল যে বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যাণ্টালুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ম্যাজিস্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালীদের সভা ডাকিয়া বলিলেন যে-কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিবে তাকেই জেলে দিব। সাহেব ইহার অব্যবহিত পূর্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিতগণের সকলে উপস্থিত আছে কিনা জানিবার জন্য যখন সভা আহ্বানকারী পত্রের লেফাপার উপরের লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন তখন জলামুঠার বাজার অছিব রণধীর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া 'ড্যামীডর রায়' এবং স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর উমাচরণ হালদারের নাম 'ওমারচন্দ হাবিলদার' উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগিগাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্রি শহরে এইরূপে চৌকি দিতেন। সংবাদপত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে শেকাওয়াতী ব্যাটিলিয়ন মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে মেদিনীপুরে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে ঐ পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হইল না তাহার প্রধান কারণ

কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাহার কথা সিপাহীরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।”

মেদিনীপুরের যে বিদ্রোহগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল সেগুলি ছিল সাধারণতঃ অত্যাচার, অবিচার বা দুর্দ্দশামূলক শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম। ব্যক্তিগত সাহসিকতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার উদ্যম ও বিপদবরণ, প্রলোভন ভয় বা প্রতিবন্ধককে জয় করে অগ্রসর হওয়ার শক্তি প্রভৃতি বীরোচিত সংগ্রামী গুণগুলি এই সকল ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপে আবার একক সংগ্রামে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বিদ্যমান। অতীতে যে খণ্ড সংগ্রামগুলি মেদিনীপুরের সংগ্রামী চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল—তার দীপ্তি কোন সময়ে বিলীন হয়ে যায়নি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার গৌরব লাভ করার পক্ষে অতীতের এই খণ্ড সংগ্রামগুলির অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়॥

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয়তার উন্মেষ

জেলাবাসীর চির সংগ্রামী মনোভাব

মেদিনীপুর জেলার খণ্ড বিদ্রোহগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল জেলাবাসীর চিরসংগ্রামী রূপটি। বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বন ক'রে তারা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে ও যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বা সঙ্গত প্রাপ্য আদায়ের জন্য। চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), নায়ক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৮১৬), নীলকর বিদ্রোহ প্রভৃতি খণ্ড অভ্যু-

থান গুলির প্রভাব জেলার অভ্যন্তরে প্রভুত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এরপর ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহ বৃটিশ শক্তির ধ্বংস সাধন কবার জন্যে সমগ্র উত্তব ভারতে যে বিপুল ঘুর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব ছিল অমোঘ ও সুদূরপ্রসাবী। অনেক ঐতিহাসিক সিপাহীবিদ্রোহকে ভারতেব প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে সম্মানিত করেছেন। এ বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক দৃঢ়তার সঙ্গে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেব ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহের অবদান সামান্য নহে এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। উত্তর ভারতে বিদ্রোহের ঝঞ্ঝা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়েছিল কিন্তু বঙ্গেব প্রত্যন্ত জেলা মেদিনীপুরে ইহা নানা কারণে সীমিত আকার ধারণ করেছিল। সিপাহীবিদ্রোহের কিছু পরিচয় যথা স্থানে দেওয়া হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায় ও উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীগণ

ভারতে নব-যুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় তাঁর বিপুল মনীষার বলে ভারতে বৃটিশ শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি কবতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর বহু ব্যাপক অনুসন্ধিৎসাব মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অধিকারের দাবীও উত্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে, স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমান রক্ষায়, বাগ্-বিভূতির উজ্জ্বলতায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানগরিমায় মহিমান্বিত কতকগুলি শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল—যাঁরা দেশে একটি স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাষ্ট্রনীতিবিদ্ তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী থেকে আবম্ভ করে সুপণ্ডিত রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ভীক সাংবাদিক রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এবং ডিরোজিও শিষ্য বাগ্মী রাম গোপাল ঘোষ গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার, সমাজ সংস্কারক রামতনু লাহিড়ী বাংলা গদ্যের নবযুগ প্রবর্ত্তক প্যারি চাঁদ মিত্র, ধর্মসংস্কারক শিব চন্দ্র দেব সংবাদপত্র

সেবী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবর্গ নানা ক্ষেত্রে স্বাধীন মতের বীজ বপন করেছিলেন ও নানাভাবে সেগুলিকে পুষ্ট করে তুলেছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে স্বাদেশিকতার মূর্ত্তপ্রতীক রাজ নারায়ণ বসুর অবদানও সামান্য ছিল না।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন ঃ--

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহকরি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥"

ইহা দেশের জন্যে মর্য্যাদাবোধের চরম পরাকাষ্ঠা। এই সময় থেকে পরবর্ত্তী দীর্ঘকাল ধরে দেশভক্তির ভিত্তিতেই সংবাদপত্র পরিচালনা, সভা সমিতির অনুষ্ঠান, বক্তৃতাদিব ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাভাবে স্বাদেশিকতার প্রচার চলেছিল।

সেই সময়ে পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং একটি নূতন ভাবাদর্শে সমাজ গঠনেব জন্য স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ ডিরোজিও শিষ্যগণের মধ্যে প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। এরপর একটি প্রবাহ এসেছিল নব হিন্দু জাগরণের। প্রচলিত আচার-বিচারের বিবেকসম্মত গ্রহণ ও বর্জ্জনের পথে গোঁড়ামির উর্দ্ধে শাস্ত্রের উদার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী হিন্দু মতবাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছিল। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের সহায়তাপুষ্ট পাদরী সম্প্রদায় তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার কুফলগুলির প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি ও খৃষ্টধর্মের প্রতি যুব সমাজের আকর্ষণ জাগ্রত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বদেশের ধর্ম সম্পদকে যথাযথভাবে জানবার ও চিনবার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন—ব্রাহ্মসমাজ ও নবহিন্দু সমাজ।

রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা ও সতীদাহ প্রভৃতি বিলোপের জন্য আইন প্রণয়ণ প্রচেষ্টা, মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং পরমহংস রামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্মমত ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্ত্তিত আর্য্য সমাজের শিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগকে বাংলার নবজাগরণ রূপে সূচিত করেছিল।

এই সময় ভারতগগনে উদিত হয়েছিলেন মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। জড়তা কবলিত ভারতবাসীর প্রাণে চেতনা সঞ্চারের জন্য—স্বদেশকে সর্ব-দেবতার অগ্রে স্থান দিয়ে পূজা করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের কোটি কোটি দুঃখী, অবহেলিত, নির্জ্জিত মানুষের কথা; তিনি বলেছিলেন "ভুলিও না,—নীচজাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই।"

নব জাগরণ

এই সকল ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ধারাকে অবলম্বন করে যে চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে জেগে উঠেছিল দেশাত্মবোধের একটি মহনীয় অনুভূতি। বৃটিশ শাসনের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণা তারই একটি বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে নানা সমিতি ও সংঙ্ঘ স্থাপিত হতে থাকে এবং বৃটিশ রাজ দরবারে ভারতবাসীর দাবীগুলি উত্থাপিত হতে থাকে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি এই সকল দাবীর জন্য প্রভূত শক্তি যোগাতে থাকেন। শাসক সম্প্রদায় যাতে শাসনকার্য্য দেশবাসীর কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন সেজন্য আন্দোলনেরও সৃষ্টি হতে থাকে।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মিনী' উপাখ্যানে লিখেন, (১৮৫৮):

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়?

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে স্বর্গ-সুখ তায়।"

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভারত সঙ্গীত কবিতাতে উদাত্ত আহ্বান জানান (১৮৭০খৃঃ):

"বাজ রে সিঙ্গা বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

এই প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের প্রাণস্পর্শী খেদোক্তি স্মরণীয়:

"কতকাল পরে বল ভারত রে,
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে ?
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে ?
নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে ;
নিজ অন্ন পরে কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে.
তুমি অন্ধ হয়ে পর স্বর্গ সুখে
তুমি আজও দুঃখে তুমি কালও দুঃখে।
নিজ ভাল বুঝে পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন শাসন রে ;
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপ শিখা নগরে নগরে ;
তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে।

অহ, কে কহিবে সে সুদীর্ঘ কথা,
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।
বিধি বাদী হলে পরমাদ ঘটে --
পরমাদ হরে হিতবোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।
যদি কেহ দেয় স্বরগের সুখে,
তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুঃখে।
বন-বর্ব্বর ও স্ববশত্ব খুঁজে,
তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।"

দেশের যুবক ও গুণী সম্প্রদায় এই সব আবেদনের আবেগে উদ্বেলিত না হয়ে পারেননি। কবি ও লেখকের লেখনী কর্মের আহ্বানে দেশে নব জাগরণের সূত্রপাত করে। ভূম্যাধিকারী সভা (১৮৩৮) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কতকগুলি বিশেষ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে কার্য্য করলেও ঐগুলি যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের পথ দেখান তাতে সন্দেহ নাই। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদকতায় গঠিত (১৮৩৮- সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (Society for the acquisition of General Knowledge) ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিধি সম্পর্কীয় কতকগুলি সমস্যা ও আইনের প্রতি দেশবাসী ও শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি রাজনৈতিক কার্য্যের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহযোগে স্থাপিত হলেও অল্পকালের মধ্যে এর অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৮৫১ সালের শেষ ভাগে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন" স্থাপিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থরক্ষা এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ শেষ হ'লে

কোম্পানীকে নূতন সনদ দানের পূর্বে দেশশাসনের সুব্যবস্থা ও নিজেদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই সময় পার্লামেন্টের সম্মুখে দেশবাসীর মনোভাব উপস্থিত করার জন্য এই সমিতি সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে দাদাভাই নৌরজী ও নৌরজী ফুরদুনজীর চেষ্টায় বোম্বাইতে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের একটি শাখা। তখনকার ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই পার্লামেণ্টেও প্রয়োজনবোধে বড় লাটের নিকট আবেদন পত্র পেশ করা ব্যতীত দেশবাসীর চাহিদা প্রকাশের অন্য কোন উপায় ছিল না। ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ভারত সুশাসনের উপায় ব্যক্ত করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশানের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। তার রচয়িতা ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক ও নীল চাষীদের অকপট বন্ধু সুবিখ্যাত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অনেক বৎসর ধ'রে ভারতের রাষ্ট্র-বিধানের ক্ষেত্রে ভারতের মুখপাত্র স্বরূপ কার্য্য করেন। এই সময়ে অশেষ প্রতিভাধর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেকটররূপে কাজ করার সুযোগ পেয়ে শিক্ষা পদ্ধতিকে নূতন করে গঠন করার চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গভাষার অন্যতম যুগ-প্রবর্তক, তাঁর প্রবর্তিত 'বিধবা-বিবাহ' প্রবর্তন আন্দোলনও ছিল যুগান্তকারী। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হওয়ায় বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কয়েকটি প্রচেষ্টা ফলবতী হতে পারেনি—কিন্তু ১৮৬১ সালে ইউরোপীয়দের বিচার সংক্রান্ত বিশেষ অধিকারগুলি লোপ পায়।

নীল চাষীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হত নাট্যকার কবি দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ তার একটি সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এই সময়ের অবস্থা নিম্নলিখিত কবিতাটির দুই ছত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে ঃ—

"নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার।"

সিপাহী বিদ্রোহ সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় ঘটনা—যার ফল হয়েছিল অতি সুদূরপ্রসারী। ভারতেব শাসনযন্ত্র ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল—সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত থেকে নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন—তাতে সমগ্র বৃটিশ জাতিই ভারতের শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব স্বীকার করলেন।

রাজনৈতিক চেতনা

দেশের রাজনীতিকে এক নূতন পন্থায় চালাবার চেষ্টা হতে লাগল। মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের নেতাগণ সর্বভাবতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও সুপবিচালনার চেষ্টা করতে লাগল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতবম্" মন্ত্র, "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বর্ণিত সর্বত্যাগী "সন্তান" দলের আদর্শ—"কমলাকান্তে"র মাতৃমূর্তি দর্শন ও দেশমাতার চরণে সর্বস্ব অর্পণ করে তাঁর সর্বহারা নগ্ন মূর্তি দূব করে জাতিব হৃদয়ে এক ঐশ্বর্যময়ী শক্তিময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প দেশে এক ভাবের জোয়ার এনে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোব ধর্ম্ম মহাসভায় (১৮৯৩) ভারতের জয়পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। তিনি ভারতীয় যুবকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন—একমাত্র দেশমাতাকেই দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং দেশের নিম্নতম সম্প্রদায়কে পর্য্যন্ত 'নিজের রক্ত নিজেব ভাই' বলে জ্ঞান করে তাদের দুঃখমোচনের কাজে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার জন্য। এক ভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হতে থাকল ঃ দেশের কর্মী পুরুষরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশকে মহিমান্বিত করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সদলবলে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত এবং বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ ও বক্তৃতা, প্যারীচরণ সরকারের সুরাপান বিরোধী আন্দোলন (১৮৬৩ খ্রীঃ অঃ) মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজ-

নারায়ণ বসুর সর্বপ্রথম 'সুরাপান নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠা (১৮৬১ খ্রীঃ অঃ) এবং টেম্পারেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৬৩ খ্রীঃ অ:) কার্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড সি, এইচ ডল, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রভুত সহায়তা এক নূতন বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এই সকল কার্য সমাজে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন ক'রে মহৎ উপকার সাধন করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সব কার্যের ফল সামান্য ছিল না।

কলিকাতার ঠাকুর বাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত ও পরিপুষ্ট হতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকুল্যে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় নবগোপাল মিত্র মহাশয় (১৮৬৭ খৃঃ অঃ) ভারতীয়দের মিলন ক্ষেত্রস্বরূপ 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বন্ধু ও গুরু ঋষি রাজনায়ণ বসু হোলেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ সভার 'অনুষ্ঠান পত্র' অবলম্বনে হিন্দু মেলার 'অনুষ্ঠানপত্র' (Prospectus) রচিত হয়েছিল। দেশভক্ত নবগোপালের এই কার্য হিন্দু জাতির বিভিন্ন সমাজ ও শ্রেণীকে এক নব জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করার কার্যে প্রভূত সাহায্য কবেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবকারী চাকরীচ্যুত, আই, সি, এস থেকে বিতাড়িত এমন কি ব্যারিষ্টারী সনন্দ হতে বঞ্চিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ ঘটেছিল এক অতি শুভক্ষণে। তাঁর বাগ্মীতা ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান তাঁকে অচিরে অন্যতম সর্বভারতীয় নেতৃপদে অভিষিক্ত হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন (পৃঃ ২৬৭) "সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে 'পেট্রিয়টিজমে' অথবা স্বদেশভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনালিজম্' বা 'স্বাজাত্যাভিমানে' দীক্ষা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সাধারণভাবে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র আমাদিগকে নিজেদের সভ্যতা এবং সাধনার গৌরবে গরীয়ান করিয়া সত্য স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণা দিয়াছিলেন।

* * * *

নবগোপাল মিত্র এবং তাঁহার বন্ধু ও গুরুস্থানীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইঁহারাই বাংলায় স্বদেশীর প্রথম পুরোহিত।"

সুরেন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রগুরু (Father of Indian Nationalism) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজীর ভাষায় এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ থাকতো (The whole of India hung on his lips)। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর শেষ জীবনে তাঁর পূর্ব প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছিল বটে কিন্তু ভারতীয় জাতিকে চিরদিন তাঁর অবদান অবশ্যই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবনারম্ভের সময়ে কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেশে ছিল না—যাতে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে দেশের সমস্যাগুলির আলোচনা করতে পারেন, ঐগুলি প্রতিকারের চেষ্টা করতে পাবেন এবং রাজদরবারে সম্মিলিত দাবীগুলি গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত কবতে পারেন। 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলনের সময় এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

ভারতসভা

প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনীষী আনন্দমোহন বসুর প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালে কলিকাতাতে ভারত-সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন আনন্দমোহন বসু এবং প্রধান পরিচালক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী,

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি ব্যক্তি ছিলেন বিশিষ্ট সদস্য। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বহুদিন ভারত সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম বৎসরেই কাঁথিতে এর একটি শাখা স্থাপিত হয়—ভারতসভার মেদিনীপুর শাখা। ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সভা গঠনে প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। মেদিনীপুরেব সবকারী উকিল বিপিনবিহারী দত্ত অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি কার্যে নগেন্দ্রনাথকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ক্রমে মেদিনীপুব জেলাতে ২৯টি শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল:—মেদিনীপুব, ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি, চন্দ্রকোণা, মহিষাদল, দোরো, কৃষ্ণনগর, রামজীবনপুর, মুকবেড়িয়া, গেঁয়োখালি, নাটশাল, বেতকুণ্ড, মধ্য হিংলী, লক্ষ্যা, কুমোরআড়া, গারিশদা, কানাইদীঘি, পাঁচগাছিয়া, পুকলিয়া, সারদা, নিজমাজনা, ডাউকী, বনমালীচাট্টা, নন্দপুর, চণ্ডিভেটী, আগরাই, বেতা, গড়বাসুদেবপুর, সুজামুঠা—এই নামগুলি ভারতসভার ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলার মহকুমাগুলিতে এবং গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে এইভাবে রাজনৈতিক কাজের সূচনা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। ভারত সভার পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ ঘোষ ও ভগবানচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়গণ মেদিনীপুর জেলাতে কাজ করতে থাকেন। গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা প্রচাবের উদ্দেশ্যে (নৈশ বিদ্যালয় প্রচেষ্টার সময়) গড়-বেতাতে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতসভার উদ্যোগে ১৮৮৩ সালে ডিসেম্বর মাসে একটি ন্যাশ-নাল কন্‌ফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়। এর পব বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ এবং আজমীরেও এইরূপ সম্মেলন বসেছিল। ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয় কলিকাতাতে। এই সম্মেলনে মেদিনীপুর সদর, রামজীবনপুর ঘাটাল, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের জনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি গণ যোগ দিয়েছিলেন। অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান ভারত বন্ধু হিউমও একটি সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ উদ্যোগী

হয়েছিলেন। তিনি তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের আনুকুল্যে এই কার্যে অধিকতর উৎসাহী হয়েছিলেন। এই সব প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ব্যাবিষ্টার ও রাজনিতিজ্ঞ উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (W. C. Bonerjee) সভাপতিত্বে বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজে মহাজন সভা, পুনার সর্বজনিক সভা, বোম্বাই এসোশিয়েশন, সুরাটের প্রজাহিতবর্ধন সভার কর্তৃপক্ষ এতে যোগ দেন এবং ভারতের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। এখন থেকে প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন না কোন বিশিষ্ট স্থানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ সমবেত হয়ে একটি জাতীয়তা বোধের পরিবেশের মধ্যে মিলনের শক্তি অনুভব করতেন। এইভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়গণের প্রাণে জাতীয়তার একটি সুদৃঢ় বুনিয়াদ গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধিগণও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতেন। মেদিনীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল জাড়ার যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যান্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ইনি ব্যতীত মেদিনীপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল কাত্তিক চন্দ্র মিত্র (M. A B. L., P. R. S.) ও বিপিন বিহারী দত্ত (B. L.) জেলার কংগ্রেস নেতা রূপে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে যোগ দিতেন।

দেশে একটি শক্তিশালী জনমতের সর্বজনীন রাজনীতির স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মিলন, হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সখ্যতার ভাববৃদ্ধি এবং জন সাধারণকে সঠিক আন্দোলনগুলির অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতসভা গঠিত হয়েছিল। (A Nation in Making সুরেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ৪২)

ভারতীয় জাতীয় সঙ্ঘ

ভারত সভা সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধনের লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষেত্র সমাজের মধ্যবিত্ত (Middle class) ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সর্ব-শ্রেণীর জনসাধারণ যাতে মিলিতভাবে সরকারের কাছে ভারতীয়গণের অভাব অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি উপস্থিত করতে পারেন এবং সুগঠিত জনমতের ভিত্তিতে ঐগুলি পূরণের জন্য আন্দোলন চালাতে পারেন সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কংগ্রেস একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হয়। সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের সমতুল্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। সমগ্র দেশের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হত। নেতৃবৃন্দের পরিশ্রম ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না কিন্তু বৎসরের পর বৎসর কংগ্রেস হয়ে উঠল প্রায় একটি অত্যুজ্জ্বল সমাবেশ মাত্র। বাগ্মীতার ছটায় উদ্দীপ্ত বক্তৃতাবলী, অধিকার দাবী ইত্যাদি ভারতের ও ইংলণ্ডের শাসন কর্তৃপক্ষের সমীপে পেশ, কখনও বা সরকারী কার্য্যের তীব্র সমালোচনা চলতে লাগল—কিন্তু এ সবের ফল অধিক দূর অগ্রসর হল না। কাজেই আবেদন-নিবেদনের কংগ্রেস নিষ্ফল, এই চিন্তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্রীঅরবিন্দের সমালোচনা

দেশের সমস্যাবলী বর্দ্ধিত হতে থাকায় বিশেষতঃ বিদেশী শাসক ও বণিক সম্প্রদায়ের শোষণের পথ রুদ্ধ না হওয়ায় কংগ্রেসের কার্যের প্রতি একদল চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকের বিতৃষ্ণা জন্মিতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরদার মহারাজার চাকুরী নিয়ে ভারতে এসে দেশের এবং দেশের মুখপাত্র স্বরূপ কংগ্রেসের কার্য পদ্ধতিতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে ১৮৯৩-৯৪ সালে এগারোটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধগুলির নাম ছিল "New lamps for old" তিনি লিখেছিলেন "কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য

ভ্রান্তধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার কার্যাবলী ভ্রমাত্মক, ইহার নেতৃবৃন্দের কর্মে ও আচরণে আন্তরিকতা, একতা ও অকপটতা নাই— সুতরাং তাঁহারা নেতা হইবার অযোগ্য, এক কথায় বলিতে গেলে লোকেরাও যেমন অন্ধ নেতারাও তেমনি অন্ধ, অন্ততঃ...........আমরা কথায় কথায় গণতন্ত্রের দোহাই দেই বটে কিন্তু যে কংগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যাহা কেবলমাত্র অতি অল্প সংখ্যক এক শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি, তাহাকে কোন মতেই 'জাতীয়তা' এই আখ্যা দেওয়া যায় না।"

অন্যত্র শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "ক্ষয়রোগে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় বাংলাদেশে কংগ্রেস দিন দিন মৃত্যুপথে চলিতেছে। ডব্লিউ সি বোনার্জী, লালমোহন ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এখন আইন সভার (Legislative Council) উর্দ্ধ আবহাওয়ায় বিচরণ করেন এবং যুব-সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই কিন্তু দেশে প্রকৃত দেশপ্রেমের উদ্দীপনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।"

কংগ্রেসের সমালোচকরা বলতেন "কংগ্রেসের প্রাচীন উদ্যোক্তা হিউম সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে যে (manifesto) প্রচার করিয়াছিলেন (মার্চ, ১৮৮৩) এবং প্রধানতঃ যাহা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছিলেন :

"১) ব্যক্তির ন্যায় জাতির উন্নতি ও প্রধান উৎস অন্তরের প্রেরণা।

২) যাহারা স্বাধীনতা চায় তাহারা নিজেরাই ইহার জন্য সংগ্রামে প্রথম অবতীর্ণ হইবে।

(৩) আত্মোৎসর্গ ও নিঃস্বার্থপরতা ভিন্ন ব্যক্তি বা জাতির সুখ ও স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে।

কিন্তু বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস এই মহৎ আদর্শের অনুযায়ী কোন কাজই করে নাই, ব্রিটিশ সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে।*"

---

* বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃঃ ১—২।

মেদিনীপুরবাসীর চক্ষে কংগ্রেস

কালক্রমে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) একটী সর্বভারতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হ'য়ে উঠেছিল। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৬২ বৎসর কংগ্রেসের জীবন নানা বিচিত্র পথে পরিচালিত হয়েছিল এবং তার শক্তি সংগ্রহের গতি কখনও রুদ্ধ হয়নি।

এই পথ-পরিক্রমাতে কংগ্রেসের সঙ্গে মেদিনীপুরের সংযোগ সাধিত হয়েছিল প্রথমের দিকেই। ১৯০১ সালে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের একটী অধিবেশন হয়েছিল মেদিনীপুর সহরে পোড়া বাংলার ময়দানে (অধুনা বার্জ্জ টাউন)। খ্যাতনামা মনস্বী নরেন্দ্রনাথ সেন (সাংবাদিক), এই সম্মেলনের সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন কার্ত্তিক চন্দ্র মিত্র এম. এ, বি, এল, পি, আর, এস্ এবং সম্পাদক ছিলেন নবীন ব্যারিষ্টার ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত। এঁরা ছিলেন মেদিনীপুরের সুপরিচিত কংগ্রেস সেবী। ১৯১৯ সালে মেদিনীপুরের কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তিনিই অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী নেতা খ্যাতনামা এড্ভোকেট্ এ. কে. ফজ্লুল হক্ এবং অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতি ছিলেন ১৯০৮ সালের মেদিনীপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী মেদিনীপুরের নেতৃস্থানীয় আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয়।

মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ১৯০৭ সালের রাজনৈতিক সম্মেলনেব ঘটনাবলী অনুসরণ করলে দেখা যায়—মেদিনীপুরের কর্মীগণের চেষ্টায় ও শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ স্বাধীনতাপন্থী নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় এই সম্মেলনে যে চরমপন্থীদলেব সৃষ্টি হয়েছিল তার ফল হয়েছিল অতীব সুদূরপ্রসারী সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক অভ্যুদয়ের সূচক।

মহাত্মাগান্ধী দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমরূপে পরিণত করেছিলেন। তিনি ভারতের কোটী কোটী নরনারীকে কংগ্রেসের পতাকাতলে মিলিত ক'রে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। কংগ্রেস হয়ে উঠেছিল জাতির আশা-আকাঙ্খার, আবেগ-উদ্দীপনার এবং গঠন ও ভাঙ্গনের কর্ম প্রবাহের প্রতীক।

মূলতঃ কংগ্রেসের পতাকাতলেই পঁচিশ বৎসরের অধিককাল মেদিনীপুরের স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিলো। এই কালের মধ্যে দেশ ও বিদেশের নানা চিন্তা ও কর্মের সংঘাত মেদিনীপুরের সংগ্রামী মনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-আন্দোলন

বঙ্গবিভাগ আইনের প্রবর্তন

১৯০৫ খৃঃ অঃ ১৬ অক্টোবর—বাং ১৩১২ সন, ৩০ শে আশ্বিন বঙ্গ বিভাগ আইনটি কার্য্যে পরিণত হয়। ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও দার্জিলিং ও মালদহ জেলা বাদে রাজসাহী বিভাগকে আসামের সহিত যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়।

কোন পরাধীন দেশের কোন অংশে বা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হচ্ছে দেখলে রাজশক্তি তা সহ্য করতে পারে না। ইংরেজের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ায় বৃটিশ শাসকগণ অধিকতর সজাগ হয়েছিলেন—যেন তাদের কুটচক্রে ও কষ্টার্জিত রাজ্যপাটে কোথাও বিরোধী শক্তি প্রবল না হয়ে ওঠে।

বঙ্গদেশেই স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়েছিল। বাঙালী সে কথা ভোলেনি। তাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হয়েছিল—যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে। এই সময় থেকে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীন চিন্তা বাঙালীর প্রাণে-মনে এক নব জাগরণের সূত্রপাত করেছিল। তৎপরে কয়েকজন প্রজ্ঞাবান ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ঐ সব চিন্তা ও ভাবকে রূপ দিবার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। নানা বিরোধী শক্তির সঙ্গে তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়, মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এঁরা নানা সংঘাতের মধ্যে নিজ নিজ চিন্তা ও কর্মের অনন্য সাধারণ গতিবেগ সৃষ্টি করেছিলেন।

বাঙ্গালী সমাজ-নেতাগণ সর্বদা রাজপুরুষগণের অনুগ্রহ ভাজন থাকার মানসিকতা বর্জনে যত্নবান ছিলেন ; এবং সঙ্ঘ গঠন, সংবাদ-পত্র পরিচালন, লোক মত সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে শাসক গোষ্ঠির নিকট বশম্বদ না থেকে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা ও মনোবল প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন।

লর্ড কার্জন বড়লাট পদে অভিষিক্ত হয়ে এদেশে এলে সমস্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের যে পরিচয় লাভ করেন তাতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে বাঙালী যদি সংঘবদ্ধ হয় তাহলে তদের প্রতিভা ও মনীষা ক্রমেই বৃটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। কাজেই যত সত্বর সম্ভব তাদের রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট করা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার পথ রোধ করা যায় রাজ্য-পরিচালনা ততই নিরাপদ পথে চলবে। এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৯০৩ সালের শেষ ভাগে তাঁর বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। সেই সময় কলিকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। তিনি ভাইসরয় ও গর্ভনর জেনারেল রূপে সেইখানেই বাস করতেন বলে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর পরিকল্পনা কর্য্যে পরিণত করবার জন্য যত্নবান হলেন।

দেশব্যাপী বিক্ষোভ

তিনি ও তাঁর সহযোগীবর্গ দেশব্যাপী প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস পুস্তকে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ২৪)"১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অন্তত ৩০০০ প্রকাশ্য সভায় জনসাধারণ ইহার (বঙ্গবিভাগের) প্রতিবাদ করে। বাংলার সর্বত্র এইরূপ সভার অধিবেশন হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই সমুদয় সভায় যোগদান করে এবং এই সকল সভায় ৫০০ হইতে ৫০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন।"

সরকারী বিবরণ অনুসারেও সাধারণ লোকের অন্তত ৫০০ প্রতিবাদ সভা হয়েছিল এবং ৭০০০ লোকের স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদ-পত্র সরকারের নিকট পাঠান হয়েছিল।

কলিকাতাব টাউন হলে ৫টি বিশাল সভাব অধিবেশন হয়। এই সকল সভায় রাজা-মহারাজা-জমিদার, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছিলেন। বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট ৭০ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এই প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। বাঙালী নেতারা বাংলার সংবিধান সভায় (Legislative Assembly) ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

কিন্তু লর্ড কার্জন ও তাঁহাব সহযোগীরা বঙ্গবিভাগ দ্বারা বাঙালীব সংহতি ও প্রভাব নষ্ট করা এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। কাজেই সমগ্র দেশের দিকে দিকে সকল শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল তার প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। "১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গ-বিভাগ একটি সরকারী সিদ্ধান্ত-রূপে গৃহীত হইল এবং পরদিন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল। স্থির হইল যে আসাম এবং বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ লইয়া ছোট লাট শাসিত একটি নূতন

প্রদেশ গঠিত হইবে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যা আর একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।”

মেদিনীপুরে বিক্ষোভের ঝড়

মেদিনীপুব বাসিগণ এই বঙ্গবিভাগের বিপদকে অগ্রাহ্য করে নাই। রাজধানী কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জেলাতে ও গ্রামাঞ্চলে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল মেদিনীপুব জেলাতেও তাহা গভীরভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল।

কলিকাতার টাউন হলের অনুসরণে মেদিনীপুরেও ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট অনুরূপ বিক্ষোভের ব্যবস্থাপনা হইয়াছিল এবং বেলী হলে ছাত্রদের মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় সহস্র ছাত্রের সমাবেশে এই সংকল্প গ্রহণ করা হয় যে বঙ্গভঙ্গ বদ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা কোন প্রকার আমোদপ্রমোদে যোগদান করিবেন না এবং সযত্নে বিলাতী সামগ্রী পরিহার কবিবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুব নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সংগঠিত হইল। “মেদিনীবান্ধব” পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন। গতিকৃষ্ণ বাগ সভার প্রারম্ভে একটি জাতীয়তা উদ্দীপক সঙ্গীত পরিবেশন করিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাত্রসমাজকে বিলাতী বর্জনে সবিশেষ উদ্বুদ্ধ করিয়া বাণী দিলেন। এ সভায় সর্বপ্রকার স্বদেশী সামগ্রী সরবরাহের জন্য ছাত্র সমাজের উদ্যোগে আরও একটি “ছাত্রভাণ্ডার” স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্গবিভাগ আদেশের প্রতিবাদে মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে তিন দিনের জন্য পাদুকা, কোট এবং ছাতা ব্যবহার করিবে না এইরূপ স্থির করিল। ঐ দিন তাহাবা একটি মহতী পদযাত্রায় শহরের সমস্ত পথগুলি পরিভ্রমণ করিল। সমস্ত ছাত্র নগ্নপদে একটি পতাকা বহন করিয়া ঐ পদযাত্রায় যোগ দেয়। তাহারা কতকগুলি জাতীয় চেতনাময় সংগীত গাহিতেছিল। জেলার শাসন-কর্তৃপক্ষ ঐ শোভাযাত্রার বিরোধী হইল। পুলিশের বড়কর্তা ঐ

শোভাযাত্রার লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হইলেন কিন্তু প্যারীলাল ঘোষ নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া ঐ শোভাযাত্রার লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্মত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ঐ শোভাযাত্রার অনুবর্তী হইয়াছিলেন। ঐ দিনের প্রবল বারিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া নিদারুণভাবে ভিজিয়াও তাঁহারা শোভাযাত্রার অনুগমন করেন। তাহার পরবর্তী সাপ্তাহিক ছাত্রসভায় বহুলোক যোগদান করেন। ঐ সভায় কলিকাতা হইতে আগত ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং মেদিনীপুর রাজের ম্যানেজার কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী ভাষণ দান করেন। তাহার পর একটি বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হইল। তখন স্থানীয় ঈদ উপলক্ষে প্রতি বৎসর কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিসমেত সুবৃহৎ জনসভা হইত ঐ উৎসব উদযাপন করিতে। ছাত্রবৃন্দ ঐ জনসমাবেশের সুযোগ হারাইল না। পাঁচটি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ঐ জনসমাজের উদ্দেশ্যে ছাত্রবৃন্দ বক্তৃতা দিয়া তাহাদের আদর্শ প্রচার করিয়াছিল। ছাত্রগণ পাঁচটি কেন্দ্রে সভানুষ্ঠানের প্রারম্ভে জনসমাবেশের জন্য সমবেতকণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাহিয়াছিল।

শুধু মাত্র মেদিনীপুর শহরেই নহে, ক্ষীরপাই, দাঁতন, পাঁচবোল, ঘাটাল, মহিষাদল, কাঁথি, মীরগোদা, ব্যবর্ত্তার হাট প্রভৃতি বহু স্থানে অনুরূপ সভানুষ্ঠান হয়।”

রাখিবন্ধন ও অরন্ধন

বঙ্গবিভাগ আইনতঃ সিদ্ধ হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর —বাংলা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন। এই দিনটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঐ দিনটি সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতিপালিত হয় রাখীবন্ধনের দ্বারা। বাঙালীকে আইনের বলে পৃথক করা চলবে না। তারা একই মিলনসুত্রে আবদ্ধ। এই জন্য রাখীবন্ধনের মন্ত্র

ছিল "ভাই ভাই এক ঠাঁই"। বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার শোক-প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অরন্ধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে শিশু রোগী প্রভৃতি অক্ষমদের জন্য ছাড়া কোন বাড়ীতে উনান জ্বলিবে না এই প্রস্তাবটি ঐ ভাবে কার্যে পরিণত করা হয়েছিল।

প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের সঙ্গে স্নান সেরে সমবেত জনমণ্ডলী পরস্পরের হাতে হলুদ রঙের রাখী বেঁধে দিল এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত নিম্নের প্রার্থনা-সংগীতটিও সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হ'ল :

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার হাওয়া, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

মেদিনীপুর শহরের অনুষ্ঠান

১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) মেদিনীপুরের জনসভায় নিম্নলিখিত জাতীয় শপথ-বাণী গ্রহণ করা হল, "বাঙ্গালীর-সার্ব্বজনীন

প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া সরকার যখন বঙ্গবিচ্ছেদ পর্ব সমাধা করিল তখন আমরাও আমাদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য এবং আমাদের দেশ বিভাগের অবসান কল্পে আমাদের সাধ্য সম্মত সর্ববিধ ব্যবস্থাগ্রহণে তৎপর হইব এই শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং তাহা ঘোষণা করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

ঐ দিন মেদিনীপুর শহরে কংসাবতী নদীতীরে এক অপূর্ব সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি নগ্ন দেহে ও নগ্ন পদে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গাইতে গাইতে অতি প্রত্যুষে কংসাবতী তীরে সমবেত হয়ে স্নান করে—"ভাই ভাই এক ঠাঁই" মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিল। আবার বাঙালীর ঐক্য প্রার্থনা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে ফিরে এল। ব্যাপক ভাবে অরন্ধনও প্রতিপালিত হল। আকাশে বাতাসে এক স্বর্গীয় 'ভাবের স্ফুরণ—ভাই ভাইএর পাশে দাঁড়িয়েছে—পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের পৃথক করতে পারবে না।

"মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হ'য়ে, পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই
ক'দিন থাকে।
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ঐ ডেকেছে কে
গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধ'রে রাখে॥
যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বাঁধন জানে না কে॥
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,

নবীন আসে হৃদয় ভাসে
ভাইএর পাশে ভাইকে দেখে ॥
কতদিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

এই প্রাণঢালা সংগীতের বোল নানা দিকে শোনা গেল, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশল অপূর্ব ভাবের হিল্লোলে।

সূতা প্রস্তুত ও বয়নশিল্প

স্বদেশী মেদিনীপুরের জনগণের এক সহজাত বস্তু। মেদিনীপুরের বিস্তৃত সমুদ্র-উপকূলে প্রকৃতির দান-স্বরূপ লবণ মাটি ও লবণ জল থেকে গৃহে গৃহে লবণ তৈয়ারী করা হত। আইনের দ্বারা এই কার্য্যকে বেআইনী ঘোষণা ক'রে ইংরেজরাজ তার দেশের লবণ কিনবার জন্য লোককে বাধ্য করেছিল। এই কার্য্য-কলাপের দ্বারা লিভারপুলে এই দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হ'ত। মেদিনীপুর জেলার তুলার উৎপাদন বহুবিস্তৃত ছিল। চরকায় কাটা ঐ তুলার সুতায় গ্রামে গ্রামে বহু তাঁত চলত। বহু অত্যাচারের পর ম্যাঞ্চেষ্টারের কলে তৈয়ারী বিলেতী কাপড় চালু করার পরও তাঁত নির্মূল হয়ে যায় নি। রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, নিমপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁতের মিহি কাপড়ের খ্যাতি সুদূর বিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদেশী কলের সুতাতে এই সব তাঁত চলত। কিন্তু তাঁতীর নৈপুণ্য ছিল অপূর্ব। তুলাজাত সুতা ছাড়া রেশমী, তসর, কেটে প্রভৃতি গুটিপোকা-জাত তন্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'ত। চিনি, মিছরির কারখানার জন্য জেলার কতকগুলি স্থান বিখ্যাত ছিল। শাঁখা-শিল্পের খ্যাতিও কম ছিল না।

রাজশক্তির সাহায্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা জেলার এই সব

দেশী শিল্পের সর্বনাশ সাধন করেছিল কিন্তু দেশের জনসাধারণ এজন্য এক দুঃখ ও শোকের স্মৃতি বহন করে আসছিল। বঙ্গভঙ্গ রূপ মহা বিপদের সম্মুখীন হয়ে লোকের মনে যে আত্মস্থ হওয়ায় চিন্তা ও সংকল্প জগ্রত হ'ল—স্বদেশকে এবং স্বদেশের সকল বস্তুকে ভালবাসার জন্য যে আকুতির সৃষ্টি হ'ল তাই স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রাম গঞ্জে শহরে প্রবল বন্যার মত প্রসার লাভ ক'রে মনুষের মনকে ডুবিয়ে দিতে লাগল। জেলার সুবিখ্যাত বয়ন শিল্পকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য দিকে দিকে সাড়া পড়ল। নানা স্থানে নূতন নূতন তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠিত হল। ব্যক্তিগত উদ্যমেও বহু গৃহে তাঁত চলল।

কাঁথিতে ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা

চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাসে লিখিত হয়েছে (পৃঃ ১৮) "বয়ন শিল্প প্রবর্তনের জন্য মুলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাঁথিতে একটি বিপুল জনসমাবেশ হইল। সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল—আমরা কাঁথি মহকুমার অধিবাসীবৃন্দ সর্বান্তঃকরণে আমাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আমাদের প্রিয় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া শপথ গ্রহণ করিতেছি যে বাংলাদেশে সুতা প্রস্তুত কার্য ও বয়ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য আমাদের একদিনের উপার্জন দান করিব।

এই প্রস্তাব বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কর্তৃক উত্থাপিত ও মুন্সী মহিউদ্দীন কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল। ঐ সভায় বনবিহারী মুখার্জী, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, দ্বারিকানাথ ধব এবং বিধুভূষণ গিরি উদাত্ত ভাষণ দেন। জনসাধারণের মনোভাব হইতেও বোঝা গিয়াছিল যে তাহারা অবস্থার গুরুত্ব ও পবিত্রতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল।"

মেদিনীপুর জেলাতেও বিভিন্ন প্রকার তন্তুবয়নের যে বিপুল আয়োজন ছিল তা আর ফিরে আসেনি বটে কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তুলাজাত সুতার তাঁতশিল্প বহুবিস্তৃত হয়ে উঠেছিল। এই গঠন-প্রয়াস সাহায্য পেয়েছিল স্বদেশী বয়কট আন্দোলনের প্রাণমাতানো

উৎসাহ ও উদ্দীপনা থেকে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ক'রে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের জন্য দেশময় এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল। বিদেশী কাপড় ছাড়া আরও কতপ্রকারের বিদেশী দ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনের মধ্যে এসে পড়েছিল স্বদেশী আন্দোলন সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল। কবি গাইলেন—"প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।" কাপড়, লবণ, চিনি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বহু বস্তু বিদেশ থেকে এসে আমাদের লজ্জা নিবারণ করছে—আমাদের রন্ধনশালা, আমাদের দেব আরাধনা, পূজা পার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে সাধারণের অনিবার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী গ্রহণের আন্দোলনের ফলে দেশের লোকের দৃষ্টি সেদিকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হল।

কাঁচের চুড়ির বিরুদ্ধে আন্দোলন

সখের জিনিস হিসাবে গরীব লোকের বাড়িতে পর্য্যন্ত রেশমী চুড়ি প্রবেশ করেছিল। ফেরিওয়ালী মেয়েরা গ্রামাঞ্চলে যে সকল জিনিস-ভরা চাঙারি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াত তার মধ্যে রঙের বাহার ও কারুকার্য্যের বাহার খেলিয়ে রেশমী চুড়ি একটি অল্প দামের প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে মেয়েদের মন হরণ করত। নগদ পয়সা না দিয়ে চাউল ও ক্ষুদের বিনিময়ে ঐগুলি কিনে নিতে অসুবিধা হত না। ছোট্ট একটি গ্রাম্য মেলাতেও ঐ বাহারে চুড়িব গোছাগুলি সহজেই মেয়েদের চিত্ত আকর্ষণ করত এবং উপহার প্রভৃতি নানা কার্য্যের জন্য দুচার জোড়া চুড়ি কেনা হচ্ছে না এইরূপ গৃহস্থ অতি অল্পই দেখা যেত। এক সময়ে রেশমী চুড়ি সৌখিন দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐগুলি যেমন বাহারে তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি অল্প ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই রেশমী চুড়ি গ্রাম থেকে শহর পর্য্যন্ত হাট বাজারগুলি ছেয়ে ফেলেছিল। এই রেশমী চুড়ি বর্জন স্বদেশী কার্য-ধারার একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি গেয়েছেন—"ছেড়ে দাও বঙ্গ নারী রেশমী চুড়ি, কভু হাতে আর পরো না।"

চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রভাব এই গানের মধ্য দিয়ে বিস্তার করতেন। মেয়েরা তাঁদের সাধের চকচকে চুড়িগুলি ফেলে দিত। স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যতম কার্যক্রম ছিল রেশমী চুড়ির বিরুদ্ধে অভিযান। কাঁথি মহকুমার সুপরিচিত দেশকর্মী ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র রাণা তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের বাল্যকালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—তাঁদের বয়সের স্বেচ্ছা-সেবকদের কাজ ছিল "চুড়ি ভাঙ্গা"। তাঁরা কয়েকজন প্রতিদিন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের মহলে প্রবেশ করতেন এবং কতক ইচ্ছায় কতক বা অনিচ্ছায় মেয়েরা তাঁদের চুড়ি ভাঙ্গা অভিযানের অঙ্গীভূত হতেন। ইনি তাঁর বাড়িতে ফিরে দাদুর কাছে এঁদের কাজের বিবরণ দিতেন। বয়স্ক কর্তাবাবু চুড়ি ভাঙ্গা কার্যক্রমের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদল—"বন্দেমাতরম্" মন্ত্র

উপরের একটি কিশোর স্বেচ্ছাসেবকের ও তাদের সঙ্গীদের কথা বলা হল—স্বদেশী আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল ছাত্র ও যুবক স্বেচ্ছাসেবক দল। ছাত্রসভা ও জনসভাগুলি স্বেচ্ছাসেবক দলের "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে মুখরিত হত। শহরের বা গ্রামের বাজার হাট স্বেচ্ছাসেবক দলের স্বদেশী গানে এক নবীন উন্মাদনার সৃষ্টি করত। স্বেচ্ছাসেবকদের পোষাক ছিল মালকোঁচা মারা দেশী মিলের ধুতি ও দেশী মিলের থানে প্রস্তুত জামা। মাথায় থাকত একটি সাদা পাগড়ী, হাতে থাকত মাথা প্রমাণ একখানি বাঁশের লাঠি। সব সময় তাদের কোন ব্যাজ থাকত না—বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ব্যাজ ব্যবহৃত হত। এরা যখন শোভাযাত্রা ক'রে গান গাইতে গাইতে চলতেন, জনসাধারণের মনে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হত। এদের মন্ত্র ছিল "বন্দেমাতরম্"। এই ধ্বনি মধ্যে মধ্যে সংগ্রামধ্বনিতে পর্যবসিত হত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপটে যে মন্ত্রটি তাঁর আনন্দমঠ রচনার কয়েক বৎসর পূর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তা' তিনি তাঁর আনন্দমঠের

গুরু ব্রহ্মচারীর মুখ দিয়ে বর্ণনা করেছেন্ অতি মনোরম এক পরিবেশের মধ্যে। "আনন্দমঠে" সন্নিবিষ্ট দেবমূর্তিগুলিকে দেখাবার কালে ব্রহ্মচারী বিষ্ণুর অঙ্কোপরি স্থাপিত একটি মোহিনী মূর্তিকে মহেন্দ্রের নিকট পরিচিত করিয়ে দিলেন—যিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।

ব্রহ্মচারী—বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহেন্দ্র—দেখিয়াছি—কে উনি?

ব্রহ্মচারী। মা

মহেন্দ্র। মা কে?

ব্রহ্মচারী। আমরা যাঁর সন্তান

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্মচারী। সময়ে চিনিবে। বলো বন্দেমাতরম্।

ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? ব্রহ্মচারী—মা যা ছিলেন........ ...ইঁহাকে প্রণাম কর।

অপর কক্ষে গিয়া মহেন্দ্র ক্ষীণ চন্দ্রালোকে এক কালী মূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী। "মা যা হইয়াছেন"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন। "কালী!"

ব্রহ্মচারী। কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন হায় মা!

মহেন্দ্র। হাতে খেটক-খর্পর কেন?

ব্রহ্মচারী। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র —বল 'বন্দেমাতরম্'।

এরপর ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেখালেন এক ময়ুর-প্রস্তর নির্মিত

প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণ-নির্মিতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন—এই মা, যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা শক্তি রূপে নানা আয়ুধ শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুপীড়নে নিযুক্ত।........দিগভুজা নানা প্রহরণধারিণী—শত্রু বিমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী—বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞানদায়িনী সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

আমরা মহেন্দ্র ও ব্রহ্মচারীর কথাবার্তার মধ্যে মার তিনটিরূপের পরিচয় পেলাম। মা যা হয়েছেন তা থেকে মা যা হবেন সেই পরিকল্পনার চিত্র সন্তান (সন্ন্যাসী) দলের আদর্শের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

একাজ কে করছে বা করবে এবং তাঁদের কাছে "মা" কে যাঁর কথায় ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে বলেছিলেন "সময়ে চিনিবে—" তাঁর কথা আনন্দমঠের অন্যতম সন্তান ভবানন্দ ও মহেন্দ্র যে কথাবার্তায় রত হয়েছিলেন তাতে পরিস্ফুট হয়েছে।

"........ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন।

বন্দেমাতরম

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য শ্যামলাং
মাতরম্।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা মাতা কে জিজ্ঞাসা করিল...."মাতা কে ?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন

"শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র কহিল "এত দেশ ; এত মা নয়।"

ভবানন্দ কহিলেন আমরা অন্য মা জানি না....জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই। আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা, শস্য-শ্যামলা —"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র কহিলেন "তবে আবার গাও।" ভবানন্দ আবার গাহিলেন।

বন্দেমাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভূজৈর্ধৃত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্য তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্

সুজলাং সুফলাং মাতরম

বন্দেমাতরম্

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভুষিতাম্

ধরনীং ভরণীম্ মাতরম্।"

মহেন্দ্র দেখিলেন দস্যু গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "তোমবা কারা" ভবানন্দ বলিল "আমরা সন্তান"।

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবানন্দ। মায়ের সন্তান—

মহেন্দ্র। ভাল, সন্তান কি চুরি-ডাকাতি করিযা মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবানন্দ। আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহেন্দ্র। এইত গাড়ী লুটিলে।

ভবানন্দ। সে কি চুরি ডাকাতি? কার টাকা লুটিলাম?

মহেন্দ্র। কেন রাজার।

ভবানন্দ। রাজা? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহেন্দ্র। বাজার বাজভাগ!

ভবানন্দ। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহেন্দ্র। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবানন্দ। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজও দেখিলাম।

মহেন্দ্র। ভাল করে দেখনি, একদিন দেখিবে।

ভবানন্দ। না হয় দেখিলাম, একবার বই তো দু'বার মরিব না।"

দেশমাতা

এই যে দেশকে মা বলে জানা ও ডাকা—অন্তরের গভীরতম

প্রদেশ থেকে সুতীব্র অনুভূতির সুরম্য প্রকাশ, এর সৃষ্টি ও বহিঃ প্রকাশ স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম অবদান।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক, হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক, মুখ তুলে আজ চাহ রে।" গানটি গীত হত গভীর আবেগের সঙ্গে। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে—নগর হতে নগরান্তরে এই সঙ্গীতের মূর্ছনা জাগাত দেশবাসীর হৃদয়ে এক নবীন হিল্লোল, অভিনব প্রেরণা!

স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশের প্রত্যেকটি নরনারীর নিকট উদাত্ত স্বরে তাদের প্রাণের আহ্বান পৌঁছে দিত। সভা, শোভাযাত্রাদিতে "আমরা অন্য মা মানি না" ভবানন্দের এই বাণীকে সার্থক করে তুলত।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের মধ্যে দেশের যে মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং "সন্তান" দলের সাধনাতে যে মাতৃরূপ দশদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই মাতৃরূপকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত ক'রে দ্বিধাখণ্ডিত বঙ্গের বেদনাক্লিষ্ট সন্তানগণকে শুনিয়েছিলেন—

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥
ওমা ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে.
নদীর কূলে কূলে

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায় হায় রে)
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে
আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

ধেনু চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখি ডাকা—ছায়ায় ঢাকা
তোমাব পল্লী বাটে
তোমার, ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মবি হায় হায় রে)
ও মা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥"

জন্মভূমির উদ্দেশ্যে সমর্পিত এই মাতৃভাব অনুরণিত সঙ্গীতটিই আজ স্বাধীন বাংলা দেশে "জাতীয় সঙ্গীত" রূপে পূজিত ; এবং ঋষি বঙ্কিমের প্রজ্ঞালব্ধ "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি ভারতেব জাতীয় সঙ্গীতের স্থান লাভ করেছে।

মেদিনীপুরে ব্যাপক স্বদেশী

মেদিনীপুর একটি কৃষক অধ্যুষিত জেলা। এই জেলার সন্তানরা অধিকাংশই ধানে ভরা আঙ্গিনাতে জীবনের দিন কাটায়। এই জেলার শিল্পাদিও প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষিভিত্তিক। তাই বঙ্গব্যবচ্ছেদকে অবলম্বন ক'রে যখন স্বদেশীর ডাক এল তখন জেলার গ্রামে গ্রামে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। সকল শ্রেণীর নর-নারী ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল! বিলাতী লবণ ফেলে দেশী করকচ লবণ, বিলাতী ধবধবে দানাদার চিনির স্থানে গুড় ও লালচে গুড়া চিনি (খান্দেসরী) অতি যত্নের সঙ্গে গৃহীত হল। বিলাতী কাপড় ছেড়ে দেশী মিলের মোটা ধুতি-শাড়ী আদৃত হল। বিদেশী প্রসাধন দ্রব্য

প্রায় নির্বাসিত হল। রেশমী চুড়ি ত্যাগ একটি যজ্ঞের আকার ধারণ করল।

কবি রজনীকান্ত গাইলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীনতুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়েব অপাব স্নেহ দেখতে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ওই পবের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই তুঃখী মায়ের ঘরে তাদের সবার প্রচুর অন্ন নাই।
তবু তাই বেচে, কাঁচ, সাবান, মোজা কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে, এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই।
পবের জিনিষ কিনব না যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

ঘরে ঘরে এই গানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা গেল। স্বেচ্ছা-সেবক দল শহর, গ্রাম, পথঘাট এই গানে মুখরিত করে তুলল। স্বেচ্ছাসেবক হলো স্কুল কলেজের ছাত্রেরা, বিভিন্ন সংঘের (ক্লাব ইত্যাদি) সদস্যরা এমনকি বেকার যুবকরা, জীবিকা অর্জনের ছোট খাটো কাজে রত যুবকরা। নেতৃত্ব দিলেন সাধারণতঃ আইন জীবিরা, শিক্ষকেরা, কর্মপটু বয়স্ক যুবকেরা। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা বহু ব্যাপক ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ স্বদেশীর স্রোতে ভাসতে লাগল। বিপন্ন-স্বার্থ একদল লোক ছাড়া বিরোধিদের দলে অন্য কাউকে যোগ দিতে দেখা যেত না। স্বদেশী প্রবাহ হয়ে উঠেছিল সার্বজনীন। স্বদেশীর পূর্ব্বে এমন কোন আন্দোলন দেশে দেখা দেয়নি যা একরূপ সকল মানুষের অন্তরে দোলা দিয়েছে। যাতে ঃ

"নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইএব পাশে ভাইকে দেখে"; যা দেখায় একটি আশার স্বপ্ন "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে"; যাতে ইংরেজ সরকাবের অত্যাচারের ভয়কে অবহেলা করে দৃঢ় স্বরে অন্তরের বাণী উচ্চারিত হয়—"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে, মোদের ততই বাঁধন

টুটবে, ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, ততই মোদের আঁখি ফুটবে।"
এইভাবে শত সঙ্গীতের মূর্ছনা দেশবাসীর মনকে ভাবের সাগরে
ডুবিয়ে দিয়েছিল—যা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি।

বহু আখড়া স্থাপন

যুবকরা লাগল কাজে। আত্মশক্তির সাধনাতে শরীর ও মন
দুইই শক্ত হওয়া চাই। কত আখড়ার সৃষ্টি হল। ব্যায়াম,
লাঠিখেলা, ফুটবল প্রভৃতি বিদেশ থেকে আমদানী খেলার পরিবর্তে
হাডুডু কপাটি ইত্যাদি দেশী খেলা যেগুলি প্রায় উঠে যেতে বসেছিল,
সেগুলির আবার পুনঃ প্রবর্তন হতে লাগল। জেলা সদরে, মহকুমা
শহরে, গ্রামাঞ্চলের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে যেন শক্তির উৎস
খুলে গেল।

মেদিনীপুর শহরে আখড়া গুলির মধ্যে মিঞা বাজারের আখড়া,
তমলুক শহরে রক্ষিত বাড়ীর আখড়া, কাঁথি শহরে "বন্দেমাতরম্"
গ্রাউণ্ডের আখড়া, শহীদ ক্ষুদিরামের প্রেরণা-সঞ্জাত মুগবেড়্যার
(কাঁথি মহকুমা) আখড়া প্রভৃতি শত শত যুবকের দেহমনকে লৌহের
আকার দান করেছিল। সে সময় জেলাতে আখড়ার সংখ্যা কেহ
রাখে নাই কিন্তু সমগ্র জেলায় যে উৎসাহ উদ্দীপনা, শরীর গঠনের
যে দৃঢ় মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে মনে হয় জেলাতে কয়েক
শত ব্যায়াম, কুস্তি ও লাঠি খেলার আখড়া ছাত্র ও যুবক দলকে নূতন
শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এমন একটিও মহকুমা বা থানা
বাকী ছিল না যেখানে ব্যায়াম ও কুস্তির আখড়ার সৃষ্টি হয় নি।
লাঠিখেলার শিক্ষক পাওয়ার জন্য আগ্রহের সীমা ছিল না। যেখানেই
শিক্ষক যোগাড় সম্ভবপর হয়েছে সেখানেই আখড়াগুলিতে লাঠি
খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। যতদিন পুলিশের বিষদৃষ্টি এইসব আখড়া-
গুলির উপর পড়েনি, ততদিন থানা পুলিশের কনেষ্টেবলদের মধ্য থেকে
লাঠি খেলার শিক্ষক যোগাড় করে নিতে অসুবিধা হয়নি।

ইংরেজ তার রাজ্যচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর দৃষ্টি প্রয়োগ

করেছিল, প্রতিপদে যে শোষণ ও আর্থিক নিঃস্বতা সৃষ্টির দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত হচ্ছিল সে দিকে দেশকে সজাগ করার জন্য নেতৃবৃন্দ ও প্রচারক বৃন্দ জনসভার অনুষ্ঠান ক'রে বেড়াতে লাগলেন। বিখ্যাত লেখক সখারাম গণেশ দেউসকর মহাশয়ের "দেশের কথা" পুস্তকটি দেশের প্রকৃত অবস্থা, ইংরেজদের লুণ্ঠন ব্যবস্থাদি প্রাণস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছিল। ছাত্র ও যুবক মহলে এই পুস্তকটি ধর্মগ্রন্থের স্থান অধিকার করেছিল। উহা অচিরে বাজেয়াপ্ত হলেও ইহার গোপন প্রচার ও পাঠ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই সময় আরও যে সমস্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল গোপনীয়তার রহস্যজাল সেগুলিকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সে সময়কার সংবাদপত্র ছিল সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, হিতবাদী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'র শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা বৃটিশ 'প্রেষ্টিজ'কে উপহাসাস্পদ ক'রে তুলত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'যুগান্তর' প্রকাশ্য ভাবে বৃটিশ শাসনের যে নগ্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলত সেইগুলি রাজভয়কে ধুলিসাৎ করে দিত। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা বয়কটের ধ্বজা তুলে ধরে সৃষ্টি করত অপূর্ব কর্ম্মশক্তি। এই ভাবে সেই সময়কার পত্রপত্রিকাগুলির বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মধারাকে বৃটিশের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত ক'রেছিল।

ছাত্র ও যুব সমাজে বিপুল উদ্দীপনা

মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত দেবদাস করণ সম্পাদিত 'মেদিনী-বান্ধব' কলিকাতার বাইরে প্রকাশিত সংবাদ পত্রগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিল। পত্রিকাটি ছাত্র ও যুব সমাজকে কর্মের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদ, কাজী নজরুল, রজনীকান্ত, গোবিন্দচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, মুকুন্দ দাস, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, সরলা দেবী প্রমুখ কবিদের কাব্য ও কবিতা এবং দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক, স্বাদেশিকতার

প্রচারক সংবাদপত্রগুলি, স্বদেশী আন্দোলনের পোষক মাসিক পত্রাদি ছাত্র যুবক ও অন্যান্য সর্বস্তরের জনসাধারণের মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করত।

ছাত্র সমাজের আবৃত্তির জন্য "কথা ও কাহিনীর" বীরত্বব্যঞ্জক কবিতাগুলি এবং অন্যান্য দেশ ভক্তি পূর্ণ রচনাগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। "শিবাজী ও পৃথ্বীরাজ" কাব্য প্রণেতা কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত একটি কবিতা ছাত্র ও যুবসমাজে অতি আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করা হত, তার কয়েক পংক্তি নিম্নরূপ ঃ—

"হের বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত তব ভারতেব মানচিত্র
পুণ্যভূমি এই মাতৃভূমি আমা সবাকার...............
....
....
বহু পুণ্য ফলে জন্মে নব এ ভারতে; কিন্তু চিরদিন
বাখিও স্মরণে বৎস কর্ম গুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি মুখ,
বৃথাই জনম তব, কি বলিব আর,
ভারত সন্তান তুমি, আর্য বংশধর
ভুলিও না কোন দিন, করি আশীর্ব্বাদ
ভদ্র হও, ধন্য হও ভারত মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র, স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্য পথে
হও বৎস, অগ্রসর। ভারত জননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদ।"

উপরে লিখিত প্রাণ ও মনের সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও যুবকগণের স্বেচ্ছাসেবক রূপে স্বদেশী প্রচার কার্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য বিলাতী পণ্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং বিশেষ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ছোট বড় স্বেচ্ছা-সেবক দল শহরের বাজারগুলিতে এবং হাটবারে গ্রাম্য হাটগুলিতে

বিলাতি কাপড়ের দোকানে ও লবণ, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং চালাত। এইসব ব্যাপারে কোথাও কোথাও সংঘর্ষের সৃষ্টি হত এবং মামলা মোকদ্দমারও উদ্ভব হত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল ঃ

'মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস' (চিত্তরঞ্জন দাস) পৃষ্ঠা ২০ হতে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল ; (২১ শে অক্টোবর ১৯০৫) "এইখানে (মেদিনীপুর শহরের বল্লভপুর স্থিত চন্দ্রাকর ময়দানে) এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইল। জাতীয় সংগীতের দ্বারা সভার সুচনা হইল এবং আল্লাহ আকবর ধ্বনি উদ্গীত হইতে লাগিল। পুনরায় ঐ স্থান হইতে আর একটি শোভাযাত্রা শুরু হইয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করিল।

ব্যবসায়ী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ফৌজদারী মামলা

বিলাতী সামগ্রী বিক্রেতা বড় বড় দোকানগুলিতে ছাত্রবৃন্দ পিকেটিং করিতে লাগিল। বণিকগণ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যোগজীবন ঘোষ এবং আর একটি ছেলের বিরুদ্ধে বিলাতী বস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া এবং তাহাদের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করার অভিযোগে একটি ফৌজদারী মামলা রুজু করিল। ছাত্রবৃন্দও তাহাদের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগে একটি পাল্টা মামলা রুজু করিল। বণিকগণ কে, বি, দত্ত মহাশয়কে তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। তিনি ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। বণিকেরা জেলায় তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন আইনজ্ঞকেও না পাইয়া মামলার সোলেনামা করিতে বাধ্য হইল, ঐ দলের সর্দার অখিল চাবরী এবং গঙ্গানারায়ণ দত্ত কৃপা প্রার্থনা করিয়া করুণভাবে আবেদন করিল। ছাত্রবৃন্দকে প্রহার করিবার জন্য খেসারত স্বরূপ এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে এবং প্রকাশ্যে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে তবেই তাহাদের বিরুদ্ধে দাখিলী মামলা তুলিয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যে সাধারণ ভাবে

একঘরে করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। উহারা সম্মত হইলে ফৌজদারী আদালতে বিপুল জনতা ও ছাত্রবৃন্দের উপস্থিতিতে উহারা মার্জনা ভিক্ষা করিল ও একহাজার টাকা নগদ প্রদান করিল। স্বদেশী দলের এই অভুতপূর্ব বিজয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মন্দ্রিত হইয়া উঠিল। সমস্ত মামলাগুলি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইল। উকিল মোক্তার এবং ভূবনেশ্বর মিত্র ও তাঁহার সুযোগ্য জামাতা শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর উদ্যোগে ডাক্তারদের দ্বারা বর্জিত হওয়ার প্রতিক্রিয়াতে উহারা অবদমিত হইল।"

মেদিনীপুর শহরের এই ঘটনাটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসায়ে সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে মূলধন নিয়োগ করতেন তার পরিমাণ বড় অল্প ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিপুল যান্ত্রিক শিল্পের সহিত জড়িত কিছু ব্যবসায় বাদ দিলে বিদেশী মিলজাত বস্ত্রের ব্যবসায় গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে শহর পর্য্যন্ত বহুব্যাপক এবং মূলধন নিয়োগ সাপেক্ষ একটি বিরাট ব্যবসায় হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই ব্যবসায়ের গায়ে হাত পড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা যে বিমূঢ় অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। কাজেই স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দমন করার একটি সাধারণ প্রবণতা প্রসার লাভ করেছিল। বিদেশী বস্ত্রকে তারা কোন যুক্তির দ্বারা সমর্থন করতে পারতেন না তাতেও সন্দেহ নেই কিন্তু নিজেদের ব্যবসায়ের ধ্বংসসাধন কাজের নীরব দর্শক হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। স্বদেশীর উদ্দীপনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকগণ সর্বপ্রকার বিপদ বরণে প্রস্তুত হত। তারা হাটে মাঠে ঘাটে প্রাণ ভরে গাইত—"লালটুপি আর কালো কোর্ত্তা জুজুর ভয় কি আর চলে? আমি মায়ের সেবায় রইবো রত পাশব বলে দিক জেলে!"

কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয় রচিত এই গানটি গ্রামে, শহরে সভা, শোভাযাত্রায় সর্বত্রই স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের চিন্তা ও

কর্মের মূলনীতি এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার মেরুদণ্ড স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল —যার শক্তিতে তারা রাজ শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করত।

"মাগো, যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
"বন্দেমাতরম্" বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে॥
যখন মুদে নয়ন করব শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে॥
আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণ তলে,
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হব কোন কালে?
আমার যায় যেন জীবন চলে॥
লাল টুপি আর কালো কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
আমি মায়ের সেবায় রইবো রত
পাশব বলে দিক জেলে,
আমার যায় যেন জীবন চলে॥
আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?
আমার যায় যেন জীবন চলে॥
আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।

ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে
আমার যায় যেন জীবন চলে ॥
যে মার কোলে নাচি শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে ;
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ;
আমার যায় যেন জীবন চলে ॥
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে,
সুখ হবে না ভূতলে।
সে তো অধম যে হয় সইতে রাজি
উত্তমে চায় মুখ তুলে
আমার যায় যেন জীবন চলে ॥"

বিলাতী বস্ত্র ও দ্রব্য বর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের এইরূপ সংঘর্ষ মধ্যে মধ্যে আরও ঘটেছে। "মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণ সংগ্রাম খেজুরী থানা"—শ্রীবসন্ত কুমার দাস রচিত উক্ত পুস্তক থেকে আরও একটি সংঘর্ষ-মূলক ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। খেজুরী থানার অজানবাড়ি প্রভৃতি হাটে বিলাতী কাপড় বিক্রয় করার জন্য একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। "অনেক স্থানে দোকানে যেসব দোকানে বিদেশী কাপড় ছিল সেইগুলিকে কাঠের উপর খোদাইর ছাপ দিয়া দাগ করিয়া দেওয়া হইল। ছাপ মারা কাপড় গুলি ফুরাইয়া গেলে নতুন বিলাতী কাপড় বিক্রয় করা চলিবে না। অর্থাৎ ছাপা বিহীন বিলাতী কাপড় দোকানে দেখা গেলে তাহা নূতন আমদানী কাপড় বলিয়া অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইবে। তখন সংশ্লিষ্ট দোকানদারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।"

খেজুরী থানাতে পিকেটিং—পাঁচ জনের কারাদণ্ড

সংঘর্ষ-মূলক ঘটনাটি খেজুরী থানার পশ্চিমাংশে ঘটেছিল: "বীর শহীদ ক্ষুদিরামের আনাগোনা ছিল ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়া অঞ্চলে। খেজুরীর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক যুবক তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ঐ অঞ্চল তখন হেঁড়িয়া থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল পরে তাহা খেজুরীর সহিত যুক্ত হয়। ১৯০৮ সালে ঠাকুর নগর গ্রামের দোল পূর্ণিমার মেলাতে বিলাতী দ্রব্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং করেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মেলা হইতে তাড়াইয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলে। তাহাদের প্রতি অসৌজন্য মূলক ব্যবহার করা হয়। এইভাবে একটি সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় ও পুলিশ হইতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। তাহাতে কাঁথির আদালতে আসামীগণকে দশমাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইঁহারা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত যুবক। ক্ষীরোদ নারায়ণ ভুঁইয়া এম, এ, বি, এল (ইক্ষুপত্রিকা), শশী ভূষণ বেরা (জুখিয়া), সৃষ্টিধর জানা (ঝিনুকখালি), যামিনী কান্ত পড়িয়া ও রমেশ চন্দ্র মণ্ডল (ঠাকুরনগর)। ব্যারিষ্টার কে, বি, দত্ত ইঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন। আপীলে ইহাদের পূর্ব দণ্ড বহাল থাকে। কিন্তু হাইকোর্ট ইঁহাদের দণ্ড হ্রাস করিয়া তিনমাস করেন। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এ, চৌধুরী আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলার অন্যতম আসামী ক্ষীরোদ নারায়ণ ভুঁইয়া পরবর্তী জীবনে হাইকোর্টের উকিল রূপে সুপরিচিত হইয়াছিলেন।"

এই প্রকার সংঘর্ষ বা মামলা-মোকদ্দমা খুব বেশী সংখ্যায় ঘটত না। তার কারণ সমগ্র দেশে যে স্বদেশীর বন্যা বয়ে চলছিল তাতে কোন বিরুদ্ধতা সৃষ্টির প্রয়াস অসম্ভব ছিল। তথাপি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাদের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ছিলেন প্রধান, আত্মরক্ষার চেষ্টায় স্বেচ্ছাসেবকদিগকে জব্দ করার চেষ্টা করতেন।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষিত ও অন্যান্য গণ্য-মান্য

ব্যক্তিরা স্বদেশী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ঘাটাল মহকুমাতে স্বদেশী

ঘাটাল মহকুমার তাঁত বস্ত্রের শিল্পনৈপুণ্যের খ্যাতি বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এখানকার কেঁচকাপুর নিবাসী বিহারী লাল সিংহ, নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ, আশুতোষ সিংহ প্রভৃতি জমিদার ও জমিদার সন্তানগণ স্বদেশী প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বড় অস্তলের মোহন্ত মহারাজ রামানুজ দাস, জাড়ার ও নাড়াজোলের খ্যাতিমান জমিদারগণও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান ক'রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্র লাল খান ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র দেবেন্দ্র লাল খান স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন। জাড়ার যোগেন্দ্র চন্দ্র রায়, এবং তাঁর দুই পুত্র কিশোরীপতি রায়, ও সাতকড়ি পতি রায় স্বদেশী আন্দোলন ও তৎপরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে ত্যাগ ও নেতৃত্বের জন্য জেলাতে উজ্জ্বল গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেঁচকাপুরের নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ স্বদেশীর নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মৌলবী মনিরুজ্জমান, হেমচন্দ্র সেন, ছাত্রনেতা শচীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ঘাটালে আগমন করেন। ঘাটালে পৌছলে পথপার্শ্বে সহস্র সহস্র নর-নারী শঙ্খধ্বনি, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহকারে উঁহাদিগকে অভিনন্দিত করে। বিপুল জনসমাগমের মধ্যে যে সভার অনুষ্ঠান হয় তাতে হেমচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর স্বভাব সুলভ স্বদেশী সঙ্গীতের দ্বারা অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কেঁচকাপুরের জমিদার শ্রীনাথ চন্দ্র সিংহ মহাশয়।

নিশ্চিন্তপুরের জমিদার শীতল প্রসাদ রায় মহাশয়ের পত্নী তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের ত্রিরাত্রি শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বিদেশী চিনি, বস্ত্রাদি বর্জন করে একটি আদর্শ স্থাপন করেন।

চন্দ্রকোণার মহান্ত মহারাজ ১৯০৫ সালের ১লা নভেম্বর মেদিনী-পুর শহরে সোয়ান সাহেবের হাতায় অনুষ্ঠিত একটি বিরাট জন-সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা দিতে অংশগ্রহণ করেন—কে, বি, দত্ত, রঘুনাথ দাস, ত্রৈলোক্য নাথ পাল, প্যারিলাল ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র মিত্র, পি, কে, বাসু, মহেন্দ্রনাথ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ শহরের গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ।

দিগম্বর নন্দ ও ক্ষুদিরামের কর্মকেন্দ্র

কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়ার জমিদার দিগম্বর নন্দ মহাশয় জেলার স্বদেশী আন্দোলনের একজন অগ্রণী নেতা রূপে গণ্য ছিলেন। তিনি স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের মুখপাত্র রূপে খ্যাত যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশে ১০০০ টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। বীর শহীদ ক্ষুদিরামের স্বদেশী প্রচারের একটি প্রধান কার্যকেন্দ্র ছিল দিগম্বরবাবুর বাড়ী। ভগবানপুর, খেজুরী ও পটাশপুর প্রভৃতি থানার স্বদেশী আন্দোলনে দিগম্বরবাবুর দৃষ্টান্ত ঐ অঞ্চলের বিত্তবান ব্যক্তিগণের অনুসরণ যোগ্য হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পটাশপুর থানার কর্মীগণ দিগম্বরবাবুকে তাঁদের থানার আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলে গণ্য করতেন। পটাশপুর থানার অমরশি নামক স্থানটি তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই থানার প্রতাপদীঘি, মঙ্গলামাড়ো, পাথর-ঘাট, পটাশপুর প্রভৃতি বড় বড় বাজারগুলিতে স্বদেশী আন্দোলনের ফল খুব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। হাজার হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী কাপড়, লবণ চিনি, কাঁচের চুড়ি প্রভৃতির স্থানে দেশী কাপড়, লবণ চিনি, ইত্যাদিতে ভরে গিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতি হাট-বারে এই সকল বৃহৎ হাট তাদের স্বদেশী গানে মাতিয়ে তুলত এবং 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'র জন্য তাদের আবেদন জানাত।

ভগবানপুর থানাতে স্বয়ং ক্ষুদিরাম ছিলেন অন্যতম প্রচারক এবং জমিদার 'নন্দ' পরিবার এখানকার স্বদেশীর দৃষ্টান্ত স্থল হওয়ায় সমগ্র থানাতে কয়েকটি প্রভাবশালী স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয়েছিল।

বহু নির্য্যাতিত দেশসেবক ধীরেন্দ্রনাথ দাস তাঁর লিখিত বিবরণে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। "স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইটা বেড়্যা বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। মুগবেড়্যা গ্রামের বিখ্যাত জমিদার দিগম্বর নন্দ ইটাবেড়্যা বাজারে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী লইয়া সমূহ বিলাতী লবণ খালের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং বাজারের বিলাতী কাপড়গুলিকে লইয়া বিরাট এক বহ্ন্যুৎসব পালন করিয়াছিলেন। একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইয়াছিল তাহাতে ক্ষীরোদ নারায়ণ ভূঞ্যা, শশীভূষণ বেরা, ক্ষীরোদ বিধু জানা, (পড়াচিংড়া), বামাচরণ দাস (তাঙ্গুড়িয়া), আশুতোষ দে (কিশোরপুর), ক্ষীরোদ চন্দ্র প্রধান (ভীমেশ্বরী) ও বৈকুণ্ঠনাথ দাস (ভীমেশ্বরী) বিশেষ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূপতি নগর গ্রামনিবাসী উৎসাহী যুবক রজনীকান্ত প্রধান উক্ত গ্রামে একটি আখড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম ঐ আখড়ায় গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবক যুবকগণকে লাঠিখেলা তরবারি খেলা, রিভলভার ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দান করিতেন। স্বেচ্ছাসেবক দল হাটে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং বিদেশী লবণ ও কাপড় ব্যবহার না করিতে এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে লোকেদের অনুপ্রাণিত করিতেন। কখনও কখনও বাজারের রেশমী চুড়ি প্রভৃতি ভাঙিয়া চুরমার করিতেন।"

কাঁথি মহকুমাতে স্বদেশী

হৃষিকেশ গায়েন লিখিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর থানা' পুস্তকে পাওয়া যায় যে "গোপিনাথপুর, বাঘাদাঁড়ি, কলাবেড়িয়া, বায়েন্দা প্রভৃতি স্থানে যে শাখা আখড়া কেন্দ্র স্থাপিত হয় তাহা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।"

খেজুরী থানার ঠাকুর নগব গ্রামের দোল মেলাতে স্বেচ্ছাসেবক গণের সহিত ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল ,এবং যার ফলে একটি ফৌজদারী মামলা হয় ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়—তার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে।

খেজুরী থানাতে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কাজ কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল সে বিবরণ আগে দেওয়া হয়েছে। "মেদিনীপুরের স্বাধীনতার গণ সংগ্রাম খেজুরী থানা" পুস্তক থেকে এই থানার আন্দোলন সম্বন্ধে আরও সামান্য কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল। (পৃঃ ৪) "কলাগেছিয়ার জমিদার গিরিশ চন্দ্র মাইতি মহাশয়ের পুত্র জগদীশ চন্দ্র মাইতি স্বদেশী আন্দোলনের একজন সুপরিচিত যুবনেতা ছিলেন। কাঁথি হাইস্কুলের সুখ্যাত মেধাবী ছাত্র ভাঙ্গনমারী গ্রামনিবাসী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় স্বদেশী আন্দোলনে প্রাণ মন দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। উত্তর কালে 'হিজলীর মসনদ-ই আলা' ও 'খেজুরী বন্দর' নামে দুইখানি গবেষণা মূলক ঐতিহাসিক পুস্তকের রচয়িতা হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক গান রচনা করেন। ঐ সময় তিনি "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" নামক একখানি স্বদেশী প্রচার মূলক কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইনি সরকার পরিচালিত স্কুলে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কবি ও সাহিত্যিক মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল খেজুরী থানার প্রথম স্নাতক ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস ও অন্যান্য অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভা সমিতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দ করণ (ভাঙ্গন মারি), কুঙর নারায়ণ মিদ্দা ও অমৃত লাল দত্ত (অজানবাড়ি), রাজেন্দ্রনাথ দীণ্ডা (দঃ কলাগেছিয়া), লাল মোহন সামন্ত প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।"

অজানবাড়ি, কলাগেছিয়া, অজয়া, হেঁড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলন প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। কাঁথি মহকুমার অন্যতম স্বদেশী নেতা মুগবেড়িয়ার জমিদার নন্দ পরিবারের দিগম্বর নন্দ মহাশয়ের অন্যতম বাসভবন ছিল এগরা থানার অন্তর্গত বলাগেড়িয়া গ্রামে। শহীদ ক্ষুদিরাম কেবল মুগবেড়িয়া নয় বলাগেড়িয়াতেও যাতায়াত করতেন এবং সেখানে দিগম্বর বাবুর সঙ্গে

যোগাযোগ রাখতেন। সেখানে তাঁর বাড়িতেও একটি আখড়া ছিল। ক্ষুদিরাম যুবকদিগকে লাঠি খেলা ও ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন। এগরা থানাতে (বাসুদেবপুর থানা উঠে যাওয়ায় এই থানার অধীন গ্রামগুলি এগরা থানার অন্তর্ভুক্ত হয়)। এরান্দার কালিচরণ মিশ্র, ভোলানাথ সাউ, উড়িজল করের দ্বারিকানাথ সাউ, বাসুদেবপুরের ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উৎসাহী যুবকগণ স্বদেশী ভলেন্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক) রূপে হাটে বাজারে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে স্বদেশী প্রচারে ব্রতী ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে বিলাতী চিনির পরিবর্তে দেশী চিনি, বিলাতী লবণ এর পরিবর্তে সৈন্ধব লবণ ও কর্কচ এবং দেশী তাঁতের কাপড়ের বহুল প্রচলন ঘটেছিল। এই থানার ভবানীচক গ্রামনিবাসী যুবক ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ দাস স্বদেশী পুস্তকাদি প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইনি উত্তরকালে একজন অসহযোগী আইনজীবী রূপে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এবং কারাবরণ ও জেলা হ'তে বহিষ্কার এবং অন্য প্রকার নির্যাতনও ভোগ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল।

কাঁথি মহকুমার পূর্ব্ব নাম ছিল নেগুঁয়া মহকুমা, নেগুঁয়া এগরা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। 'বন্দেমাতরম্' এর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নেগুঁয়া মহকুমার শাসক হয়ে আসেন এবং পরে কাঁথি মহকুমার শাসক হন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার অন্যতম পীঠস্থান রূপে নেগুঁয়া (এগরা) ও কাঁথি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এইরূপ একটি স্থানে স্বদেশীর অঙ্কুর যে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

ক্ষুদিরাম ও এগরা মেলার ঘটনা

স্বদেশীর সময় ক্ষুদিরামকে অবলম্বন করে এগরাতে একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। এগরা থানার হঠনাগর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে একটি বিরাট মেলা বসে। স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতি বৎসর সেবা কার্য্যের জন্য মেলায় যেত। ঘটনার

বৎসরে (১৯০৮) একজন স্বেচ্ছাসেবক মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণসাগর পুষ্করিণীতে নেমে ছিল—ঐ পুষ্করিণীতে স্নান বন্ধ করা হয়েছিল। সিপাহী সেই অল্প বয়স্ক সেবককে টেনে নিয়ে এসে লাঠির দ্বারা প্রহার করেন। এই দৃশ্য দেখা মাত্র ক্ষুদিরাম ঝাঁপিয়ে পড়ে সিপাহীর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে সিপাহীকে প্রহার করেন। যুবক ক্ষুদিরামের তেজস্বিতায় ও সাহসিকতায় চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে যায়। সিপাহীদের পক্ষ থেকে মন্দিরে প্রবেশের জন্য কিছু কিছু উৎকোচ গ্রহণ চলছিল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ উৎকোচ গ্রহণের হাত থেকে দর্শনার্থী-দিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। এই ঘটনার পর সিপাহীরা তাদের "লাল টুপি" ও "কালো কোর্ত্তা" সত্ত্বেও হীনবল হয়ে গেল।

ঐ থানার অন্তর্গত অস্তিচকের জমিদার মণ্ডলদের এবং পাঁচ রোলের জমিদার মহাপাত্রদের বাড়িতে ক্ষুদিরামের যাতায়াত ও আখড়া চালানোর কথা শোনা যায়।

কাঁথি মহকুমার অন্যতম থানা রামনগরেও স্বদেশী প্রচারের কাজ খুবই উৎসাহের সঙ্গে চলেছিল। থানার দক্ষিণ অংশ বঙ্গোপসাগরের লবণ জল বিধৌত। খুব সহজেই এখানে লবণ উৎপন্ন হ'ত। বৃটিশের ব্যবসাকে বাঁচাবার জন্য লবণ তৈয়ারী বন্ধের আইন করা হয়েছিল। স্বদেশীর সময় এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচার লোকের চোখ খুলে দিয়েছিল। ইংরেজ কত প্রকারে তার শোষণ যন্ত্র প্রসারিত করেছে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মানুষকে ইংরাজ-বিদ্বেষী ও স্বদেশীর অনুরাগী করে তুলেছিল। অন্যান্য স্থানের ন্যায় উৎসাহ সহকারে রামনগরবাসী যুবক ও ছাত্রগণ থানার হাটে বাজারে স্বদেশী প্রচারে রত থাকত। দেপাল, দেউলী, মীরগোদাগঞ্জ প্রভৃতি বৃহৎ হাটগুলিতে অনেকবার স্বদেশী সভার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। এই থানায় কালিন্দী, বালিসাই, দেউলীহাট প্রভৃতি কেন্দ্রে স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী বর্জন খুব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এই থানাতে শাসমল মহাশয়ের জমিদারী থাকায় বীরেন্দ্রনাথ তাঁদের পরিবারের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত গ্রাম-গুলিতে মাঝে মাঝে গিয়ে স্বদেশী প্রচারের কাজ করতেন। কৈলাশচন্দ্র

মাইতি, যদুনাথ শাসমল, বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত দেউলী হাটের জনসভায় যোগদান ক'রে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। বাদলপুর গ্রামনিবাসী কাশীনাথ মাইতি মহাশয় এই সময় মুখবেড়িয়ার নন্দ বাড়িতে বাস ক'রে কবিরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ঐ সময় শহীদ ক্ষুদিরাম দিগম্বর নন্দ মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করতেন। কাশীনাথ বাবুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি ক্ষুদিরামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থানার মধ্যে স্বদেশী প্রচারে এবং লাঠি খেলার আখড়া স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী হন। কাঁথির উকিল সম্প্রদায় কাঁথি শহরে স্বদেশী সভাগুলিতে নেতৃত্ব করতেন। কাঁথির প্রথম স্বদেশী সভায় কাঁথির বর্ষীয়ান উকিল উপেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার সভাপতিত্ব করেছিলেন, অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান উকিল মাণিকচন্দ্র ভড় একটি বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। উহাতে বিদেশী বর্জন ও জাতীয় একতা সংরক্ষণের প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়। কাঁথির বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক উকিল নগেন্দ্রচন্দ্র বক্সী, আইনজীবী সুবক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুভূষণ গিরি, গণেশচন্দ্র ভলা, সুরেশচন্দ্র মাইতি প্রভৃতি সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। যুবকগণের শরীর চর্চার জন্য কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদি শিক্ষার আখড়া স্থাপন ইহাদের একটি বিশেষ কাজ ছিল। কাঁথির 'বন্দেমাতরম' গ্রাউণ্ড যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। চরিত্র গঠনের জন্য সৎ পুস্তক প্রচার, উপযুক্ত বক্তাগণের দ্বারা সভাদি অনুষ্ঠান, সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে স্বদেশী সংগীতের ব্যবস্থাদির প্রতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। এঁদের চেষ্টায় কাঁথি বাজারে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি 'ছাত্র ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাঁথি মহকুমার একমাত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'নীহারে'র সহায়তায় স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পাঁচেট, খণ্ডরুই, পাঁচরোল, কাজলাগড়, প্রভৃতি গ্রাম সুপরিচিত স্বদেশী কেন্দ্র ছিল। কাঁথি থানার বহু স্থানে সভানুষ্ঠান ক'রে স্বদেশী

প্রচারের কাজ করা হত। মাজনা, বালিয়া, চণ্ডীভেটি, কাজলা, চূণকলি, বাহিরি, বসন্তিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার কার্য্য জোরের সঙ্গে চলেছিল। বনমালী চাট্টা স্বদেশীর একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

জেলার মুখপাত্র হিসাবে মেদিনীপুর শহর 'বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে' বিশাল ও ব্যাপক প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল তার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মহকুমা ও থানা থেকে যাঁরা মামলা মোকদ্দমা, স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ, ব্যবসায়াদি এবং প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে শহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যাতায়াত করতেন স্বদেশী আন্দোলনের বৈদ্যুতিক স্পর্শে তাঁরা উদ্দীপ্ত না হয়ে পারতেন না।

সদর মহকুমাতে স্বদেশী

মেদিনীপুর সদর মহকুমার নারায়ণগড়, সবং, ডেবরা, কেশপুর প্রভৃতি থানাতে স্বদেশীর উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছিল।

নারায়ণ গড় থানাতে স্বদেশী আন্দোলন খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। নাড়মার সুপরিচিত সমাজসেবী কিশোরী মোহন অধিকারী ও পুলিন বিহারী রায় এই আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। নাড়মার বৈকুণ্ঠনাথ রায়, যাদব চন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র অধিকারী, মদনমোহন চকের বৈকুণ্ঠ নাথ সী ও হরিদাস দাস প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং হরিচরণ চৌধুরী, পুলিন বিহারী রায়, প্রমুখ ছাত্রগণ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য হাটে বাজারে প্রবল ভাবে প্রচার ও পিকেটিং চালাতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে কতিপয় অত্যুৎসাহী যুবক সতীর হাটে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে আগুন দিয়ে তাদের সমস্ত বিলাতী বস্ত্র পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ পিকেটার দিগকে আসামী শ্রেণীভুক্ত ক'রে একটি মামলা রুজু করে। মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার কে, বি. দত্ত আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। কিছুদিন মামলা চলবার পর আসামীগণ বিচারে বেকসুর খালাস পান।

গ্রামাঞ্চলে বিদেশীবস্ত্র বর্জন আন্দোলন এরূপ গভীর ভাবে সাধারণের মনকে আলোড়িত করে যে বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেদের বিলাতী বস্ত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলে। বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য বিলাতী দ্রব্যের ব্যবসায়ের ফলস্বরূপ দেশের যে অর্থনৈতিক শোষণ চলেছে তা প্রচারের ফলে তরুণ সম্প্রদায়ের মন একান্ত বৃটিশ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র দাস কানুনগো নারায়ণগড় থানার অধিবাসী ছিলেন—তাঁদের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি তরুণগণকে আকৃষ্ট করবার একটি প্রধান উপাদান ছিল এই বৃটিশ বিদ্বেষ।

ডেবরা থানাতে স্বদেশী আন্দোলনে অনেক ছাত্র ও যুবক প্রবল উৎসাহের সঙ্গে যোগদান ক'রে সমগ্র থানাতে একটি গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। বালিচকে কুঞ্জবিহারী রায় মহাশয়ের পরিচালিত আখড়া এবং বিপিন বিহারী ঘোষ, বঙ্কিম বিহারী ঘোষ, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কর্মীগণ পরিচালিত আখড়া বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এইসব আখড়াতে চরকায় সুতো কাটা, ব্যায়াম, কুস্তি ইত্যাদি শিখান হত। আখড়াগুলিতে সংবাদপত্র পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। কাঁটাসালের আখড়াটি শরীর চর্চায় অগ্রগণ্য ছিল। এই থানাতে আন্দোলন অতীব ব্যাপক ছিল এবং বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল।

সবং থানার কর্মীমণ্ডলীর প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই থানাতে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। স্বেচ্ছাসেবকদল স্থানীয় প্রতিটি বাজারে গিয়ে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই,' 'ফেলে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরোনা' ইত্যাদি গানে চতুর্দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলত ও বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চালাত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী বস্ত্রগুলি পোড়ান হোত। নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ সভাতে বক্তৃতা দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে

জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। শশী ভূষণ দাস (খেজুরী), বানেশ্বর চক্রবর্ত্তী (রুইনান), জগন্নাথ খাটুয়া ও কৃষ্ণদাস মণ্ডল (মহার), জীবন কৃষ্ণ মাইতি ও হৃষিকেশ কুলভী (শীতলদা), পুলিন বিহারী বাঁকুড়া (কুড়াল), ঈশ্বর চন্দ্র মাইতি (তিলন্তপাড়া), সর্বেশ্বর সামন্ত (বেস্কী), ভুবন মোহন মাইতি (লক্ষ্যা),—প্রমুখ ব্যক্তিগণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শশীভূষণ দাস এই সময় কলিকাতাতে অধ্যয়নরত ছিলেন। তিনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কটকের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার মধুসূদন দাস মহাশয়গণের প্রেরণায় চামড়া শিল্প শিক্ষা করেন ও কলিকাতাতে একটি স্বদেশী জুতার দোকান প্রতিষ্ঠা করেন।

গড়বেতা থানার সহিত ঘাটাল মহকুমার কেঁচকাপুর প্রভৃতি স্থানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, উভয় থানার সিংহ পরিবার নিকট আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই দুই পরিবারের যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিগণ পরস্পরকে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন এবং যাতে স্বদেশী প্রচারে কেহ পশ্চাৎ পদ না থাকেন সেই জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ (কেঁচকাপুর, ঘাটাল), রাম সুন্দর সিংহ (গড়বেতা প্রভৃতি যুবকগণ কলিকাতার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন। নাগেশ্বরবাবুর নেতৃত্বে ও আন্তরিক চেষ্টার ফলে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটালে আগমন করেছিলেন।

গড়বেতার ফকির চন্দ্র কুণ্ডু, রাধানাথ কুণ্ডু প্রমুখ যুবকগণ বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও দোকানে দোকানে প্রচার কার্য্যের দ্বারা আন্দোলনের মূল দৃঢ় করেছিলেন। গড়বেতা কর্মীগণের প্রচেষ্টায় পণ্ডিত মোক্ষদা চরণ সামধ্যায়ী মহাশয় ঐ থানাতে প্রচার কার্য্যের দ্বারা আন্দোলনকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

নিকটবর্ত্তী শালবনী ও কেশপুর থানাতেও স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ প্রভাবের সৃষ্টি করেছিল। হাটে বাজারে বিলাতী বস্ত্রের

ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কেশপুর থানার কোয়াই ও আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানগুলি আন্দোলনে মেতে উঠেছিল।

দাঁতন থানাতে বহু যুবক স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভূক্ত হয়ে মাথায় পাগড়ী ও হাতে লাঠি নিয়ে গ্রামে গ্রামে হাটে-বাজারে স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়াত। গানগুলির আকর্ষণ গ্রামবাসীদের স্বদেশী গ্রহণে প্রেরণা যোগাত। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন আঙ্গুয়ার কৈলাস চন্দ্র দাস মহাপাত্র। নিমপুর গ্রামের মহেন্দ্র মহাপাত্র ; রাজেন্দ্র মহাপাত্র, শীতল মহা-পাত্র ও দেবেন্দ্রনাথ নায়ক এবং বাহাবদা গ্রামের কৃষ্ণপ্রসাদ নায়ক ও অদ্বৈত দাস অধিকারী, সোনাচকানিয়ার ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ বেরা ও সাউরী গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ বাগ প্রমুখ কর্মীগণ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে স্বদেশী প্রচারে রত ছিলেন।

ঝাড়গ্রাম ও তমলুক মহকুমাতে স্বদেশী আন্দোলন

আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম মহকুমা (স্বদেশী আন্দোলনের সময় গঠিত হয়নি—উহার অংশগুলি অন্য মহকুমার সহিত যুক্ত ছিল) স্বদেশী গ্রহণে জেলার কোন অংশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। 'খানকার সরল আড়ম্বরহীন জীবন স্বদেশী গ্রহণের পক্ষে খুবই অনুকুল ছিল। এই অঞ্চলের আদিবাসী নরনারীগণ বহুকাল যাবৎ তাঁতে প্রস্তুত মোটা কাপড় এবং বনজ দ্রব্যে রঞ্জিত পাড় ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল।

মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে তমলুক মহকুমার একটি অগ্রগণ্য স্থান আছে।

বঙ্গভঙ্গ রোধ এবং স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলনে তমলুক মহকুমার নেতা ও কর্মীগণ সমগ্র মহকুমাতে স্বদেশীর একটি প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টাতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ

এই মহকুমার থানাগুলিতে এসে তাঁদের বক্তৃতার দ্বারা প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন।

তমলুকের প্রবীন জনসেবক রমেশচন্দ্র কর জানিয়েছেন—তমলুকের প্রথম প্রকাশ্য সভা হয় ব্রহ্মাবারোয়ারী মাঠে ১৯০৫ সালে। রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক কালিপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ "হাওড়া হিতৈষী" সম্পাদক গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও মৌলভী লিয়াকৎ আলী খাঁন। বিলাতী কাপড়, কাঁচের চুড়ি, ও অন্যান্য বিলাতী দ্রব্য স্তূপাকারে সাজিয়ে কাব্য বিশারদ মহাশয় তাতে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। সভায় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হল। বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর লোক স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

সমগ্র শহর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হত দিনের পর দিন। স্বদেশী সংগীতে প্রাণ নেচে উঠত। তখনকার গানগুলি ছিল—

"বল ভাই বঙ্গবাসী বদন ভরে বন্দেমাতরম্
আমরা চারকোটি ভাই, চারকোটি বোন
কেউ কি মোদের কম ?
বুটের টক্কর আর কেন খাও
চাকুরীতে ইস্তফা দাও
এই চলে যেন স্বদেশী ঢেউর বমারম
বন্দেমাতরম্"

"দিনের দিন সবে দীন
ভারত হয়ে পরাধীন,
তুঙ্গ দ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
শস্য নাশি ছিল যাহা দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভূষি শেষে
দিনের দিন সবে দীন মোরা সবে পরাধীন
হায়রে রাজা কি কঠিন"

"মা বলে টানবো ঘানি, কারাগার স্বর্গমানি
বিশ্বেশ্বরের কাশীর আদর, হিমাচলে মা ভবরানী
শিবের কৈলাশ পেলে প্রকরনী
জগন্নাথের বৈতবণী"

তমলুকেব 'রক্ষিত বাড়ী' স্বদেশীর একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বক্ষিত (ভীমবাবু) স্থানীয় স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি অনারারী ম্যাজিষ্টেট ও তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। রেশম ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি খুবই সুপবিচিত ছিলেন।

রক্ষিত বাড়ীতে যে আখড়া ছিল তাতে লাঠিখেলা, কুস্তি ইত্যাদি খুব ভালভাবে শেখান হত। শিক্ষক হিসাবে এখানে অভিজ্ঞ বাহিরের লোক আনা হত। শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক ছাত্র ও যুবক এই আখড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তমলুকের সর্বজনমান্য উকিল মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও ক্ষীরোদনাথ সিংহ (শাস্ত্রী) স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। মহেন্দ্র বাবু স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগদান ক'রে ও কারাবরণ ক'রে তমলুকের নেতার স্থান অধিকাব করেছিলেন। ক্ষীবোদ বাবুব বাড়ী ছিল বীরসিংহ গ্রামে। তিনি প্রাতঃ স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে শাল ও লাঠি উপহার পেয়েছিলেন।

বিলাতী দ্রব্য বিক্রেতাদেব দোকানে স্বেচ্ছাসেবকেরা পিকেটিং চালাত। সেই সময়কার এস, ডি, ও, রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করতে ও অন্যপ্রকারে নির্যাতিত করতে খুবই তৎপর ছিলেন। পুলিশের প্ররোচনায় তখন অনেক নিরীহ লোকের বাড়ী খানা তল্লাসীর হুকুম দেওয়া হত। যখন একদিন এঁর বদলীর হুকুম এল লোকে জড় হয়ে নদীর ঘাটে তাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়াল।

এরপর এস, ডি, ও, হয়ে এলেন যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি জনসাধারণের সঙ্গে মিশে সালিশীর বিচার মীমাংসার প্রতি খুব

সহানুভূতি দেখালেন। গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের নিয়ে সালিসী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল এবং ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলি ব্যতীত অন্যান্য মোকদ্দমা সালিসী বিচারে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে লাগল। লোকদের মধ্যে প্রচুর আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হল।

চারিদিকে বন্দেমাতরমের ধূম পড়ে গেল। দোকান, ঘরবাড়ী, বিদ্যালয়, মন্দির সর্ব্বত্র উজ্জ্বল আকারে লেখা 'বন্দেমাতরম্' শোভা পেতে লাগল। গানের বন্যা বয়ে যেতে লাগল—

"মাগো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ বলে
(আমার) যায় যেন জীবন চলে"

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত স্বদেশী পত্রিকাগুলির খুব আদর ছিল। শহরে ও গ্রামে হাটে বাজারে মিলিত হয়ে লোকে এই পত্রিকাগুলি পাওয়া মাত্র অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করত ও লোককে শোনাত।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত তমলুক থেকে 'তমালিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হত। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীধরচন্দ্র ভক্তিরত্ন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে স্বদেশী সম্পর্কীয় সংবাদাদি এই পত্রিকার মধ্যে মহকুমাতে প্রচাবিত হত এবং লোকের মনেও জেগে উঠত প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

শ্রীগোপীনন্দন গোস্বামী তাঁর 'বাংলার হলদিঘাট তমলুক' পুস্তকে লিখেছেন (পৃঃ ৬) "১৯০৯ এ এই তমলুক মহকুমার দুইটি জায়গায় সেইদিন বিরাট জনসভা হয়েছিল। একটি হয়েছিল মহিষাদলে হরিখালি বাজারে—আর অপরটি হয়েছিল ব্যবর্ত্তার হাটে। মহিষাদলের জমিদার বসন্তকুমার মণ্ডল হরিখালিতে জায়গা দিয়ে ছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সেই দিনের সভায় কালিদাস ব্যবর্ত্তা ছিলেন সভাপতি। প্রধান বক্তা ছিলেন কলিকাতার

ভারতী পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ও হাওড়া হিতৈষী পত্রিকার সম্পাদক গীস্পতি কাব্যতীর্থ।

ব্যবর্তার হাটে যে সভা হয় সেটি ছিল আরও বড় ও ব্যাপক। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নাড়াদাঁড়িব স্বর্গত বিহারী কুণ্ডু এবং পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন ব্যবর্তার স্বর্গত শ্রীপতি ও রমাপতি ভট্টাচার্য্য। সভার পূর্ব দিন তমলুকের রক্ষিত বাড়ীতে এইজন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক আলোচনা সভা বসে। অনুষ্ঠানের দিন শোভাযাত্রা সহকারে তমলুক থেকে কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, গীস্পতি কাব্যতীর্থ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভায় আসেন। প্রারম্ভে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি গীত হয়। এই গানটি গেয়েছিলেন শ্রীপতি ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র, তৎকালীন হ্যামিলটন হাইস্কুলের ছাত্র পরবর্ত্তী কালের প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

ময়না থানার গণেশচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ জানা, ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস, ইত্যাদির সহযোগিতায় গীস্পতি কাব্যতীর্থ ও আবু হোসেন ময়নাতেও একটি সভা করেছিলেন। সেখানেও বিলাতী বস্ত্র, কাঁচের চুড়ি ও অন্যান্য বিলাতী দ্রব্যের বহ্ন্যুৎসব হয় ও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ গান গেয়ে, মাথায় পাগড়ী ও হাতে লাঠী নিয়ে হাটে বাজারে বিলাতী কাপড়, কাঁচের চুড়ি, বিলাতী লবণ ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য প্রচার করতেন।

সচ্চিদানন্দের দুই পুত্র জ্ঞানানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দের চেষ্টায় একটি স্বদেশী ভাণ্ডার যৌথ মুলধনে হাটের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ময়না, আসনান, পরমানন্দপুর, পূর্বদক্ষিণ ময়না প্রভৃতি গ্রামে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গিয়েছিল।

তমলুক মহিষাদল এবং পাঁশকুড়া থানাতেও বন্দেমাতরমের রোল উঠত। তার ফলে নির্জীব পল্লী শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গের দিনটি 'রাখীবন্ধন' ও 'অরন্ধন' অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্যাপকভাবে পালন করা হত। প্রথমে শাসকবর্গ এই আন্দোলনকে সাময়িক হুজুগ মনে করে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন কিন্তু আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান গতিবেগ

লক্ষ্য ক'রে তারা শঙ্কিত হলেন। অবশেষে লাঠি চার্জ, খানাতল্লাসী, ধরপাকড় ইত্যাদি দমনমূলক কার্য আরম্ভ হল। ফলে আন্দোলন আসল পথ ছেড়ে গোপন পথ ধরে চলল।

নন্দীগ্রাম থানাতে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বহু যুবক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। ভেকুটিয়া গ্রামের রাজেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া ও সামসাবাদ গ্রামের ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাময়িকভাবে পড়াশুনা ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন।

১৯০৮ সালে স্বদেশী প্রচার কার্যে সুখ্যাত বক্তা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় এই থানায় এসে হরিখালি গঞ্জে কালিদাস বাবর্ত্তার সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা দেন। শ্রোতাগণ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করে। মহিষাদল রাজ-হাইস্কুলের দুটি কৃতি ছাত্রের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু ছাত্র এদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে আন্দোলনের কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

স্বদেশসেবক উমেশচন্দ্র বলের চেষ্টায় গোদাইমলবাড়ের কালী মন্দির প্রাঙ্গণে এক জনসভা হয়। সেই সভাতে সারদাচরণ মাইতি (পরে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার রূপে খ্যাত) বক্তৃতা করেন। তিনি বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ ব্যবহার না করার উপর বিশেষ জোর দেন।

নন্দীগ্রাম থানার কুলুপ, ধান্যশ্রী, কাশীমপুর, রাজারামপুর, কদমতলা, খড়িগেড়িয়া, নন্দপুর, নলগ্রাম, চাকনান, ওসমানপুর, হাঁসচড়া, কৃষ্ণনগর, শীমুলকুণ্ড, পুরুষোত্তমপুর, বিনন্দপুর, গদাইবলবাড, ধান্যখোলা প্রভৃতি গ্রামের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

সুতাহাটা থানাতেও প্রভুত উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর হাটে বাজারে দোকান পাট

বন্ধ রেখে হরতাল পালন করা হয়েছিল, এবং ব্যাপকভাবে রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই থানার বিভিন্ন স্থানে কালিপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ও গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। এইসব সভাতে বহু জনসমাগম হয়েছিল। হরিবল্লভপুর, কাশীপুর, বরদা প্রভৃতি গ্রামের সভাগুলি উল্লেখযোগ্য। হরিবল্লভপুরের বামাচরণ দাস, তাজপুরের অন্নদা প্রসাদ দেব (দাস), আমলাটের প্রমথনাথ অধিকারী, দ্বারিবেড়িয়ার সতীশচন্দ্র মাইতি, দেভোগের ভগবতী চরণ প্রধান প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্বদেশী প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করেছিলেন। অনেকে চামড়ার জুতা ছেড়ে ক্যাম্বিসের জুতা পরতে আরম্ভ করেন। কতকগুলি শিল্পমেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক সংগীত গাওয়া হত। একটি জনপ্রিয় গান ছিল—

"ভাই সব দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে আসছে মাল
বিদেশ হতে
আমাদের বেচা কেনা, পাওনা দেনা, অভাব মোচন
সব বিলেতী"

বিদেশী কাপড় বয়কট ক'রে স্বদেশী মিলের কাপড়ের এবং তাঁত জাত কাপড়ের দোকান হল। এই সময় দ্বারিবেড়িয়া গ্রামের সতীশ চন্দ্র মাইতি ও চৈতন্যপুরের ভগবতী চরণ মাইতি নিজ নিজ গ্রামে স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খোলেন।

তমলুক মহকুমার লবণ সত্যাগ্রহ সময়কার অন্যতম ডিক্টেটার কারাবরণকারী মহিলানেত্রী পাঁশকুড়া থানার শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য মহাশয়া (৯৩) তাঁর আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্যে লিখেছেন ঃ—

"আমাদের বাড়ীতে স্বদেশী যুগের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করেছিল অনেক দিন আগে থেকে। বোধহয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে। বিলেতী কাপড় বাদ দিয়ে দেশী মিলের কাপড় কিনে

আনতেন আমার স্বামী। তার দাম ছিল বেশী কিন্তু তার পাড় ছিল সরু, পাড়ের রংয়ের বাহার ছিল। আবার পাড়ের রং উঠে যেত একটা কাচা পেলেই। বাড়ীতে করকচ নুন খাওয়া চলছিল। এমনকি গুঁড়া নুন বিদেশী নুন বলে জানতাম। তার বদলে করকচ নুন এনে শিলে গুঁড়া করে খাওয়া হত। বিলেতী জিনিস যে বর্জনীয় এ সংস্কার এসেছিল অনেক আগে থেকেই। বাড়ীতে আসত সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'। হিতবাদীর সম্পাদকীয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ স্বদেশী ভাবে পরিপূর্ণ ছিল।"

মহিষাদলের বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা নীলমনি হাজরা মহাশয় লিখেছেন—"স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের অঞ্চলে স্বদেশী নেতা ছিলেন—সারদা বাগ ও সারদানন্দ রায়। স্বদেশী ব্যবহার ও বিদেশী বর্জনের জন্য শোভা যাত্রা ক'রে প্রচার কার্য চালানো হত। ১৯০৬ সালে হরিখালিতে একটি খুব বড় মিটিং হয়েছিল। স্থানীয় জমিদার বসন্তকুমার মণ্ডল এই মিটিংএর ব্যবস্থা করেছিলেন। কলিকাতা থেকে বক্তা এসেছিলেন —কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ও গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। তখন তমলুকে প্রকাশিত পত্রিকা ছিল 'তমালিকা'। এই সময়ের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বরাবর বজায় ছিল।

জেলাব্যাপী স্বদেশীর উদ্দীপনা

মেদিনীপুরের জনগণের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার একটি দৃঢ় ও বহু ব্যাপক সংগ্রামী মনোভাব বহুকাল ধরে চলে আসতে দেখা যায়।

বাঙ্গালীর ভাষা ও বাসভূমি অবলম্বন ক'রে তাদের মধ্যে যে ঐক্য ও অখণ্ডতার আবেগ রয়েছে যা দেশাত্মবোধের চেতনাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলত তা নষ্ট করার সঙ্কল্প নিয়ে বৃটিশ কূটনীতিকগণের মুখপাত্র স্বরূপ লর্ড কার্জন যখন বঙ্গদেশের জন্য একটি কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন এবং সাতকোটি বাঙ্গালীর সম্মিলিত

প্রতিবাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বঙ্গদেশকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করার পরিকল্পনাকে আইনসিদ্ধ রূপ দেবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলেন তখন বাঙ্গালী তার নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেনি। বঙ্গবিভাগের দিন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন) একটি ভাবের প্লাবনে সমস্ত দেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। তখন দেখা যায় মেদিনীপুরবাসীর অন্তরেও সেই ভাবগঙ্গার জোয়ার এসে সমগ্র জেলাকে প্লাবিত করছে।

জনগণের মধ্যে এক নবচেতনা ও নবশক্তির উদ্বোধন হল—মন প্রাণ মেতে উঠল; জন্মভূমিরূপিনী মাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা আরম্ভ হয়ে গেল নগরে, শহরে, গ্রামে, প্রান্তরে মায়ের বন্দনাগীতি 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির আকাশভেদী অনুরণনে। স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জন হয়ে উঠলো এক সাধনার বস্তু। একদিকে বয়কট, বিলাতী লবণ, চিনি, কাপড় বর্জন—কখনও বা বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব—অপর দিকে স্বদেশী কাপড় তা যতই মোটা, চাকচিক্যহীন হোক না কেন—তা পরা ভদ্রতার অঙ্গ ক'রে তোলা; সৈন্ধব ও করকচ লবণ, গুড় বা গুঁড়া চিনি ছাড়া খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত না করা, মেয়েদের মধ্যে বিলাতী চুড়ি ও প্রসাধন দ্রব্য বর্জন—হয়ে উঠল সকল শ্রেণীর নরনারীর ধ্যান-জ্ঞানের বস্তু। স্বদেশী দ্রব্যের ভাণ্ডার খোলা হতে লাগল ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হতে লাগল। দোকানে দোকানে বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং চলল স্বদেশী ভলেন্টিয়ারদলের দ্বারা—তারা মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে দেশী কাপড় ও দেশী কাপড়ের তৈয়ারী জামা পরে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায়, প্রেরণা দেয় সকলকে বিলাতী পরিহার ক'রে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য, তাদের গলায় গলায় স্বদেশী গান—দেশকে 'মা' বলে ডাকবার ও দেশরূপিনী মাকে 'দানবে'র হাত হতে রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ব্যাপক হয়ে উঠল। কত ছাত্র, যুবক সব কাজ ফেলে—এমনকি পড়াশুনা ছেড়ে—হয়ে উঠল 'স্বদেশী' স্বেচ্ছাসেবক—মাতৃরূপিনী দেশের সেবক।

ঋষি বঙ্কিম তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে যে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের অপূর্ব রূপ দেখেছিলেন, যে মন্ত্রের ধ্যান করতে করতে তাঁর আনন্দমঠের সন্তানদল মাকে জ্ঞান, বিদ্যা, শক্তি, ইত্যাদি সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করাব দুর্বার সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিল—সেই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র স্বদেশী আন্দোলনের বেগ ও শক্তিকে কেবল বঙ্গের সকল প্রান্ত নয় সমগ্র ভারতের দিকে দিকে নবচেতনার সঞ্চাব করল—এক অভূতপূর্ব জাগরণে সমগ্র ভারত উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ভারতের সন্তান ভয়-ভীতির দুঃস্বপ্ন ত্যাগ ক'রে শির উন্নত ক'রে দাঁড়াল— সকলপ্রকার শোষণ, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ এর পূর্ব্বে কখনও এত ব্যাপক ও গভীর আকার ধারণ করেনি। বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত মরণজয়ী যুবকের প্রাণেও স্বদেশী আন্দোলনের জাগরণ অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

স্বদেশীর পরবর্তী কালে মেদিনীপুর জেলাতে সহিংস ও অহিংস এই উভয় ধারার আন্দোলনের যে অভূতপূর্ব সাফল্য প্রকাশ পেয়েছিল তার মূলে স্বদেশী আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য।

মেদিনীপুর জেলার কতিপয় যুবক স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই নানা কারণে বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও বিপ্লবের কর্মধারা অবলম্বন করেছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি নেতাগণের সাহায্যে ও নেতৃত্বে মেদিনীপুরের বিপ্লব সমিতি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল (১৯০২ খৃষ্টাব্দে), তথাপি স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল স্রোত (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ায় বিপ্লব সমিতির কর্মীদল তাঁদের কার্যসূচীকে দৃঢ়তর ও ব্যাপকতর করার প্রভূত সুযোগ লাভ করেছিলেন।

শরীর ও মনের উন্নতি সাধন, স্বদেশকে মাতৃরূপে উপাসনা করা পরম ধর্ম হিসাবে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের প্রচেষ্টা স্বদেশী-কর্মী ও সহিংস বিপ্লবী কর্মীর সাধারণ কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; কিন্তু বিপ্লবী কর্মীরা স্বগোষ্ঠীর সহিত কার্যরত অবস্থায় গভীরতর চিন্তা ও উদ্দীপনার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিতেন। সেই

জন্য তাঁদের সংকল্প ছিল—**"বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চল রে।"

মেদিনীপুব জেলার মাটি ধন্য যে, তাঁর সন্তানেরা স্বদেশী আন্দোলনে এমন মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে দেশে এক নূতন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের ফল—গান্ধীজীর উক্তি

এই প্রসঙ্গে আমরা জাতির জনক গান্ধীজীর উক্তি স্মরণ করি। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী লিখেছেন—

"বঙ্গভঙ্গের পরেই ভারতে প্রকৃত জাগরণ ঘটিয়াছে। ····· এই বঙ্গ বিভাগই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভাগের কারণ হইবে।" তিনি আরও লিখেছেন—"বঙ্গভঙ্গের দাবী প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্বশাসনের (Home Rule) দাবী। এ পর্য্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের অসন্তোষ বা ক্ষোভের কোন কারণ ঘটিলে রাজার দরবারে প্রতিকারের প্রার্থনা করিব। প্রতিকার না পাইলে আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, অথবা আমরা আবেদন করিব। বঙ্গভঙ্গের পর লোকে বুঝিয়াছে যে, আবেদন সফল করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে শক্তির, বলপ্রয়োগের এবং কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার নিদর্শন থাকা চাই।"

এই যে নূতন ভাবের ও মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়েছিল, গান্ধীজীর মতে তার বৈশিষ্ট্য ছিল, ইংরাজের কারাদণ্ড—ভয়ের বিলোপ এবং স্বদেশী আন্দোলন। "এই নূতন মনোবলের (spirit) পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সংবাদপত্রের নির্ভীক মতামত প্রকাশে। পূর্বে যাহা ভয়ে ভয়ে গোপনে বলা হইত তাহা এখন প্রকাশ্যে বলা এবং লেখা হইতেছে। আগে যুবা, বৃদ্ধসকলেই সাহেব দেখিলে পলায়ন করিত—এখন আর কেহ সাহেব দেখিলে তোয়াক্কা রাখে না। এখন লোকে গোলোযোগের সৃষ্টি করিতে বা জেলে যাইতে কিছুমাত্র ভয় পায় না। আবেদন, নিবেদন আর নূতন মনোবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ বেশ গুরুতর। এই মনোবৃত্তি বঙ্গদেশে প্রথম আত্ম প্রকাশ করে, কিন্তু এখন পাঞ্জাব হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"*

---

* বাংলাদেশের ইতিহাস আধুনিক যুগ (মুক্তিসংগ্রাম . ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার—পৃষ্ঠা ৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

মেদিনীপুরে বিপ্লব আন্দোলন

প্রথম পর্য্যায়

বঙ্গে নবচেতনা

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতের পক্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পক্ষে এক নবচেতনা উন্মেষেব কাল। যুগ-প্রবর্তক রামমোহন রায় ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছিলেন। রাজনীতিও তাঁর প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর পরে যেসকল শক্তিমান পুরুষ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মনস্বিতা দেশকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছিল।

এই সময় বিভিন্ন সমিতি ও সংঘের সৃষ্টি হয়েছিল যা দেশের নানা সমস্যাকে অবলম্বন ক'বে সম্মিলিত চিন্তা ও কর্মের সূচনা করেছিল এবং যুবসমাজের সেই সময়কার প্রতিভাধর পুরুষদের প্রভাব বিভিন্ন প্রকার আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

রাজনারায়ণ বসুর অবদান

মেদিনীপুর সেই সময় এক মনস্বী ব্যক্তির কার্যক্ষেত্র হয়ে ওঠে। হিন্দু কলেজের অন্যতম খ্যাতিমান ছাত্র রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলেব প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন ১৮৫১ সালে। তাঁর কার্যকাল মাত্র পনের বৎসর ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য তাঁর শ্রম ও চিন্তা নিয়োগ করেছিলেন—তাঁর চেষ্টায় ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—"জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা" এই সভার কার্যবিবরণীকে অবলম্বন ক'রে তিনি "A Prospectus for the Promotion of National feeling among the Educated natives of Bengal" রচনা করেন। হিন্দু-

মেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র এই অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) অবলম্বনে ১৮৬৭ সালে কলিকাতাতে হিন্দুমেলা বা জাতীয়মেলা স্থাপন করেন। হিন্দুমেলার সহিত বরাবরই রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। স্বাদেশিকতার পরিচয় এই সমিতিগুলির কার্যের মধ্যে জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে।

১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন—"ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্বাপেক্ষা প্রধান। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'....ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণ যত্ন করিব। মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব। প্রাচীন ভারতবর্ষ, শরীর, মন, সমাজ, ধর্ম, রীতি, নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থালাভ করিতে, এমন কি তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দু জাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির আদি পুরুষ বৈবস্বত মনু হইতে রাজপুতানার বীরকুল-চূড়ামণি প্রতাপসিংহের সময় পর্যান্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতি উন্নতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, আমরা প্রাণপণে এইরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি সমবেত হয়, যাহাতে তাহাদের সকলপ্রকার স্বাধীনতালাভ ধর্মসঙ্গত বৈধ সমবেত চেষ্টায় হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণ যত্ন করিব।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮০৩ শক)

রাজনারায়ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন —"একদিকে তিনি মাটির মানুষ, কিন্তু তেজে তিনি একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁর যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা, দীনতা, অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন, তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে

মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় স্বর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না।

"একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

বাংলাভাষার অনুশীলন প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলেছিলেন, "স্বদেশ এপ্রকার প্রিয়পদার্থ যে, তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমাদের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয়, যাহার অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই, যে নাম চিন্তামাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে। যিনি প্রবাসী হইয়া যতদূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম জ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই জানেন যে, জন্মভূমি মানুষের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে। কাশ্মীরের নির্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান কিংবা সিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন কিছুতেই তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুবাসী হইলেও সেই স্বদেশ-সমর্থন-লিপ্সায় ব্যাকুল থাকেন। এমন সুখের আকর যে জন্মভূমি, তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মানুষ ?....অদ্যাপি কাহারও মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত হয় না যে,— জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত মূর্ত্তি রাজনারায়ণ যিনি অভিহিত হতেন 'স্বাদেশিকতার পিতামহ' (Grand father of Indian Nationalism) এবং তাঁর প্রজ্ঞার জন্য সম্মানিত হতেন, 'ঋষি' রাজনারায়ণ বলে তাঁর মেদিনীপুরে পনের বৎসর অবস্থানের সময় তিনি মেদিনীপুরের মাটিতে স্বদেশ-প্রেমের বীজ বপন ক'রে কি তাঁর ছাত্রবর্গ, কি তাঁর সহকর্মীগণ, কি তাঁর চারিদিকের মানুষ এমন কি জেলার অধিবাসীবর্গের অন্তরে জননী জন্মভূমির ভাবরূপ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা" ব্যতীত মেদিনীপুরে তিনি 'বেলীহল' বা সাধারণ

গ্রন্থাগার,' 'অলিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়,' 'মদ্যপান নিবারণী সভা,' 'পারস্পরিক উন্নতি বিষয়ক সভা,' 'জ্ঞান দায়িণী সভা' প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজকে নূতন রূপ দিয়েছিলেন। এই সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাদেশিকতার উদ্বোধন।

মেদিনীপুরের বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যে নেতৃত্ব দেখা যায় তার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। এঁরা এবং অন্য দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ভূপেন্দ্রবাবু (কেদেন) সুবোধবাবু ও সরলবাবু উত্তরাধিকারসূত্রে গভীর স্বদেশ প্রেমের অধিকারী হয়েছিলেন—ইহা নিতান্ত কষ্টকল্পনা নয়। ঋষি রাজনারায়ণ মেদিনীপুর বাসীর জন্য যে অবদান রেখে গিয়েছিলেন তা সার্থক হয়েছিল এইসব বিপ্লবীর জীবনমরণ সাধনার মধ্যে।

রাজনারায়ণের স্মৃতিপূত মেদিনীপুরের মাটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কয়েকটি যুবকের প্রাণে জেগে উঠেছিল পরপদানত মাতৃ-ভূমির শৃঙ্খল মোচনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। তাদেরই প্রাণে প্রথম আহ্বান এসেছিল—

"কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে
এস কে কেঁদেছ নীরবে।
মার মুখ চেয়ে আত্ম বলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।
কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত
মৃত্যু, নির্যাতন, দৈব, বজ্রাঘাত।
খণ্ড খণ্ড হয়ে, মার মুখ চেয়ে
এস কে সহিতে পারিবে।
এস শীঘ্র গতি বেলা বয়ে যায়
এনেছে জাপান উষা এশিয়ায়।
মধ্যাহ্ন গরিমা নবীন ভারতে
আসিবে, নিশ্চয় আসিবে।"

এঁরা গ্রহণ করতে পারেননি তখনকার নিয়মতান্ত্রিক পথ অবলম্বনে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের চিন্তা। 'ভারতসভা গঠন (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) এমনকি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) দ্বারা ভারতের স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার হবে এ ধারণা তাঁদের ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের লক্ষ্যের মধ্যেও বৃটিশ সম্বন্ধ-বর্জিত স্বাধীনতা লাভের কথা ছিল না। ১৮৯৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বরোদাবাসের প্রথম ভাগেই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে "New lamps for the old" নাম দিয়ে যে এগারটি প্রবন্ধ লেখেন তাতে তিনি কংগ্রেসের মত ও পথকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকেই তিনি ভারতবাসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র এবং আবাল্য ইংরাজের সাহচর্যে বাস ও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ইংরেজ-বর্জিত ভারতের মাতৃরূপ তাঁর ধ্যানের বস্তু ছিল।

মেদিনীপুরের যে তিনটি যুবক ভারতের এই পূর্ণ স্বাধীনতার সাধনার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, তাঁদের চিন্তা ও কর্মের পরিচয় তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন প্রণালী ইত্যাদি এই জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

বিপ্লবের ত্রয়ী

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই তিন ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে মেদিনীপুরের বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনা। প্যারীলাল ঘোষ ছিলেন এদের সহযোগী। শহীদ ক্ষুদিরাম দীক্ষিত হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের নিকট। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও উপায় অন্যতম বৈপ্লবিক নেতা ও আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের একটি বিবৃতিতে পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "আমাদের যুদ্ধ করিয়া

স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। দেশময় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের মত প্রচার করিতে হইবে। অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ঠিক সময় উপস্থিত হইলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।”

ভারতের মুক্তিপাগল সন্তানেরা তখনও বিপ্লবের পথে বেশীদূর অগ্রসর হননি। মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান বাসুদেব বলবন্ত রাও ফাড়কে পার্বত্যজাতিকে সংঘবদ্ধ ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ইংরাজ সে বিদ্রোহ দমন ক'রে ফাড়কের চেষ্টাকে ব্যর্থ করেন। তারপর কিছুকাল প্রকাশ্যে কোন বিদ্রোহ দেখা যায়নি। কিন্তু পুণা শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় প্লেগ কমিশনার ব্যাণ্ড ও তাঁর সহযোগী কর্নেল আয়ার্স্ট যে ভয়ানক উপদ্রব চালিয়েছিলেন তার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দামোদর ও রামকৃষ্ণ চাপেকর এঁদের হত্যা ক'রে নিজেরা ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ হারান। চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের সংবাদ দিয়ে যারা গুপ্তচরের কাজ ক'রে পুরস্কার লাভ করেছিল ‘চাপেকর সঙ্ঘের’ সদস্যগণ তাদের হত্যা সাধন করেন—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা রাজ্যের অধীনে চাকুরীতে থেকে আকুল-ভাবে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় খুঁজছিলেন।

মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতি

এদিকে মেদিনীপুরের তিনজন স্বাধীনতা সাধক নানাদেশের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড অনুধ্যানে বিভোর। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর কালেক্টরেটের একজন কর্মচারী। এঁরা পাঠ করেন ও আলোচনা করেন ইতালীর কার্বোনারী আন্দোলনের ইতিহাস এবং ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবন ও বিপ্লব কার্যের বিবরণ, ইতালীর মুক্তিসাধনার ইতিহাস এঁদের চিন্তাকে মগ্ন রাখে। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে ইতালীর বীরদের আদর্শের প্রচার ব্যাপকভাবে চলছিল। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বাংলাভাষায় ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী লিখেন।

১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রের মেদিনীপুর আগমন ও এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই এঁরা একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ফেলেছিলেন। এইরূপ দল যে ছিল সে বিষয়ে বারীন্দ্রের একটি বিবৃতি পরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি যখন রেল ও পোষ্টাফিসের বিস্তার শহর অঞ্চলে সুখ সুবিধার বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উন্নয়ন মূলক কাজের ব্যবস্থার কথা পড়াতেন তখন তাঁর ছাত্রদের চোখ ফোটাবার চেষ্টা করতেন এই বলে যে দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য এসব ব্যবস্থা নয়। ইংরেজ তার শাসন সুপ্রতিষ্টিত করার জন্য ও তাদের শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য এইসব কৌশল অবলম্বন ক'রে আমাদিগকে ভুলিয়ে রেখেছে। এসবের দ্বারা ভারতবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য কিছু বেড়েছে কিন্তু ইংরাজের শক্তি বেড়েছে ষোল আনা। আমরা ইংরাজের চাকচিক্যের চাটুকার সেজে তাদের দাসত্ব আঁকড়ে রাখতে চাচ্ছি। পরাধীনতার গ্লানিবোধ ক্রমশঃ লুপ্ত হচ্ছে। দাস মনোভাব বেড়েই চলেছে। ছাত্রদিগকে দেশের প্রকৃত অবস্থা বোঝাবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ থাকতেন নিয়ত সজাগ।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর অন্যতম ছাত্র কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পশুপতি মাল মহাশয়ের লিখিত বিবরণ যা শ্রীহরিপদ মণ্ডল সম্পাদিত "শহীদ ক্ষুদিরাম" পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে তাতে পশুপতি বাবু উল্লেখ করেছেন ঃ—

"আর একজন সর্বজনপ্রিয় শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। ইনি ছিলেন সর্বভারতীয় বিখ্যাত মনীষী রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সত্যেন বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পুণ্যশ্লোক অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষের মাতুল। জ্ঞানবাবু আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। তৎকালীন রাষ্ট্রীয় পরিবেশ, রাজনীতির আন্দোলন, উন্মাদনা ও উদ্দীপনা এবং জ্ঞানবাবুর মতন কতিপয় বরেণ্য শিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষা

দিবার প্রণালী আমাদের অনেকেই স্বাজাত্যবোধ ও দেশভক্তির বিষয়ে উদ্বুদ্ধ, প্রভাবিত ও সচেতন করেছিল। ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে বলতে গেলেই জ্ঞানবাবুর নাম অপরিহার্য্য মনে করি। তিনি তাঁর অধ্যাপ্য বিষয় ইতিহাস পড়াতে পড়াতে পর্য্যায়ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রচিত বহুদেশপ্রেম-সূচক গান ও কবিতার উল্লেখ করতেন....আমরাও মনোযোগ সহকারে ঐগুলি শুনতাম। সত্যেন ঠাকুর রচিত হিন্দু মেলার উদ্বোধন কালে প্রথম গীত এবং সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত (অবশ্য বঙ্কিমের জাতীয় সঙ্গীতের পর) 'গাও ভারতের জয়' এই বিখ্যাত গানটির কিছু অংশও সময় সময়ে তিনি শোনাতেন। সেই গানটির কিয়দংশ এই—

"মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়" ইত্যাদি

লর্ড লিটন দিল্লীতে যে দরবার করেছিলেন এবং যে দরবারে ভারতের রাজন্যবর্গ ও ব্রিটিশ ভক্ত সমাজপতিগণ খেতাবের মোহে উদভ্রান্ত হয়ে সহর্ষে যোগ দিয়েছিলেন সেই ঘটনা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ যে গান রচনা করেছিলেন তাও সময় সময় জ্ঞানবাবুর মুখ থেকে আমরা শুনেছি। তার কিছু অংশ এই ঃ—

"দেখিছনা অয়ি ভারত সাগরে,
অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে
প্রলয় কালের নিবিড় আঁধার
ভারতের ভাল ফেলিছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারি বুকে

সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমার সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে এ ঘোর দুর্দিনে
ভারত কাঁপিছে হরষ রথে!
শুনিতেছ নাকি শতকোটি দাস
মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায়
হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে।" ইত্যাদি

এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তিমূলক বহু গান জ্ঞানবাবুর নির্দেশে আমাদের চিরপ্রিয়, চির সমাদৃত হয়েছিল। ছাত্রদের উপর এই জাতীয় প্রভাব বিস্তারে জ্ঞান বাবুর মত শিক্ষকগণ অতি সুপটু ছিলেন। ক্ষুদিরামেরা এইরূপেই প্রভাবিত হয়েছিল।

জ্ঞানবাবু সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ইংরাজী দৈনিক "বেঙ্গলী" পত্রিকার মেদিনীপুরের সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি একটি মামলা (নন্দীগ্রামের বিখ্যাত দোনাচম্পট খেলা ও দারোগা হত্যা সম্পর্কীয় (১৯০০—১৯০১ সাল) রিপোর্ট করবার জন্য তমলুক এলে পূর্ণচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। মোকদ্দমার পর জ্ঞানবাবু বা তাঁর প্রেরিত গুপ্ত সমিতির কর্মীরা তমলুকে আসা যাওয়া আরম্ভ করেন। কেউ গ্রামোফোনে (তখন গ্রামে এই যন্ত্রকে কলের গান বলা হত) কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বা জাতীয় সংগীত শুনিয়ে গেছেন—কেউ বা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে দেশের অতীতগৌরব ও বর্তমান দুর্দশার কথা জানিয়েছেন আবার কেউ বা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কথকতার মাধ্যমে পরাধীনতা ও স্বজাতিদ্রোহিতার গ্লানি বুঝিয়েছেন। ১৯০৩—১৯০৪ সালে ঐরূপ একবার তারকনাথ দাস (পরে ডক্টরেট) ও অধরচন্দ্র লস্কর ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ নিয়ে এসেছিলেন। অল্প দিন পরে তাঁরা উভয়েই আমেরিকা চলে যান।

জ্ঞানবাবু সম্বন্ধে পূর্ণবাবু লিখেছেন—"মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হবার বহু আগে জ্ঞানবাবু ও হেমদার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। পূর্ব পরিচয়ে মেদিনীপুরে এসে (১৯০৫ সালের প্রথমদিকে) কয়েক-

জন সহপাঠী বন্ধুসহ জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে এক আলোচনাচক্রে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় মিলিত হতাম। বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, বিদেশী শাসনের বিষময় ফল, দেশবাসীর কর্তব্য ইত্যাদি ছিল আলোচনার বিষয়। জ্ঞানবাবু অনেক পুরাণো ও সমসাময়িক পুস্তক পুস্তিকা ইত্যাদি যথা—সখারাম গণেশ দেউসকরের "দেশের কথা" ডিগবীর "Prosperous British India", শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার "Indian sociologist" Hynduanএর Justice, Article on India ইত্যাদি থেকে পড়ে শোনাতেন—কেমন করে ইংরাজ শোষণে ভারতবর্ষ দিন দিন ইম্পভারিশড্ হচ্ছে—দেশের লোক ডিহিউম্যানাইসড্ হয়ে পড়ছে। বোঝাতেন দেশরক্ষা করতে হলে—দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গতে এবং স্বরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি অতিশয় সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিদেশী ইংরাজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে কি করা প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে বলতেন না। শুধু নানা দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের নজীর দেখাতেন। তাঁর স্বভাবজাত অত্যধিক সতর্কতা সত্বেও তিনি রাজরোষ ও পুলিশী জুলুম থেকে অব্যাহতি পাননি। শেষ জীবনে কয়েক বৎসর অতি যোগ্যতার সঙ্গে নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের একান্ত সচিবের কাজ করবার পর অতি শোচনীয়ভাবে সাময়িক বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সক্রিয় বৈপ্লবিক সংস্থা সংগঠনে অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁর নাম স্মরণীয়।

মেদিনীপুরের বিপ্লব আন্দোলনেই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এবং আইন অমান্য আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে ও জেলার কংগ্রেস সংগঠনে কুমার দেবেন্দ্রলালের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে এই সব ব্যাপারে তাঁর সহায়তাও স্মরণযোগ্য।

হেমচন্দ্র কানুনগো

হেমচন্দ্র ছিলেন চিত্রবিদ্যার শিক্ষক। তিনি তাঁর ছাত্রদের

চোখ ফুটাতে চাইতেন—দেশের অবস্থা ও ইংরেজদের কুটনীতি সম্বন্ধে সরস টিকা-টিপ্পনী ক'রে। বেশী কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল না। যথাসময়ে যথাস্থানে খোঁচা দিয়ে তিনি যা বলতেন ছাত্ররা তাতে দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য উদ্দীপ্ত না হয়ে পারত না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন শক্তিশালী সংগঠক। ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে পরিচালিত করতে তিনি নানা সুযোগ উত্তমরূপে ব্যবহার করতেন। মেলা প্রদর্শনীতে ক্রীড়াদি পরিচালনায় তিনি সর্বদাই স্বেচ্ছাসেবকদলের নায়করূপে কাজ করতেন।

মেদিনীপুর জেলা স্কুলে তদানীন্তন ছাত্র অতুলচন্দ্র বসু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর "সফল স্বপ্ন" পুস্তকে মেদিনীপুরের তিন জন বিপ্লবীর সম্বন্ধে লিখেছেন "শ্রীঅরবিন্দ মেদিনীপুর আসিয়া যে বিপ্লব-সমিতি গঠন করেন তাহার পরিচালনার ভার জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র দাসের উপর প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সে সমিতি বরাবরই সক্রিয় অবস্থায় ছিল। অতি সাবধানে, অতি গোপনে, এই সমিতির কার্য চলিতেছিল। সমিতির তরুণ সদস্যগণকে লাঠি খেলা, সাইকেল চালানো, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত।

হেমচন্দ্র ছিলেন এই সমিতির দ্রোণাচার্য্য। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সমাহর্তা। বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত তরুণদিগকে এই সমিতিভুক্ত করা এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়া বিভিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল সত্যেন্দ্রনাথের উপর। তিনি এইরূপ সাবধানতার সহিত কার্য করিতেন যে এক দলের সদস্য অন্য দলের সহিত পরিচিত ছিল না। এই সব তরুণদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত যুবকগণকে অস্ত্র শিক্ষা—বন্দুকচালনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত এবং তাহাদিগকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করা হইত।

অরবিন্দের ভবানী মন্দিরের অনুকরণে সত্যেন্দ্রনাথ নিজ বাসগৃহের

সন্নিকটে একটি গৃহে কালীমূর্তি স্থাপন করেন এবং যারা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাহিত তাহাদিগকে এই কালিমুর্তির সম্মুখে দীক্ষাগ্রহণ ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিতে হইত।"

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার ১৯০৮ সালে গ্রেপ্তারের পর তাঁর প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন—........"শ্রীঅরবিন্দসহ দ্বিতীয় অভিযান মেদিনীপুরে। আমার দুই মামা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইতিমধ্যেই সেখানে তরুণ দলকে দিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ফেলেছেন; এইখানে প্রথম পরিচিত হলাম সত্যেনবাবু, নিবাপদ রায়, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি বহু প্রৌঢ় ও তরুণ কর্মীর সঙ্গে। মেদিনীপুরের "আনন্দমঠ" ছিল একটি এক তলা ছোট এঁদোপড়া শ্রীহীন বাড়ীতে। দেখলাম ছেঁড়া মাদুরের উপর ছেলেরা শোয়; তারি পাশে একটি তিন হাত উচু ধুলা মাখা মৃন্ময়ী কালী প্রতিমা, অযত্ন প্রদত্ত গুটিকয়েক আধশুকনো জবার নৈবেদ্য। সামনে রক্ত জিহ্বা বের করে কালী ক্ষেপাটে কর্মীগুলির আদর্শেই যেন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁহার হাতে রাংতার খাঁড়া, পদতলে নিদ্রিত অসাড় হতচৈতন্য শিবঠাকুরটি। এই মৃন্ময়ীকে কেন্দ্র ক'রে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মত ইংরাজের সাম্রাজ্য উল্টে ফেলার শুভ কাজ চলছে।

নিরাপদ রায় ছিল খর্বকায়, গৌরকান্তি, শান্ত মৌনপ্রায় মানুষটি। সে ছিল শান্তিপুরের ছেলে; তার কটা চোখে নির্বাক হাসি লেগে থাকত। একটা ময়লা ধুতি ও চাদর গায়ে খালি পায়ে সে দরকার হলে দশ বিশ ক্রোশ অক্লেশে যেত হেঁটে। যখন আর কোন অসাধ্য সাধনের কাজ না পেত খুঁজে—তখন গভীর মৌনতাভরে হুকাটি হাতে বসেই থাকত। অসীম ধৈর্য্য! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চোখে তার কৌতুকের হাসিটুকু নিয়ে।"

বারীন্দ্রকুমার আরও বলেন,—"সত্যেনবাবু ছিল শীর্ণকায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলে—দুরন্ত হাঁপানি রোগে রুগ্ন, মুখে বুদ্ধির সতেজ দীপ্তি, রোগা শরীরে অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্য।

এই ছোট্ট দলের দলপতি হয়ে চর্কির পাকের মত সে ছেলের পর ছেলের মাথায় বিপ্লবী আইডিয়ার ঘুণ ধরিয়ে ঘুরে বেড়াত। অদূর ভবিষ্যতে এই সত্যেনবাবুই আলিপুর বোমার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে কানাই দত্তের সাহায্যে হত্যা করেছিল।

এই যাত্রায় মেদিনীপুরে শ্রীঅরবিন্দ হেমচন্দ্রকে স্বহস্তে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। হেমচন্দ্র কানুনগো বয়সে প্রৌঢ় হলেও এই দলের একজন ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীন পাউণ্ড ইন্সপেক্টার—গরু, ছাগলের খোঁয়াড়গুলি তত্ত্বাবধান অফিসার। হাসি রঙ্গরস সরস রসিকতা তাঁর ছিল স্বভাবজাত; মুখে থাকত অমায়িক হাসিটি লেগেই। এমনি মিশুক সদাপ্রসন্ন মজলিসি মানুষ খুব কম দেখা যায়। অভিনয়-দক্ষ, সুগায়ক, উত্তম শিকারী ও সাইক্লিষ্ট, পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কনে ও ফটোগ্রাফিতে অতি উচ্চাঙ্গের আর্টিষ্ট, খুঁটিনাটি মেশিন মেরামতিতে নিপুণ, রসায়ন বিদ্যায়ও পারদর্শী—এইসব কর্মেতে হেমদার গুণের আর অবধি ছিল না।"

ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে বারীন্দ্রকুমারের উক্তি

"এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরাম তখন নিতান্ত লাজুক, স্বল্পভাষী রোগা ছেলেটি আমাদের সামনে সংকোচে এগোত না। আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন মেদিনীপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি অবসর নিয়ে দেওঘরে বাস করার পর তাঁর ভাই দুর্গাচরণ বসু হন এই হেডমাষ্টারিতে বহাল। জ্ঞানবাবু ও সত্যেনবাবু তাঁহারই ভাই অভয়চরণ বাবুর পুত্র। কর্নেলগোলাতে তাঁর বসতবাটি এখনও আছে। এই বাড়ীর কাছেই একতলা বাড়ী—মেদিনীপুরের মা কালী মার্কা 'আনন্দমঠ'।

ক্ষুদিরাম বসুর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসুর বাসভূমি ছিল কেশপুর থানার অন্তর্গত মোহবনী গ্রামে। তিনি নাড়াজোল রাজষ্টেটের তহশীলদার ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর সহরের হবীবপুর পল্লীতে

শিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দিরের সামনে একটু জায়গা কিনে একটি ঘর করেন। ক্ষুদিরামের মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পর পর তিনটি কন্যা-সন্তান জন্মে। কথিত আছে তিনি তখন কালিমন্দিরে হত্যা দিয়ে ক্ষুদিরামকে লাভ করেন। ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় ভীমচরণ রায় মহাশয় তাঁর মাতা অপরূপা দেবী এবং তাঁর পিতা অমৃতলাল রায়ের নিকট এই বিবরণটি শুনেছিলেন বলেন। ক্ষুদিরামের মাতা ও পিতার মৃত্যুর পর অমৃতবাবুর গৃহই তাঁর আশ্রয়স্থল ছিল।

ক্ষুদিরাম ছিলেন মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র এবং তিনি শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা কিভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিলেন তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষুদিরামের দিদি অপরূপা দেবী লিখেছেন (শ্রীহরিপদ মণ্ডল সম্পাদিত 'শহীদ ক্ষুদিরাম' পুস্তকের প্রবন্ধ 'অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম'। ৩)

"ললিত ও ক্ষুদিরামকে ভর্তি করা হল কলিজিয়েট্ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (এখনকার সপ্তম শ্রেণী)। উপেন্দ্রলাল চন্দ্র ছিলেন হেড-মাষ্টার। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন তৃতীয় শিক্ষক। এই সময় ক্ষুদিরামের ঝোঁক পড়ল ব্যায়াম চর্চার উপর। খুব উৎসাহ ছিল প্যারালালবারের খেলায়। তখনকার ছোট লাট একবার মেদিনীপুর আসতে ব্যায়াম প্রদর্শনী হল। ক্ষুদিরামের প্যারালালবারের খেলা এত ভাল হল যে, রামচরণ সেনের (সেকেণ্ড ব্যায়াম শিক্ষক) মাইনে ৫ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল। তৃতীয় শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষাপ্রণালী ক্ষুদিরামের মনে খুব রেখাপাত করে। বয়সের পার্থক্য থাকলেও জ্ঞানেন্দ্রবাবুর ভাই সত্যেন বসুর সঙ্গে মেলামেশা হয় ক্ষুদিরামের। ক্ষুদিরাম পরের বছর থার্ড ক্লাসে প্রমোশন পেল, কিন্তু ক্ষুদিরাম পড়া ছেড়ে দিল।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখ থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়। এর আগে থেকেই একটা গুঞ্জন ধুঁইয়ে উঠেছিল, পাঁচ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর থেকেই চারিদিকে তুমুল প্রতিবাদ উঠল। অক্টোবরের পর মেদিনীপুরে প্রবল আন্দোলন শুরু হল।

প্রথম যে শোভাযাত্রা মেদিনীপুরে বের হয়, তাতে ভিখারী থেকে জমিদার সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত জাতের লোক ছিল অন্তত দশ হাজার। মেদিনীপুরের হার্ডিঞ্জ মাইনর স্কুল থেকে নাড়াজোলের কাছারি পর্যন্ত এই লম্বা শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রার একজন পাণ্ডা ছিল ক্ষুদিরাম। যত সভা সমিতি হয়েছে একটিও বাদ পড়েনি; দেখতাম সবখানেই চলেছে ও হৈ-হৈ করে কিন্তু কোথাও বক্তৃতা দিয়েছে একথা শুনিনি।

১৯০৫ সালের প্রথমদিকে সত্যেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্রের নেতৃত্বে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, এ সময়ে। গোলকুয়ার চক সত্যেনদের বাড়ীর লাগোয়া একটা ডাঙ্গায় ছিল ওদের গুপ্ত সমিতি কালীমন্দিরের সামনে একটি চালায়। সেইখানে উন্মাদিনী দাসীব ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা হয়। এইখানে কালীবিগ্রহেব কাছে ওবা প্রতিজ্ঞা নিত সাদা পাঁঠা বলি দিয়ে সেই রক্তে মাকে তৃপ্ত করতে হবে। এই সমিতিতে দুইখানি বই পড়ত ওবা, (১) বর্তমান বণনীতি আর (২) মুক্তি কোন পথে। যুগান্তর পত্রিকা থেকেও কিছু কিছু পড়া হত। অরবিন্দ ঘোষের লেখাগুলিব জন্য ওবা হাঁ করে থাকত।"

এই সময়ে তাঁদের কাজ ছিল বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম চর্চাব আখড়া তৈরী করা, স্বদেশী কাপড় তৈরী, তাঁতখানা গঠন ও স্বদেশী জিনিস কেনার আন্দোলন।

জ্ঞানেন্দ্র, হেমচন্দ্র ও সত্যেনের চিন্তাজগতে বিপ্লবের যে ধ্যান-ধারণা চলছিল এবং ইটালী প্রভৃতিতে বিপ্লবী বীরগণ নিজ নিজ দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীগণের আত্মত্যাগ যে প্রেরণার সঞ্চার কবেছিল সেই আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণের জন্য তাঁদের মধ্যে যে ব্যগ্রতার সৃষ্টি করেছিল তা প্রকৃষ্টরূপ ধারণ করেছিল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুব বিপ্লবী সমিতি গঠিত হয়ে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতামহ রূপে (Grand father of Indian Nationalism) পরিচিত রাজনারায়ণ বসুর সহোদর

অভয় চরণের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের রক্তেই স্বাদেশিকতার বীজ নিহিত ছিল—এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন স্বাধীনতা সাধক হেমচন্দ্র কানুনগো—যিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন—মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক রূপে। মেদিনীপুরের বিপ্লবী যজ্ঞের হোতা এই তিন মূর্ত্তিকে অবলম্বন ক'রে মেদিনীপুরে যে বিপ্লব সমিতি গঠিত হল—তারই সুসংগঠিত কর্মপ্রচেষ্টা ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত কেবল মেদিনীপুর নয় সমগ্র বঙ্গে এবং ভারতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করেছিল।

বিপ্লবী দলের সংগঠনের উদ্দেশ্যে বারীন্দ্র কুমারের দ্বিতীয়বার বঙ্গে আগমনের সময় শ্রীঅরবিন্দও বরোদা থেকে বঙ্গদেশে আসেন এবং এবার তিনিই ছিলেন নেতা ও পরিচালক।

হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রের দীক্ষা

মেদিনীপুর বিপ্লব সমিতি গঠনের সময় শ্রীঅরবিন্দ, হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রকে দীক্ষা দেন। তাঁরা তরবারি ও গীতা হস্তে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে যে চারিপ্রকারে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল সম্ভবত; এঁদের দীক্ষা তার পূর্ববর্ত্তী সময়ে ঘটেছিল। হেমচন্দ্র তাঁর 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' (পৃষ্ঠা ২০ থেকে ২২) পুস্তকে লিখেছেন ঃ—"দীক্ষার মন্ত্রে এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সবরকম সোসাইটির তরফ থেকে যখন যা আদেশ আসবে তা পালন করতেই হবে নচেৎ মৃত্যু দণ্ড।" কলিকাতার বিপ্লবী সমিতি ১৯০২ খৃঃ অব্দে দোল পূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতি নাম গ্রহণ করে এবং এই সমিতির যে আখড়াটি মদন মিত্র লেনে চলতে থাকে অরবিন্দ একবার ছদ্মবেশে সেখানে আসেন এবং সতীশচন্দ্র বসুকে মেদিনীপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর কাছে প্রেরণ করেন। সতীশচন্দ্র বসু সেইখানেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দীক্ষিত করেন এবং এখানকার আখড়ায় বক্সিং শিক্ষা প্রদান করেন। মনে হয় অরবিন্দ সত্যেন্দ্রকে বিপ্লবী রূপে দীক্ষিত কর-

বার পর ব্যায়াম ও শরীরচর্চা বিষয়ে যুবক সত্যেন্দ্রের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে সতীশবাবুকে জ্ঞানেন্দ্রনাথের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথকে আখড়ার শিক্ষায় দীক্ষিত হতে হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। বোধ হয় এই কারণে অরবিন্দ তাঁদের জন্য ঐরূপ কোন নির্দেশ দেননি।

বিপ্লব সমিতি উদ্বোধন

মেদিনীপুর বিপ্লব সমিতি উদ্বোধনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ঐ দিন সিষ্টার নিবেদিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ ৪ঠা জুলাই) পর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যা হিসাবে রাজনীতিক কাজে যোগদানে তাঁর যে বাধা ছিল—মিশন থেকে পৃথক হওয়ায় তাঁর সে অসুবিধা দূর হয়। তিনি বলতেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের 'মানুষ গড়া' কাজই তিনি ক'রে যাচ্ছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা লাভকে ভারতের ভারতীয়ত্ব লাভের মূল সোপান বলে মনে করতেন এবং বিপ্লবের পথেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর, এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

তিনি মেদিনীপুরের বেলিহলে (অধুনা রাজনারায়ণ বসু পাঠাগার নামে পরিচিত) যে পাঁচটি বক্তৃতা করেন তার বিষয় বস্তু কি ছিল তা জানা যায় না কিন্তু ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয়সত্তার উদ্বোধন এবং পরাধীনতা থেকে মুক্তির প্রেরণা জাগ্রত করার বাণী অবশ্যই শুনিয়ে থাকবেন। মেদিনীপুর বাসকালে তিনি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অতিথি ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড

তারিণী শংকর চক্রবর্তী প্রণীত 'বিপ্লবী বাংলা' পুস্তকে আছে ঃ

"দীক্ষা গ্রহণান্তে মেদিনীপুর মিঞা বাজারের এক বাড়ী লইয়া কুস্তির একটা আখড়া খোলা হয়। সেখানে বিপ্লবীদের লাঠি খেলা, অসি শিক্ষা, সাইকেল অভ্যাস, অশ্বারোহণ, বক্সিং ও বন্দুক চালাবার শিক্ষা হইতে থাকে। অশ্বারোহণ শিক্ষার জন্য একটি অশ্বও ক্রয় করা হয়। সমিতির পক্ষ হইতে রহিম নামে এক লাঠিয়ালকে লাঠি, তরবারি প্রভৃতি শিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

মেদিনীপুরের পশ্চিমপ্রান্তে শহরের অনতিদূরে চারিদিকে ঘেরা একটি নীচু জায়গা ছিল। রাস্তার জন্য কাঁকর তুলিয়া লওয়ায় ঐ স্থানটি গোপন চাঁদমারী শিক্ষা করিবার পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হইয়া ওঠে।"

মেদিনীপুরের বিপ্লবীদল উৎসাহের সঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের কর্মপন্থা অনুসরণ করতে থাকেন। এই কর্মপন্থা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সাধারণ বিভাগের কাজ ছিল—সংগঠন প্রচার ও আন্দোলন। বিশেষ বিভাগকে—সামরিক বিভাগ নামে অভিহিত করা হত। রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত ও সংগ্রহ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী দলের মধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগো এই বিশেষ বিভাগের কাজের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মন্ত্রগুপ্তি ও গোপন সংগঠন ব্যতীত বিপ্লবী দলের কার্য পরিচালনা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই বিপ্লবীদলকে লোকচক্ষুর আড়ালে নীরবে নির্দিষ্ট কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হত। দলভুক্ত সদস্যগণের শারীরিক ও মানসিক সমুন্নতি সাধনের জন্য, বিভিন্ন স্তরের কর্মীগণের পক্ষে ঐগুলি যেভাবে নির্দিষ্ট থাকতো তাও পালন করতে হত। বারীন্দ্র বোমার মামলা সংক্রান্ত তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন—"শুধু বিকাশ সংক্রান্ত ক্রীড়া কলাপ যাতে সহজে লোকের

দৃষ্টি আকর্ষণের মত না হয় এইভাবে সেইগুলিকে পালন করা উচিত। জনসংগঠন বা আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করেই সমিতির বহিরঙ্গ কার্য্যগুলি করা প্রয়োজন।” বিপ্লবীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমিতির কাজের মধ্যে এই নিয়মগুলি মেনে চলতেন। এতে যে বিপদ আছে তার সম্মুখীন হতে হলে জাতিকে আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে হবে। অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হলে আত্মিক বলেও বলীয়ান হতে হবে। সেজন্য ধর্ম-শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ একান্ত অপরিহার্য্য।

স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী দল

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন বাংলার বিপ্লবী দলগুলির নিকট নানা দিক থেকে ভবিষ্যৎ দেশব্যাপী বিপ্লব অভিযানের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলন ক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলন হয়ে উঠেছিল—জনগণের নিজস্ব আন্দোলন এবং তার উন্মাদনা নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ সকল স্তরের মানুষের মনে ব্রিটিশ বিরোধী এবং দেশানুরাগী মনোভাবের একটি প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৩ সালে বঙ্গ বিভাগের প্রস্তুতি থেকে ১৯০৫ সালে সরকারী ঘোষণা দ্বারা ইহা কার্য্যকরী করা পর্য্যন্ত একান্ত অবহেলিত শত শত প্রতিবাদ সভা ও আবেদন প্রভৃতির জন্য মানুষের মনে তীব্র অসন্তোষ ও গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল। বঙ্গ বিভাগ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তা অত্যন্ত ব্যাপক ও মর্মান্তিক আকার ধারণ করল। দেশব্যাপী এই অসন্তোষের সুযোগ বিপ্লবীগণ বিশেষ তৎপরতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও বহু শহরে ও গ্রামে যুবক ও ছাত্রদল আখড়া স্থাপন ক'রে শরীরচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। দেশের দুরবস্থা, দেশপ্রেমে হৃদয় ও মন আপ্লুত হয় এইরূপ সংগীত, কবিতা ও পুস্তকাবলীর চর্চা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিশোর ক্ষুদিরাম নানা স্থানে আখড়া প্রভৃতি স্থাপন, সভা শোভাযাত্রাদিতে যোগদান

এবং স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত কাজকর্মে অংশগ্রহণের দ্বারা যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহস, তেজস্বিতা. ক্লান্তিহীন কর্মপ্রচেষ্টা যুব-সমাজের আদর্শ-স্বরূপ হয়ে ওঠে।

মেদিনীপুরের পুরাতন জেলপ্রাঙ্গণে ১৯০৬ সালে একটি কৃষি শিল্প প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীর সভাপতি ছিলেন তখনকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টন—সম্পাদক ছিলেন গৌসাই দাস দত্ত এবং মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক রামচন্দ্র সেন ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাপ্টেন ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ভাইস্ ক্যাপ্টেন।

দর্শক সংখ্যা হয়েছিল খুব বেশি, তাঁরা জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিলেন। ক্ষুদিরামের উপর ভার পড়েছিল "বন্দেমাতরম্" পুস্তক বিলির—তাতে একটি লেখা ছিল "ইহারাই কি আমাদের রাজা" যেসব ইংরাজ রাজকর্মচারী জাতীয়তাবাদী কর্ম্মী ও পত্র-পত্রিকাগুলির উপর অত্যাচার করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন বা শাস্তি দান করেন সেইসব কর্মচারী হত্যার জন্য প্ররোচনা এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছিল—ঐ পুস্তি-কাতে। কেহ কেহ বলেন উক্ত প্রচারপত্রগুলির নাম ছিল "সোনার বাংলা" ও "No Compromise"। একজন পুলিশ ইন্-স্পেক্টার ও একজন সাব ইন্স্পেক্টার ও দশজন সশস্ত্র কনেষ্টবল মেলার চার্জে ছিলেন।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো তাঁর "বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা" পুস্তকে এ বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ—

"উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশ দ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্বিচারে সকলকে ঐ প্যামফ্লেট বিলি করছিল, এমন সময় হেড কনেষ্টবল এসে গ্রেপ্তার করাতে সে নাকি বক্সিংএ খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে (সত্যেন) সেখানে এসে পড়ে বলে উঠল 'উও ডিপটিকা লেড়কা হ্যায়; উসকো কেঁও পাকড়া ?' সত্যেন ছিল প্রদর্শনীর সহ-কারী সম্পাদক এবং তখন কালেক্টরীতে একজন ডেপুটি বাবুর

এজলাসে কেরাণীর কাজ করতেন। জমাদার সত্যেনকে চিনত। সে ডেপুটির নাম শুনে নাকে রক্তপাত সত্বেও ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরক্ষণে তার ভুল ভাঙল, তখন আর ক্ষুদিরামকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা

পুলিশকে ধোকা দেবার জন্য জেলাম্যাজিষ্ট্রের সামনে সত্যেনকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। তাতে বোধ হয় তাকে দোষী করার কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে সে বেপরোয়া ভাবে হেসে হেসে জবাব দিয়েছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীগিরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে কিন্তু রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হল। বাংলাদেশে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এই প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগ।

ফেরারী অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে এসে ধরা দিল। জেলাম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ও ৫০৫ ধারা মতে পরোয়ানা বাহির করেন এবং ক্ষুদিরামের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। ক্ষুদিরামের জামিন মঞ্জুরের জন্য ২০শে এপ্রিল যে দরখাস্ত হয় ক্ষুদিরাম বালক মাত্র এই বিবেচনা ক'রে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন ৫০০ টাকা জামিনে তাকে মুক্তি দেন। ১৬ই এপ্রিল জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে দায়রা সোপর্দ করেছিলেন। ১৫ই মে দায়রা জজ মিষ্টার র‍্যাণ্ডসামের এজলাসে ক্ষুদিরামের বিচার শুরু হয়। কে, বি, দত্ত, মতিলাল মুখার্জী. প্যারিলাল ঘোষ, সাতকড়ি পতি রায়, এবং ত্রৈলোক্যনাথ পাল আসামীপক্ষ এবং সরকারী উকিল জে, এস, হালদার সরকারপক্ষ সমর্থন করেন। সরকারী উকিল বলেন—ক্ষুদিরামের মত বালককে কঠোর দণ্ড দেবার জন্য তার বিরুদ্ধে এই মামলা আনা হয়নি। রাজদ্রোহ কোন প্রকারে বরদাস্ত করা হবে না—ছাত্রদিগকে এই শিক্ষা দেবার জন্য এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার দণ্ড সামান্য হতে

পারে। পরদিন তিনি মামলা তুলে নেবার অনুমতি চাইলেন এবং কারণ স্বরূপ বলেন যে—আসামী বালকমাত্র এবং অপরের হাতে ক্রীড়নক স্বরূপ কার্য করেছে। জজ্ মামলা তুলে নেওয়ার অনুমতি দিলেন। সমস্ত শহর এই মামলায় তোলপাড় হয়ে উঠেছিল। আদালতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মুক্তি প্রাপ্ত ক্ষুদিরামকে মাল্য ভূষিত করে কে, বি, দত্তের দেওয়া একখানি গাড়ীতে তুলে ছাত্ররা নিজেরাই সেই গাড়ী টেনে নিয়ে গেলেন এবং তার প্রতি বীরের সম্মান দেখালেন।

১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম সম্মেলন আহূত হয়। সভাপতিত্ব করেন পি, মিত্র ব্যারিষ্টার। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মেদিনীপুর থেকে উপস্থিত ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু। ইনি সেই সময় সাংসারিক কাজের জন্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ ক'রে এসেছিলেন। সভাপতি মিত্র মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে আগে সেখানে লাঠির ভীড় ছিল কিন্তু ঐ সময় একটিও লাঠি খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেখা গিয়েছিল যে চট্টগ্রামে বিপ্লব আন্দোলন নিভে গিয়ে থাকলেও মেদিনীপুরের আন্দোলন সেই সময় সজীব ছিল এবং বঙ্গব্যাপী বিপ্লব আন্দোলনে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল।

ইংরাজ বিতাড়নের চিন্তা

১৯০৫ সাল হতে বঙ্গে যে স্বদেশীর হাওয়া শহর, নগর ও গ্রামে অপূর্ব ভাবাবেগে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তা মেদিনীপুরেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এখানকার বিপ্লবীরা দেশের লোককে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ও সে জন্য সংঘবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ হতে সর্ব্বদাই প্রেরণা দিতেন কিন্তু এতে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যাবেনা—ইংরেজকে না তাড়ান পর্যন্ত প্রকৃত মুক্তি আসবে না এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। সামান্য শাসন সংস্কারে এমনকি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনে সন্তুষ্ট হওয়ার মানসিকতা তাঁদের ছিলনা। তাঁদের আদর্শ ছিল ব্রিটিশ কর্তৃত্ব মুক্ত স্বায়ত্ব শাসন

অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা—সেজন্য মুক্তি পণ—জীবন পণ ছিল তাঁদের মুল মন্ত্র। তাঁদের প্রতিজ্ঞা ছিল—স্বাধীনতার জন্য "পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, গৃহের মোহ সমস্ত পরিত্যাগ করিব।" মুরারি পুকুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার হওয়ার পর 'যুগান্তর' পত্রিকাতে যে একটি কবিতা প্রকাশিত হয় তাই বিপ্লবী মনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ;—

"না হ'তে মা বোধন তোর
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট
এস রণ চণ্ডী জাগোমা আবার
আবার পূজিব চরণ তল
ঐ বিল্বদল রয়েছে পড়িয়া
পূজার ফুল যায় মা শুকায়ে
জাগো মা জাগো মা সময় নিকট
রক্তাম্বুধি করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।"

বিপ্লবীগণ "আপনার হিয়া মাঝে যে অনল পুষিতে ছিলেন" তা একদিন রূপ পরিগ্রহণ করবে—এই আশা ও বিশ্বাসে হেমচন্দ্র, সত্যেন, ক্ষুদিরাম প্রমুখ মেদিনীপুরের বিপ্লবীগণ নানা দিকে তাঁদের কার্য কলাপ বিস্তার করতে থাকেন।

হেমচন্দ্রের বিদেশ যাত্রা

অস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিস্ফোরণ বিদ্যা ও বোমা প্রস্তুত শিক্ষার উদ্দেশ্যে হেমচন্দ্র কানুনগো বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল—প্যারিস থেকে উন্নত প্রণালীর ফটোগ্রাফী শিক্ষা করা। মেদিনীপুরের জমিদারী সংস্থা বিশেষতঃ অবিনাশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজের বিষয় বিক্রি করেই অর্থের ব্যবস্থা করেছিলেন। হেমচন্দ্রকে ১৯০৭ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্যারিসে থাকতে হয়েছিল। এইখানে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার সহায়তায় বোমা

প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করতে থাকেন। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, মির্জ্জা আব্বাস (হায়দরাবাদ) ও টি, এম বাপাতকে (বোম্বাই) হেমচন্দ্রের সহকর্মী রূপে নিযুক্ত করেন। এঁদের তিনজনের গোপন আবাস স্থান, ল্যাবরেটারি ইত্যাদি চালানোর জন্য কৃষ্ণ বর্ম্মা তিন হাজার ফ্রাঙ্ক দেন। ইলেক্ট্রিক-ড্রাইসেল যোগে ট্রেণ ধ্বংস করবার কৌশল হেমচন্দ্র আয়ত্ত করেন। প্যারিসে হেমচন্দ্রকে একজন পাঞ্জাববাসী ব্যারিষ্টার রানা বিশেষরূপে সাহায্য করেন। প্যারিসে হেমচন্দ্র বিপ্লবী মহলে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। বিখ্যাত বিপ্লবী ভি, ডি সাভারকার ১৯৩৫ সালে বঙ্কিম শতবার্ষিকী'তে বলেন "গত সপ্তাহে অনেক জায়গায় জাতীয় সংগীতের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এই সভায় জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সমীচীন যে জাতীয় পতাকাও হেমচন্দ্র দাস নামে অপর একজন বাঙ্গালী বিপ্লবী ও দেশ প্রেমিকের দ্বারাই পরিকল্পিত, অঙ্কিত ও বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।" জাতীয় পতাকার বিবর্ত্তন ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং হেমচন্দ্রের একটি কীর্ত্তি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। তিনি বলেন—কি ভাবে তাঁহার নির্ম্মিত ও পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা জার্মানীর ষ্টুটগার্টে ১৯০৭ সালে আগষ্টে ম্যাডাম কামা কর্ত্তৃক উত্তোলিত হয়। ইয়ান্টাতে প্যারিস স্থিত ভারতীয় বিপ্লবী সমাবেশে কি ভাবে জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করা হইবে সে বিষয়ে আলোচনা হয় ও স্থির হয় এবং মধ্যে 'বন্দেমাতরম্' মুদ্রিত জাতীয় পতাকার রূপ পরিকল্পিত হয়। এই সমাবেশে নির্ধারিত পরিকল্পনানুসারে হেমচন্দ্র ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা প্রস্তুত করেন। তিনি তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' পুস্তকে পতাকার বর্ণনা নিম্নরূপ দিয়েছেন :—পতাকায় ছিল লাল, হলদে বা গেরুয়া—ও সবুজ পরপর তিনটি রং। উপরে লাল রং তাতে আটটী আধফোটা সাদা পদ্ম-ভারতের আটটী প্রদেশের প্রতীক ; মাঝখানে গেরুয়ার উপর—নাগরিতে লেখাছিল "বন্দেমাতরম্" তলায় সবুজ রংয়ের উপরে একধারে অর্দ্ধচন্দ্র ও তারা ; সূর্য্য হিন্দুর ও অর্দ্ধচন্দ্র মুসলমানের প্রতীক।

বোমা প্রস্তুতির ইতিহাস

হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে ভারতে ও বঙ্গে যে বোমা প্রস্তুত হয়েছিল ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত তার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—"একটি বি, এস, সি পাস যুবকই বাংলায় আমাদের অনুরোধে প্রথমে বোমা তৈরী করেন। ইহার নাম বিভূতি চক্রবর্ত্তী। নদীয়া জেলায় বাস। ইনি আত্মোন্নতি সমিতির নিবারণ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিস্ফোরণ রসায়ন শিক্ষা করিতেন। যুগান্তর অফিসে তাঁহাকে বারীন্দ্র ও আমি একদিন বলি 'বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য টাকা মঞ্জুর আছে। প্রস্তুত কারকের অভাবে তাহা সফল হইতেছেনা। এই কথাটা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল কারণ ইনি ছিলেন একজন কেমিষ্ট। পরদিন তিনি আসিয়া বারীন্দ্রকে বলিলেন 'আমি বোমা প্রস্তুত করিতে রাজি আছি; কিন্তু ভূপেন প্রভৃতি কেহ যেন ইহা জানিতে না পারে।' খরচের জন্য প্রথমে ভবানীপুরের যোগেশচন্দ্র ঘোষ একশত টাকা দান করেন। বারীন্দ্র যখন তাঁহাকে একদিন বলেন, "টাকার অভাবে বোমার কার্য হইতেছেনা তখন তিনি বলেন আমার হাতে একশত টাকা আছে, অনুগ্রহ করিয়া নিবেন কি?" একথা এখানে উল্লেখ করা হইল কারণ কর্মীদের মনে তৎকালে কর্মে কি প্রকারের আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল তাহা এইসব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

"বোমাটী দক্ষিণ কলিকাতায় যোগেশবাবুর ভ্রাতার ডাক্তারখানায় প্রস্তুত হয় এবং আবরণটী যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য একজন সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যাক্তির ঝামাপুকুরের কলাইএর কারখানায় তৈরী হয়। অনেকগুলি আবরণ (Shell) প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বোমা লইয়াই বারীন্দ্র পরে হেমচন্দ্র দাস লাট ফুলারের পশ্চাৎধাবন করিয়াছিলেন। বোমা নির্মাণের বাকী আবরণ গুলি যুগান্তর অফিসে কিছুদিন থাকে। অবশেষে আমি স্বগৃহে আনি। আমার জেল হইবার দুইদিন পূর্বে নদীয়াবাসী এক সভ্য দ্বারা তাহা স্থানান্তরিত করি। তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে এক পুকুরে ঐ আবরণগুলি ডুবাইয়া রাখিবেন।

এক্ষণে আসল বোমাটী কোথায় গেল? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হেমচন্দ্র দাস ও প্রফুল্ল চাকি আমার বাড়ী আসিয়া বলিয়া গেলেন, 'দাদা পালিয়েছে' অর্থাৎ ফুলারের নাগাল পাওয়া গেলনা। বোমাটী তাঁহারা সঙ্গে করিয়াই কলিকাতা আনিয়াছিলেন। আমার ধারণা ছিল উক্ত দ্রব্যটিও নদীয়া জেলায় পাঠাইয়া দিই; কিন্তু হেমচন্দ্র বলিতেছেন —উক্ত বোমা মেদিনীপুরে নীত হয় এবং পরে তথাকার একটি পুকুরে নিমজ্জিত করা হয়।' ইহাই হইতেছে বাংলার বোমা আবির্ভাবের সত্যতথ্য।"

এরপর একটি ছোট বোমার কারখানা পরিচালিত হয়—উল্লাসকর দত্তের দ্বারা। বারীন্দ্র, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতি সরকার ও প্রফুল্ল চাকি ছিলেন উল্লাসকরের সহকারী। উল্লাসকরের বোমা পরীক্ষার জন্য বারীন্দ্র, বিভূতি সরকার, উল্লাসকর ও রংপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে লইয়া দেওঘর যান।

হেমচন্দ্রের বোমার কারখানা

এর পর আর কোন বোমা কারখানা স্থাপিত হয়েছিল মনে হয় না। হেমচন্দ্র ফ্রান্স থেকে ফিরে আসেন ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি এবং মুরারি পুকুর বাগানে একটি কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানাতে নির্মিত বোমাই মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ব্যবহার করেছিলেন।

ক্ষুদিরামের ডাক লুট

সমস্ত বিপ্লবী দলের সামনে দলের কার্য্যের জন্য অর্থ ব্যবস্থা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ডাকাইতি অর্থ সংগ্রহের কার্য্যকরী উপায় বলে বহু বিপ্লবী দল এই পথ অবলম্বনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের ডাকাইতি করবার জন্য শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়।

মেদিনীপুরের বিপ্লব সমিতি এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সঠিকভাবে জানা যায় না। অকুতোভয় ক্ষুদিরাম যে ডাকাইতিতে লিপ্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ "বিপ্লবী বাংলা" পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা হল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মেদিনীপুরের হাটগেছিয়ায় সরকারী ডাক লুন্ঠিত হয়। পূজাব ছুটিতে ক্ষুদিরামেব ভগিনীপতি অমৃতবাবু তাঁহার হাটগেছিয়া বাড়িতে সপরিবারে যান। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে ক্ষুদিরাম স্থানীয় ডাক হরকরার নিকট হইতে সরকারী ডাক লুঠ করার মনস্থ করেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবাব নিমিত্ত ক্ষুদিরাম একজন সহকর্মীকে সঙ্গে লইয়া উক্ত গ্রামে তাঁহার ভগিনীপতির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" এই ডাক লুঠ করার সম্পর্কে তাঁর দিদি অপরূপা দেবী এক বিবরণে বলেন, "১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পূজার সময় আমরা হাটগেছিয়া যাই। সেখানে লক্ষ্মী পূজার পব কালী পূজার মধ্যে কৃষ্ণ পক্ষেব এক সন্ধ্যার সময় জানতে পারি ক্ষুদিবামই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। একজন দেখেছিল— কিন্তু পুলিশ তদন্তের সময় কেউ কোন কথা বলেনি। এর ফলে নিরপরাধ মঙ্গল ডুলেব হল আট মাস জেল। আমাব কাছে ধরা পড়ে যাওয়াতে ক্ষুদিরাম সেদিনই সকলের অগোচরে গভীব রাত্রে ধান জমির জল কাদা ভেঙ্গে আট মাইল পথ হেঁটে গোপীগঞ্জের ষ্টীমাব ধরে। তারপব কোলাঘাট হয়ে মেদিনীপুর চলে যায়।

এই ডাক লুঠের দিন সকাল বেলায় এক শিব মন্দিরেব কাছে বেড়াতে বেড়াতে ক্ষুদিরাম বলেছিল, "শিব যদি প্রকৃতই প্রত্যাদেশ দেন, তাহলে আমিও হত্যে দিব এখানে; জানব কত দিন পরে ইংরেজ শাসনের রোগ থেকে সেরে উঠবে সবাই।"

হেমচন্দ্রের ডাকাইতির চেষ্টা

এই ঘটনাব পূর্ব্বে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রংপুরে মহীপুর গ্রামে একটি ডাকাইতির চেষ্টা হয়েছিল। এই ডাকাতি দলের সঙ্গে মেদিনীপুরের অন্যতম বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র দাসের যোগ ছিল। গ্রামে পুলিশ এসেছে এই সংবাদে ডাকাইতি পরিত্যক্ত হয়। মানিকতলার বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেন, "আমি টাকা লইয়া রংপুর চলিয়া যাই। আমার পূর্ব্বেই

প্রফুল্ল চাকি চলিয়া গিয়াছিল। আমি, হেমদাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী ও পরেশ মৌলিক ছিলাম। প্রফুল্ল চাকী ও পরেশ আমাদের গাইডের কার্য করে। সেখানে প্রথমে আমরা বলিহারের কাছারিতে যাই। ঈশান চক্রবর্ত্তীও তাঁহাব ছেলে মনোরম আমাদিগকে সাহায্য করে। মনোরম ও একজন জমিদার।···কিন্তু মনোরম রাত্রে আমাদিগকে খবর দেয়—গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে। বোধহয় পূর্বে কোন রকম সংবাদ পাইয়াছে সুতরাং আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইল না। আমবা চলিয়া আসিলাম।"

রাজনৈতিক ডাকাইতি সম্বন্ধে ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত যা বলেছেন তা অনুধাবন করলে গুপ্ত সমিতিগুলির এ-বিষয়ে চিন্তা ও কার্যা পদ্ধতি সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন "রাজনীতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবাব মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার পূর্বেই এই মতটা পাকা-পাকি রূপে গৃহীত হইয়াছিল। কাবণ দেশের লোক টাকা দেয় নাই। দু'চারজন ব্রিফলেস্ ব্যারিষ্টার যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন তাঁহাবাই কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। কাজেই স্থির হইল ইংরে-জের টাকা কড়িয়া লও; কিন্তু স্বদেশী যুগের পর যখন রাজনীতিক ডাকাইতি আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে ডাকাতি কেবল দেশেব উপরই হইতে লাগিল। কারণ বোধ হয় ইংরেজ বা গভর্নমেণ্টেব উপর ডাকাইতি তত সোজা নয়—নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করা যত সোজা। বঙ্গের রাজনৈতিক ডাকাইতিব ইতিহাস এক মেলোড্রামার অভিনয়। ইহা বঙ্গেই সংগঠিত হইতে পারে। বাংলা আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীব দেশ। সেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃ পুনঃ হইয়াছিল—ডাকাইতি বা গুপ্ত হত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়। বীর জাতিরা এসব উপায় অবলম্বন করে না। তাহারা সম্মুখ-যুদ্ধ করে। বাংলা ডাকাইতির দেশ। তার জন্যই ডাকাইতির ছড়াছড়ি হইয়াছিল। ইহার ফলও শোচনীয় হইয়াছে। ইহার জন্য

নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহাদের নিকট টাকা লুকাইয়া রাখা হইত তাঁহারা গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

ডাকাইতি লইয়া বঙ্গের দলাদলি ছিল। আমার বোধহয়, কোন কোন লোকের কাছে ইহা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সব দলের লোক বলিয়াছেন যে, মহাশয়, যে দিন একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে সেই স্থানে গুড় গুড় করিয়া দলের সভ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষকালে এইসব বিভিন্ন দল ভাল যুবক সংগ্রহের দিকে নজর না দিয়া কেবলমাত্র সভ্য শ্রেণী বাড়াইবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। সেই জন্যই হুজুগে ছোকরা দলে লওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর-পাকড়ের সময় অনেক ছেলে ধরা পড়িলেই সব গুপ্ত কথা বলিয়া দিত। শেষাশেষি বোধহয় বেশির ভাগই বাজে সভ্য লওয়া হইয়াছিল।"

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে ডাকাইতি দলের সদস্য তালিকা ভুক্ত হওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত :—

"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসংকার্য জানিয়াও ডাকাইতি করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাইতি লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত অর্থই নেতাকে দিব এবং পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা তিনি অর্পণ করিবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।

যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী গভর্নমেণ্টের গুপ্তচর, কপটাচারী, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারী, জাতি অথবা দেশকে প্রতারিত করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদখোর, ধনী অসৎ কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাইতি করিব।

শপথ করিতেছি যে ডাকাইতি উপলক্ষ্যে কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কদাচ কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।"

উল্লিখিত দুটি উদ্ধৃতি থেকে রাজনৈতিক ডাকাইতির সমালোচনা ও অনুকূল মত (প্রতিজ্ঞাতে প্রতিফলিত) উভয়ই পাওয়া যাবে। হেমচন্দ্র ও ক্ষুদিরামের মত প্রথমশ্রেণীর বিপ্লবী কখনও পরস্বাপহরণ দ্বারা যে স্বার্থসাধন করার চেষ্টা করেন নাই তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ক্ষুদিরাম চরিত্র

ক্ষুদিরাম কাঁথি মহকুমার নানা স্থানে স্বদেশী প্রচার অবলম্বন ক'রে অনেকগুলি ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। কাঁথির ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়ার জমিদার দিগম্বর নন্দ মহাশয়ের মেদিনীপুর শহরে কাছারিবাড়ি ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবে সেখানে ক্ষুদিরামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়। ক্ষুদিরাম অনেক সময় মুগবেড়িয়াতে এসে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন, স্বদেশী প্রচার ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য সভাদিতে যোগদান করতেন। ঐ অঞ্চলের বহু যুবক কর্মী তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। বয়স অল্প হলেও বয়স্ক কর্মীরাও তাঁর কথা মান্য করতেন। এইজন্য অনেক ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার জন্যও তাঁর ডাক পড়ত। বেলদা-কাঁথি রাস্তায় অবস্থিত এগরা থেকে পটাশপুরের মধ্যে দিয়ে মুগবেড়িয়া যেতে হত এজন্য এগরা-পটাশপুর-মুগবেড়িয়া রাস্তাতে ক্ষুদিরামের কয়েকটি ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল —কিছু কিছু ঘাঁটিতে লাঠিখেলার আখড়াও স্থাপিত হয়েছিল।

আমরা আর একবার ক্ষুদিরামের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর শহীদ জীবনের কথা বলবো।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো তাঁর 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' পুস্তকে লিখেছেন " ·এখানে ক্ষুদিরামের অল্প একটু পরিচয় দেওয়া উচিত। ক্ষুদিরামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি মেদিনীপুরের কোন নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে একটু দূরে কয়েকজন ছেলে বসেছিল। তার মধ্যে থেকে

ক্ষুদিরাম দৌড়ে এসে আমার বাইক আটকে অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিল —তাকে একটি রিভলবার দিতে হবে। তখন তার বয়স আন্দাজ চৌদ্দ বৎসর কিন্তু তাকে দেখে তখন আমার মনে হয়েছিল মাত্র বার কি তের বৎসর। দেখতে ছোট-খাট পাতলা হলেও শক্ত ও দৃঢ় ছিল।

আমার কাছে যে রিভলভার থাকত বা ব্যবহার বা শিক্ষা দেওয়া হত এত কচি ছেলে যখন তা জানতে পেরেছে তখন অনেকের মধ্যে কথাটা জানাজানি হয়েছে, এই সন্দেহে ভারি বিরক্ত হয়ে তাকে একচোট বেশ বকে দিলাম কিন্তু তাতে কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে, তাকে যে একটা রিভলভার দিতেই হবে, তা এমন অকুণ্ঠিত আগ্রহের সহিত জেদ ধরেছিল যে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়েছিলাম, রিভলভার নিয়ে সে কি করবে? উত্তরে সে বলেছিল, সে একটা সাহেব মারবে। যা বলেছিল তা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এক কথায় তার ভাবটা ছিল এই যে, ভারতের উপর ইংরেজ যে অন্যায় অত্যাচার করছে তার প্রতিশোধ তার নিতেই হবে। তার প্রতি আমার তখনকার হঠাৎ উদ্দীপিত মনের ভাবটা চেপে, রাগ ও বিরক্তির ভান ক'রে তাকে বেশ ধমক দিয়েছিলাম।

পরে সত্যেনের কাছে খোঁজ ক'রে তার সব খবর পাই। সেই হতে তার ছোটখাট কাজের ভিতর থেকে তার কয়েকটি অনন্যসাধারণ গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম। একটি হচ্ছে নিজের বা অন্যের প্রতি আচরিত কারও অন্যায় অত্যাচার সে সহ্য করতে পারত না।

……যে অন্যায়কারীকে যত অধিক ঘৃণা করে, স্বভাবতঃ সে উৎপীড়িতের প্রতিও তত অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। ক্ষুদিরামেরও তাই হয়েছিল।

সে শৈশবে মা-বাপ হারিয়ে আত্মীয়ের সংসারে আশ্রয় লাভ করতে বাধ্য হয়। যা সচরাচর ঘটে থাকে ক্ষুদিরামের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। পারিপার্শ্বিক লোকনিন্দা বা স্তুতির দ্বারা চালিত হয়ে

মন্দ কাজে বিরত ও ভাল কাজে প্রবৃত্তির ভাবটা ক্ষুদিরামের মধ্যে যতটা ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি অধিক ছিল মন্দ কার্য্য-করণ জনিত আত্মগ্লানির ভয় ও ভাল কাজ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্যই সে যে অবস্থার মধ্যে পালিত হয়েছিল, সে অবস্থায় পড়ে সাধারণতঃ লোক যে হীন প্রকৃতি পায়, সে তা না পেয়ে এক অনন্যসাধারণ সুপ্রকৃতি পেয়েছিল।

সকল রকম বিপদ এমনকি প্রাণ নাশের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ ক'রে যে কাজ করলে লোকে ধন্যবাদ দেয়, এমন দুঃসাধ্য কাজ করবার সহজ (spontaneous) প্রবৃত্তি যাকে সৎসাহস বলে, ক্ষুদিরামের স্বভাবে তা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এ রকমের সৎসাহস তখনই প্রকৃতপক্ষে সার্থক হয়, যখন এর সঙ্গে প্রধানতঃ আরও দুইটি গুণের সমাবেশ হয়। হঠাৎ আগত সংকটে তড়িঘড়ি ক'রে কর্তব্য নির্ধারণ করবার ক্ষমতা যদিও ক্ষুদিরামের গুরু সত্যেনের অসাধারণ ভাবে ছিল, ক্ষুদিরামের প্রকৃতিতে তা বিশেষ রূপে ছিল বলে মনে হয় না। অন্য গুণটি Tenacity of Purpose ক্ষুদিরামের স্বভাবে বিশেষভাবে ছিল। যা করতে হবে বলে একবার সে স্থির করত তা সাধনকালে যত কঠিন বলে অনুভব হোক না কেন, বা তা সম্পন্ন করতে মৃত্যু আসন্ন হলেও সেকাজ সে অসম্পূর্ণ রেখে ছেড়ে দিত না; নেহাৎ ছোট-খাট কাজও না। হাডুডু খেলার সময় ছোটখাটো রোগা ক্ষুদিরাম সাংঘাতিক রূপে ক্ষতবিক্ষত হওয়া অবশ্যম্ভাবী জেনেও এমন মরিয়া হয়ে প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে ধরত যে অপেক্ষাকৃত অনেক বলবান ছেলেও তার হাত থেকে ছাড়ান পেত না। এত অল্প বয়সে ছাদ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়া, সমস্ত রাত্রি তেঁতুল গাছে বসে ভুত ধরা, নদীর ভীষণ স্রোতের মাঝে লাফিয়ে পড়া ইত্যাদি অনেক কাজ থেকে তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যেত।

ক্ষুদিরাম মহাপুরুষ ছিল না, অথবা মানব আকারে শাপভ্রষ্ট দেবতাও ছিল না। সে ছিল বাংলার হাজার হাজার ছেলের মত একটি ছেলে। তারও হয়ত দোষ ছিল অনেক। আর সে

যে জন্য স্বনামধন্য হয়েছে, আমরা এখানে তার সেই শহীদপনার (martyrdom) কথাও বলছি না। আমরা দেখেছি তার অন্যের প্রতি আচরিত অন্যায় আচরণের তীব্র অনুভূতি। সে অনুভূতির পরিণতি বক্তৃতায় নয়, বৃথা আস্ফালনে নয়; অসহ্য দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এমনকি মৃত্যুকে বরণ ক'রে প্রতিকার অসম্ভব জেনেও শুধু সেই অনুভূতির জ্বালা নিবারণের জন্য নিজ হাতে অন্যায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করবার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি ও সৎসাহস ক্ষুদিরামের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভারতের পুরানো ইতিহাসে এমনকি রূপ কথায় এই কঠিনতম পরার্থপরতার তুলনা নেই।"

বরিশাল কনফারেন্স

১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কনফারেন্স এবং দাদা ভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন—উভয়ই স্মরণীয় ঘটনা।

১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের ফলে যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হয়েছিল তার শাসনকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন স্যার ব্যাম্‌ফিল্ডফুলার। 'ফুলারী' শাসন আজও ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। লর্ড কার্জন চেয়েছিলেন বঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি ক'রে তাদের দুর্বল করার জন্য। তারা যেন কখনও অনুভব করতে না পারে তারা একই প্রদেশের অধিবাসী হিসাবে সমান সুখ দুঃখের অধিকারী। সেই জন্য বঙ্গ-বিভাগের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার যোগ্য উত্তরাধিকারী 'ফুলার' পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানা প্রকার অপকৌশল অবলম্বন করতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর 'সুয়োরাণী' এবং হিন্দু সম্প্রদায় 'দুয়োরাণী'—এছাড়া তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন—যাতে পূর্ববঙ্গে জাতীয়তাবোধ একেবারে লোপ পেয়ে যায়।

১৯০৬ সালে বরিশালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স' এর আয়োজন

হল। জেলাম্যাজিষ্ট্রেট ফুলারী নির্দেশ শিরোধার্য্য ক'রে আদেশ জারি করলেন যে—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ক'রে নেতাদের সম্বর্দ্ধনা করা চলবে না। স্থানীয় নেতাদিগকে তিনি ধমক দিতে লাগলেন। তাঁরা যদি কেউ সর্ত না মানেন তাহলে তিনি কনফারেন্সের অধি-বেশন হতে দিবেন না। অভ্যর্থনাসমিতি নেতাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ মেনে চললেন। পরের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' পুস্তকে লিখেছেন যে "পরদিন দুপুরবেলা দেড়টার সময় নেতৃবৃন্দ শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলের দিকে যাত্রা করিলেন। সভাপতি এ. রসুল ও তাঁহার বিলাতী মেম গাড়ীতে এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদব্রজে চলিলেন। তাঁহাদের কেউ বাধা দিল না কিন্তু তাঁহাদের পশ্চাতে 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ ধারণ করিয়া যেই যুবকের দল সেই রাস্তায় আসিল অমনি ছয়ফুট লম্বা মোটা লাঠি দিয়া পুলিশ তাহাদিগকে গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল এবং 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে মারিতে মারিতে পার্শ্বের পুকুরে ফেলিয়া দিল, কিন্তু এই অবস্থাতেও সে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে বিরত হইল না। কয়েকজন পুকুরে নামিয়া কোনমতে গুরুতর রূপে আহত চিত্তরঞ্জনকে পাড়ে তুলিল।"

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বাংলা ১৩১৩ সন ১লা বৈশাখ বীরের রক্তে বরিশালের রাজপথ রঞ্জিত হল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন নেতা এই সংবাদ শুনে ফিরে এলেন।......পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট কেম্প সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করলেন এবং তাঁকে ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সনের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে আসামী হিসাবে তাঁর সম্মুখস্থ চেয়ারে বসতে দিলেন না এবং সরাসরি বিচার ক'রে বিনা লাইসেন্সে শোভাযাত্রা ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করার অপরাধে তাঁকে দুইশত টাকা এবং আদালত অবমাননার

অপরাধে আরও দুইশত টাকা জরিমানা করলেন। বরিশাল কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল দীনবন্ধু সেন ঐ টাকা দিয়ে তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রনাথকে মুক্ত করলেন।

"পরদিন সভা আরম্ভ হইবার পরে পুলিশ সাহেব সভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া সভাপতিকে বলিলেন, সভাভঙ্গের পর কেউ ফিরিবার পথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিবে না, এইরূপ অঙ্গীকার যদি তিনি না করেন তবে তিনি সভা বন্ধ করিয়া দিবেন। সভাপতি নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ অঙ্গীকার দানে অসম্মত হইলে পুলিশ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশপত্র পাঠ করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এই কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন বন্ধ করা হইল বলিয়া আদেশ দিলেন।

বরিশালে ফুলার সাহেবের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কেবল বঙ্গদেশেই রহিল না। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ব্যাপারে বিচলিত এবং ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।"

মেদিনীপুরে প্রতিবাদ সভা

মেদিনীপুরে বরিশালের দক্ষ যজ্ঞের সংবাদ পৌঁছিলে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হল। ব্যারিষ্টার কে. বি. দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বক্তৃতা করতে করতে ভাবাবেগে বিচলিত হয়ে চোখের জল ফেলতে থাকেন।

এই সভায় যুবক অতুল চন্দ্র বসু ও বিজয়ানন্দ সেন দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সকলেই এঁদের অভিনন্দিত করেছিলেন। বলা-বাহুল্য বরিশালের ঘটনাবলী সমগ্র জেলাকে বিশেষ করে যুব ও ছাত্র সমাজকে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। ১৯০৬ সালের জুন মাসে স্বদেশী প্রচারের জন্য কলিকাতা থেকে কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বসু, ভবসিন্ধু দত্ত, অমৃতলাল সেনগুপ্ত, ইব্রাহিম হোসেন। হেমচন্দ্র সেন প্রভৃতি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মেদিনীপুরে আসেন।

মেদিনীপুর শহরের বেলি হলে ও চন্দ্রাকরে দুটি সভা হল। সিটি কলেজের সংগীত শিক্ষক খ্যাতনামা স্বদেশী গায়ক হেমচন্দ্র সেন মহাশয় এই দুই সভাতেই ইংরাজ শাসনে ভারতের কি অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে একটি সংগীত গেয়েছিলেন। সেই সংগীতে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের আগমনে মেদিনীপুরে আবার কর্মব্যস্ততা দেখা দেয়। যে স্বদেশী ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার স্থলে বড়বাজারের 'ছাত্র ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য

১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতির আসন থেকে দাদাভাই নৌরজী ঘোষণা করলেন যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক লক্ষ্য "স্বরাজ লাভ।" তিনি স্বরাজের কোন ব্যাখ্যা না দেওয়ায় নরমপন্থীগণ ধরলেন ইহা "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" কিন্তু চরমপন্থীদের মতে ইহার অর্থ 'পূর্ণ স্বাধীনতা'। ইহার পূর্বে কংগ্রেসের আর কোন অধিবেশনে এইরূপ সংখ্যক প্রতিনিধি (১৬৬৩ জন) বা দর্শক (প্রায় বিশহাজার) যোগদান করেন নাই।

তখন "লাল-বাল-পাল"—লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, ও বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ চরমপন্থীগণ তাঁদের বক্তৃতাতে ও লেখনীমুখে দেশকে চরমপন্থী চিন্তার দিকে আকৃষ্ট করছেন এবং এদের মধ্যমণি রূপে শ্রীঅরবিন্দ অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা জোগাচ্ছেন।

সন্ধ্যা-যুগান্তর-বন্দেমাতরম্‌-মেদিনীবান্ধব

বিপ্লবীদলের মুখপত্র রূপে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ লাভ করেছে ১৯০৬ সাল ১৮ই মার্চ এবং বিপ্লবী লেখক বর্গের লেখনী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করছে। মেদিনীপুরের দেবদাস করণ মহাশয়ের সম্পাদনায় পরিচালিত 'মেদিনীবান্ধব' পত্রিকা চরমপন্থী মতের পোষকতা করতে লাগল এবং স্থানীয় সকল

ব্যাপারে চরমপন্থীদের সহায়তা ও সমর্থন পাওয়া গেল দেবদাস ও তাঁর পত্রিকা থেকে। মেদিনীপুরের জমিদারগণের যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তাতে কোন চরমপন্থীর মত প্রচারিত না হলেও তাঁরা জাতীয় ধন ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা এজন্য একটি বিশেষ সমিতি গঠন করলেন। সর্বজনবরেণ্য রাজা নরেন্দ্রলাল খান এর কোষাধ্যক্ষ হলেন।

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' (প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯০৪, ২৬শে নভেম্বর ও ১৯০৬, ১৮ই মার্চ) এবং ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' এবং 'মেদিনীবান্ধবের' ন্যায় মফঃস্বল থেকে প্রচারিত পত্রিকাগুলি ইংরেজের রাজত্বের কঠোর সমালোচক ছিল। ব্রিটিশ কবল থেকে দেশের মুক্তিসাধন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই—এই পত্রিকাগুলি ঐ মতের ধারক ও বাহক ছিল।

'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ইংরেজের অপশাসনের প্রতি তীব্র উপহাস ব্যক্ত করে ব্রিটিশ মর্যাদাকে ধূলায় মিশিয়ে দিতেন এবং 'শক্তের ভক্ত' ইংরেজ জাতিকে মারের বদলে মার ফিরিয়ে দিবার জন্য বাঙ্গালী শক্তিকে জাগ্রত করার উপদেশ দিতেন।

'যুগান্তর' ছিল বিপ্লবী দলের মুখপত্র। এর প্রবন্ধগুলি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে যুবক মনকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল করে তুলত।

'বন্দেমাতরম্' ছিল অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি চিন্তানায়কগণের স্বাধীনতার বাণী প্রচারের যন্ত্র। "দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদান করিতে হইবে"; স্বাধীনতা সৌধ গঠনের প্রতিটি প্রস্তর সন্নিবেশের জন্য উদ্দীপনা সঞ্চারে এঁরা লেখনী চালনা করতেন।

মফঃস্বলের কয়েকটি পত্রিকা এই পথের পথিক ছিল। জেলাগুলিতে এইসব পত্রিকা প্রচারের জন্য বিপ্লবী কর্মীগণ প্রভূত প্রয়াস অবলম্বন করতেন। মেদিনীপুরে এই পত্রিকাগুলির প্রভাব

কম ছিল না। কর্মীগণের মধ্যে এইসব পত্রিকার পাঠ ও আলোচনা তাহাদের নিত্য কর্মের মধ্যে গণ্য ছিল।

'সন্ধ্যা'র মর্মভেদী কশাঘাত এবং 'যুগান্তর'এর অগ্নিক্ষরা বাণী যে পরিবেশ সৃষ্টি করত তাতে লোপ পেত সকল ভয়-ডর—জাগ্রত হত মুক্তির বেদীমূলে আত্মোৎসর্গের এক উদগ্র কামনা।

মেদিনীপুরের মাটিতে জন্মেছিলেন কয়েকজন বীর সন্তান যাঁরা অবলীলায় আত্মবিসর্জন করেছেন দেশের মুক্তির আকাঙ্খায়।

কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী (১৯০৭)

১৯০৭ সালে মেদিনীপুরে আবার কৃষিশিল্পের প্রদর্শনীর প্রস্তাব হল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েষ্টন্ মেলা কমিটির সভাপতি ও প্রবীণ উকিল ত্রৈলোক্য নাথ পাল সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। উকিল সভার বহুসদস্য এই কাজে উৎসাহী হলেন। মেলার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল সংগৃহীত হল। তাঁরা দাবী করলেন তাঁদের 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ ধারণ করতে ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিবার জন্য অনুমতি দিতে হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েষ্টন কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ ধারণ ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ হল। একটি মীমাংসার চেষ্টা হল কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিকূলতায় শেষ পর্য্যন্ত ইহা বিফল হল। স্বেচ্ছাসেবকদল কাজ করতে অস্বীকার করলেন ; কাঁথি মহকুমা মেলার জন্য অর্থ সংগ্রহে অস্বীকৃত হল। দেবদাস বাবু মেলা বর্জনের জন্য তীব্র ভাবে প্রচার কার্য্যে অবতীর্ণ হলেন। অনেক প্রদর্শক মেলা থেকে চলে গেলেন। মেলার কর্তৃপক্ষগণ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য মেলায় কলিকাতা থেকে মিনার্ভা থিয়েটার আনালেন। মেলার স্বেচ্ছাসেবকদের স্থান নিলেন সরকারী কর্মচারীরা, তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা, নবীন উকিল বাবুরা ইত্যাদি। কাজেই মেলা একভাবে চলতে থাকল। শেষ অভিনয়ের সন্ধ্যায় মিঃ ওয়েষ্টন ও জেলা জজ মিঃ ডুবাল থিয়েটার দেখতে এলেন। এঁদের দেখে জনসাধারণ

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিল। তাতে ওঁরা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না এবং মেলা ক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। এই ব্যপারে মেলার উদ্যোক্তাগণ দেবদাস বাবুর উপর অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট হলেন।

তখন জেলা কংগ্রেসকমিটি উকীল সভাতেই গঠিত হত। জনসাধারণের সহিত এ কাজের কোন যোগ ছিল না। একবার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং কেচকাপুরের জমিদার নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে কংগ্রেস কমিটি গঠনের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন।

১৯০৭ সালের ২১শে এপ্রিল স্থানীয় বেলী হলে একটি জন সভার অধিবেশন হল। সভা আহ্বানকারীদের মধ্যে দেবদাস বাবুর নাম দেখে অনেক উকিলবাবু সভায় যোগদান করতে অসম্মত হলেন। এই বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে জেলা কংগ্রেস গঠনের জন্য একটি জেলা কনফারেন্স আহ্বানের প্রস্তাব হল কিন্তু আবার বিতর্ক উপস্থিত হল এই কনফারেন্সের সভ্য পদ নিয়ে। খবর পাওয়া গেল যে দেবদাস বাবু কোন সভায় থাকলে উকীল সভার অনেকে সভায় যোগ দেবেন না।

মোক্তার সভার সভাপতি রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মোক্তার কৈলাসচন্দ্র দাস মহাপাত্র, রাজা শ্রীনারায়ণ পাল, ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, জমিদার নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ প্রভৃতি অনেকে দেবদাস বাবুর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। দুই দলের মত বিরোধ ও মতান্তর ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১১ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহম্মদ দিদার ও হেমচন্দ্র সেন সহ কলিকাতা থেকে মেদিনীপুর এসে আপোষ-মীমাংসা করেছিলেন। ৩রা অক্টোবর বেলী হলে একটি সভা হল। মেদিনীপুর ষ্টেশনে ও বেলী হলে আগমন কালে সুরেন্দ্রনাথকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান হল। বেলী হলের মিটিং এ স্থির হল যে আগামী ৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে জেলা সম্মেলনীর অধিবেশন হবে। সেইজন্য একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি

গঠিত হল। স্থির হল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন কে. বি. দত্ত। রঘুনাথ দাস অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান, ত্রৈলোক্যনাথ পাল ভাইস চেয়ারম্যান, বি. এন. শাসমল, নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ, মতিলাল মুখার্জ্জী, মহেন্দ্রলাল দাস প্রভৃতি সেক্রেটারী, অবিনাশচন্দ্র মিত্র কোষাধ্যক্ষ ও দেবদাস করণ সহঃ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। সভায় এও স্থির হল যে কে. বি. দত্ত মহাশয় জেলা কন্ফারেন্সের সভাপতি হবেন। এইভাবে বিরোধ আপাততঃ মিটে গেলেও নবীন ও প্রবীণের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য দূর হল না বরং আরও বাড়তে লাগল। পরে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দল বলে যা খ্যাতি লাভ করেছিল তার অঙ্কুর মেদিনীপুর জেলা সম্মিলনীতে উদ্ভূত হল।

মেদিনীপুর বিভাগ প্রস্তাব

১৯০৭ সালে সরকার পক্ষ থেকে প্রচার করা হল যে মেদিনীপুর জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে। বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার মিঃ হেয়ার তাঁর মেদিনীপুর পরিদর্শন কালে নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে প্রকাশ করলেন যে মেদিনীপুর জেলা নিশ্চিতই দুই ভাগে বিভক্ত হবে।

এই ভাগগুলি নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) ঘাটাল, মেদিনীপুর সদর (উত্তর) ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা (এখন এই মহকুমাগুলি যেভাবে আছে) ; এই জেলা সদর মেদিনীপুরে হবে। (২) তমলুক, কাঁথি ও মেদিনীপুর দক্ষিণ—এই মহকুমা নিয়ে গঠিত জেলার সদর হবে হিজলী (খড়্গপুরের নিকট)।

সরকার নূতন হিজলী জেলার জন্য আট হাজার বিঘা জমি কিনে ছিলেন।

মেদিনীপুরকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্যে একটি কারণ দেখান হয়েছিল যে বৃহৎ জেলাকে ক্ষুদ্রতর দুইটি জেলাতে ভাগ করলে শাসন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে তাছাড়া একটি রাজনৈতিক কারণ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সময়ে বঙ্গের ছোট লাট ছিলেন

স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার। ফ্রেজার সাহেব বঙ্গ বিভাগের সময় বড় লাট্ লর্ড কার্জনের অন্যতম পরামর্শ দাতা ছিলেন। তাঁর মস্তিষ্ক বৃহৎ মেদিনীপুরের শক্তি হানির কাজে লাগবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যা হোক নানা দিক থেকে সরকারকে হুঁসিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা হওয়ায় এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

এই সময় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে জঙ্গল মহলের কতগুলি অধিকার নিয়ে যে মামলা চলতে থাকে তাতে শেষ পর্য্যন্ত প্রজাপক্ষের জয় হওয়ায় জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এণ্ড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশ চেষ্টা

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড় ষ্টেশনের নিকট ট্রেন ধ্বংস ক'রে ছোটলাট স্যার এণ্ড ফ্রেজারের জীবন নাশের চেষ্টা করা হয়।

বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি ভূষণ সরকার ও প্রফুল্ল চাকী গোয়াবাগান লেনের গুপ্ত সমিতি আড্ডা থেকে উল্লাস করের প্রস্তুত ডিনামাইট বোমাটি নারায়ণগড় ষ্টেশনের অল্প দূরে রেল লাইনের নীচে বসাতে যান কিন্তু তাঁদের পাতা বোমাটির বিস্ফোরণ ঠিকমত না হওয়ায় ছোটলাটকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মেদিনীপুরের অন্যতম বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র সেন লিখেছেন —তিনিও এই দলে খড়্গপুর এসেছিলেন কিন্তু বারীন্দ্র তাঁকে মেদিনীপুরে শ্রীঅরবিন্দের আগমন সংক্রান্ত কাজের জন্য যেতে বলায় তিনি সেখানে চলে যান। পূর্ণবাবু আরও লিখেছেন "হেমদা প্যারী থেকে কলিকাতা ফেরার অগে পর্য্যন্ত উল্লাস করই ছিলেন স্বকীয় চেষ্টায় বারীনদার নেতৃত্বাধীনে বিপ্লবী কর্মীদের একমাত্র বোমা প্রস্তুতকারক নারায়ণগড়ে ভুল বশতঃ বোমাটি উল্টো বসানো হওয়ায় লাইনটি একটু উঠেই বসে যায়। লাটপ্রভু অক্ষত শরীরে কলকাতা মসনদে ফিরে আসেন। দুষ্কৃতকারীদের নিন্দাবাদে মডারেট ও

রাজভক্তের দল মুখর, যদিও তখন বাঙালী ছেলেদের দ্বারা এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য ছিল কল্পনাতীত। খোঁজ খবর ধরপাকড়ের ধূম পড়ে গেল। শেষে ধরিত ধর ৭।৮ জন নিরীহ কুলি। দেশীয় পুলিশ তাদের দ্বারা মিথ্যা স্বীকারোক্তি করিয়ে 'বিচারে' হাজির করল। ইংরাজের সুবিচারে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল। অন্যতম অনুসন্ধানকারী দুই পুলিশ পুঙ্গব--ডেপুটি সুপার মজহরুল হক' ও ইনস্পেক্টর লালমোহন দাসগুপ্তের ধন ও যশ দুই-ই লাভ হল। বারীনদা, উল্লাসকর প্রভৃতির স্বীকারোক্তি ও আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯০৮-০৯) হাইকোর্টে চূড়ান্ত নিস্পত্তির পর নারায়ণগড় ঘটনা সম্পর্কে ধৃত নির্দিষ্ট কুলি কয়েকজন মুক্তি পেল দেড় বৎসর পরে।"

চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাসে লেখা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৪৩,৪৪) ধৃত কুলিগণ "বিবৃতি দিল যে তাহারা প্রত্যেকে পাঁচটাকা করিয়া অর্থের বিনিময়ে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের প্ররোচনায় রেলওয়ে লাইনের নীচে একটি গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বন্দুকের বারুদ রাখিয়া দিয়াছিল ট্রেনটি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থ সামান্য হইলেও তাহাদের দারিদ্র্যবশতঃ উক্ত টাকা তাহাদের কাছে লোভনীয় মনে হইয়াছিল। দুইজন এ্যাসেসারের সহায়তায় মেদিনীপুর সেশন জজ্ সাহেবের এজলাসে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনের বিচার হইল। শিবুদাস স্বীকোরোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হইল এবং মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইল। দায়রা জজ্ সাহেব নেপাল দোলাই, অর্পি দোলাই, কুমেদ বারিক, তারা দেশাই ও ফকির দাসকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং নেপালকে দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, অর্পি ও কুমেদকে সাত বৎসর করিয়া এবং তারা ও ফকিরকে পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

অলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্র কুমার ঘোষ একটি স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ করিলেন যে ঐ ঘটনার জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্মীগণ দায়ী। বারীন বলিলেন যে উল্লাসকর দত্ত মাইনটি

তৈয়ারী করেন এবং পলিতা ও ফিউজ পিকরিক এ্যাসিড ও ক্লোরেট অব পটাশ দ্বারা বিনির্ম্মিত হয়। বিভূতি ও প্রফুল্লকে রাত্রিবেলা পাহারায় রাখিয়া তিনি নিজে ঐ মাইন পাতেন তখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নারায়ণগড় বোমার মামলার নথীপত্র তলব করিলেন এবং সমস্ত বন্দীকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন।

নারায়ণগড় ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে যে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয় তাতে চরমপন্থীদের মধ্যে আসেন শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ললিত মোহন ঘোষ প্রভৃতি।

চরমপন্থী ও নরমপন্থী দল

পূর্ব থেকে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং তিনি নরমপন্থী হওয়ায় চরমপন্থী প্রতিনিধিগণ নানাভাবে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাদের দাবী ছিল সভাপতিকে মাতৃভাষাতে ভাষণ দিতে হবে এবং প্রস্তাবাবলীও বাংলায় রচিত হওয়া চাই—অন্য যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা ভাষাতেই চালাতে হবে। অভ্যর্থনা সমিতি সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য বাংলাতেই নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রচনা করেছিলেন ঃ—

(১) এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে স্বরাজ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন অর্জনই ইহার লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে স্বাবলম্বনই একমাত্র পন্থা।

(২) জাতীয় শিল্প ব্যতীত, জাতীয় উন্নয়ন সম্ভবপর নহে। এইজন্য এই সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে বালক-বালিকাদিগকে জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিবার জন্য জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক।

(৩) দেশের বর্তমান অবস্থায় এই সভা সিদ্ধান্ত করিতেছে যে জেলার প্রতিটি গ্রামে ব্যায়ামকেন্দ্র ও আত্মরক্ষা কার্যে সাহায্য আবশ্যক। ইহার দ্বারা স্বাস্থ্য গঠন ও আত্মরক্ষা কার্যে সাহায্য হইবে।

(৪) এই সভা পুনরায় শপথ লইতেছে যে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন আবশ্যক। এই শপথ রক্ষার নিমিত্ত সামাজিক অনুশাসন অবলম্বনীয়।

(৫) মামলা মোকদ্দমার দ্বারা বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি হয় বলিয়া এবং জনগণের ধন-সম্পদ ক্ষয়কারী বলিয়া এই সভা সিদ্ধান্ত করিতেছে যে আমাদের যাকিছু বাদ বিসম্বাদ পঞ্চায়েত বিচারে নিস্পত্তি করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

(৬) অনটনের প্রতিকারকল্পে সারা জেলায় ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করিয়া শস্য সঞ্চয় করা আশু কর্ত্তব্য ইহাই এই সভার সুচিন্তিত মত।

(৭) অর্থ সংগ্রহ একান্ত অবশ্যক বলিয়া এই উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করা হউক এবং জেলার অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশ বিতরণ ও প্রচারের জন্য প্রচারক নিযুক্ত করা হউক।

(৮) জেলার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন বিধানের দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করা হউক।

"স্বরাজ" প্রস্তাব নিয়ে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছে "স্বরাজ" অর্থ ঔপ-নিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন কিন্তু চরমপন্থীগণের মতে উহার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রতি গ্রামে ব্যায়াম কেন্দ্র ও আত্মরক্ষা সমিতি গঠন সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা দিল। নরমপন্থীরা আপত্তি জানাল যে আখড়াগুলিকে বিশুদ্ধ ব্যায়ামকেন্দ্র রূপে না রেখে পুলিশের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হলে সরকার হয়ত ক্রুদ্ধ হবেন।

সভাপতি মিঃ কে, বি, দত্ত জানালেন যে তিনি ভাল বাংলা বলতে পারেন না সেজন্য তাঁর ইংরাজী অভিভাষণের বাংলা অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু চরমপন্থীরা এতে সন্তুষ্ট হলেন না।

অধিবেশনের দিন (৭ই ডিসেম্বর) সকালে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দরকে পত্র লিখে অনুরোধ জানালেন উভয় দলের মতানৈক্য মিটিয়ে নেবার জন্য। অরবিন্দ জানালেন খুব ব্যস্ত থাকায় তিনি যেতে অপারগ যদি সুরেন্দ্রনাথের সময় হয় তিনি বেলা বারোটার সময় সাক্ষাৎ করতে পারেন। সকালে ত্রৈলোক্য নাথ পালের সঙ্গত বাজার বাসগৃহে বদ্ধদ্বারে চরমপন্থীদের একটি সভা চলছিল। অরবিন্দ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করায় এবং মতভেদ নিরসনের জন্য কোন আলোচনা সভা না বসায় অধিবেশন বসার পূর্বে অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না।

৭ই ডিসেম্বর (১৯০৭) বেলা তিনটার সময় মল্লিকের চকে একটি বিশেষভাবে সজ্জিত মণ্ডপে সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারী ক'রে শোভাযাত্রা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর পুলিশ বাহিনী সহ সবাই উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচিত সভাপতি শ্রীকে. বি. দত্ত শোভাযাত্রা সহকারে সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হল। সত্যেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকগণের ক্যাপ্টেন হিসাবে তাঁর দল ও সহ-সভাপতিকে অভিবাদন জানালেন। কলিকাতা থেকে আগত বিখ্যাত গায়ক হেমচন্দ্র সেনের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি উকীল শ্রীরঘুনাথ দাস ইংরাজীতে তাঁর স্বাগত ভাষণ পাঠ করলেন; এই ভাষণটি বাংলায় অনুবাদ ক'রে দেওয়া হল। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্য কে. বি দত্তের নাম প্রস্তাব করলেন কেঁচকাপুরের বিহারীলাল সিংহ এবং সমর্থন করলেন তমলুকের যোগেন্দ্রনাথ সিংহ। সভাপতির অভিভাষণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চরমপন্থীরা প্রশ্ন করলেন তাঁর অভিভাষণে স্বরাজ্যের উল্লেখ আছে কিনা। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ ক'রে বললেন সভাপতিকে তাঁর অভিভাষণ পাঠের পূর্বেই অভিভাষণের অংশ বিশেষ জানাতে বলা রীতিবিরুদ্ধ। সভায় গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল। উভয় দলের

প্রধান ব্যক্তিগণের শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হল। পুলিশে খবর দেওয়ায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সভামণ্ডপে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে নিয়ে সভাপতির আসনের পার্শ্বে বসিয়ে একটি দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা করা হল। পুলিশ সুপার ঘোষণা করলেন যে তিনি আইনের সাহায্যে সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় দলের চীৎকারে সভামণ্ডপ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সভাপতির অভিভাষণ শেষ হলে নিম্নলিখিতভাবে বিষয় নির্ধারণী উপসমিতি গঠিত হল ঃ—মেদিনীপুর শহর থেকে পনের জন, দাঁতনের দুই জন, গড়বেতার তিন জন, ঘাটালের দশ জন, তমলুকের দশ জন এবং কাঁথীর দশ জন।

প্রথম দিনেব অধিবেশন শেষ হলে চরমপন্থীরা ঐ দিন রাত্রে ও পরদিন সকালে উকিল ত্রৈলোক্যনাথ পালের বাড়ীতে সমবেত হয়ে আলোচনা সভা করলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব কবেন মৌলভি আবদুল হক্। তাঁরই সভাপতিত্বে প্রকাশ্য সভা হয় সন্ধ্যায়—চন্দ্রাকর পুষ্করিণী সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ললিতমোহন ঘোষাল, শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর নন্দ, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চরমপন্থীগণ এই সভাগুলিতে যোগ দিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রকাশ্য সম্মেলনে চরমপন্থীরা কেউ যোগ দিলেন না।

মেদিনীপুবের সম্মেলনে নরম ও চরম পন্থীগণের মধ্যে যে মতভেদ ও বিচ্ছেদ তীব্রভাবে প্রকাশ পেল—তারই চরম অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে। বলা বাহুল্য মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলের মধ্যে উল্লিখিত সম্মেলনের ঘটনাবলী গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী তাঁর "Nation in Making" পুস্তকে (৬৬৩ পৃষ্ঠা) লিখেছেন যে "About the same time, almost on the same date (৬ই ডিসেম্বর) this attempt (ফ্রেজারের প্রাণ নাশের চেষ্টা) was made, the district Conference that met at Midnapore was sought to be wrecked and by

some of these men upon whom there was a strong suspicion of being associated with anarchical movement."

অর্থাৎ যারা ফ্রেজার বধের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু লোক মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়ার মধ্যে ছিলেন।

কিংস্‌ফোর্ড : সুশীলের বেত্র দণ্ডাদেশ

১৯০৭ সালে বিশেষ ভাবে বঙ্গের চরমপন্থীদের উপর সরকারের নজর পড়ে। এই সময়কার ঘটনাবলীর বিষয় যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "মুক্তির সন্ধানে ভারত" পুস্তক থেকে আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করা হল। "যুগান্তর" (পত্রিকা) চরমপন্থীদেরও অগ্রণী, কাজেই এর উপর প্রথম নজর পড়ল সরকারের। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সর্ব প্রথম ধৃত হলেন ও কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারে ২০শে জুলাই এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুদ্রাকরের দণ্ড হল দু বছর। বিবেকানন্দ-ভূপেন্দ্রের জননীকে কলকাতার নারী সমাজ প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করলেন। প্রগতিবাদী 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যার' উপরও সরকার সমান চটা। 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদকরূপে সরকার অরবিন্দ ঘোষ ও 'সন্ধ্যার' সম্পাদক রূপে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধৃত হন। এ দুই জনের মোকদ্দমার বিশেষ নূতনত্ব ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দের সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। এইজন্য আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তিনি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিপিনচন্দ্রের বিচারের দিন আদালতে বিস্তর জনসমাগম হয়েছিল। তখন ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে হাঙ্গামা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড সুশীল সেন নামক একটি কিশোর ছাত্রকে চৌদ্দ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন"।

'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবকেও এই সময় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিচারও মিঃ কিংসফোর্ডের এজলাসে নিষ্পন্ন হয়। তাঁর রূঢ় ব্যবহারে লোকে অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। কিশোর বালক সুশীলের উপর

নির্মম বেত্রাঘাত কিংসফোর্ডের প্রতি বিপ্লবীদের মনকে বিষিয়ে তুলে ছিল। কিন্তু তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সরকার কিংসফোর্ডকে বদলি করে দিলেন মজঃফরপুরে—সেখানকার দায়রা ও সেশন্ জজ্ রূপে।

কলিকাতার সহিত হেমচন্দ্রের যোগাযোগ

মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের সঙ্গে কলিকাতার বিপ্লবীদের যোগাযোগ ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবীরা অস্ত্র সমস্যা সমাধানের উপায় গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন। মেদিনীপুরের অন্যতম বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র কানুনগো বিদেশে বিস্ফোরণবিদ্যা ও বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারিসে গিয়েছিলেন যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

তাঁর ইউরোপ যাত্রা সম্বন্ধে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ" পুস্তকে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ৪৮৪) "হেমচন্দ্র কানুনগো ১৯০৬ সালের ১৬ই আগষ্ট ইউরোপে যাত্রা করেন। তিনি ফুলারবধের জন্য নিযুক্ত হইয়া শিলং প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া গলদঘর্ম হইয়াছিলেন। 'যুগান্তর' তখন সাবমাত্র পাঁচমাস অতিক্রম করিয়াছে। আর 'বন্দেমাতরম্' মাত্র এক সপ্তাহ (৭ই আগষ্ট ১৯০৬) হয় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। যুগান্তর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই ভারতের বাহিরে প্রচার হইয়া গিয়াছে। 'জাষ্টিস্' "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজী," "গেলিক্ আমেরিকা'র সহিত যুগান্তরের আদান প্রদান চলিতেছে"। যুগান্তরের পক্ষ হ'তে হেমচন্দ্র এই তিনটি পত্রিকার তিনজন সম্পাদকের নামে তিনখানি পরিচয়পত্র পেয়ে বড়ই ধন্য হয়ে ইউরোপ যাত্রা করলেন। প্যারিসে পৌছে তাঁকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেখানে প্রথমে তাঁর সাহায্যকারী ব্যক্তির সংখ্যা কমই ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের পর তিনি বিস্ফোরণবিদ্যা ও বোমা প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হন। আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী পূর্ণচন্দ্র সেন লিখিত তাঁর জীবনীতে এই বিবরণগুলি প্রাঞ্জল

ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্যারিস বাসকালে জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা ও পতাকা উড্ডীন করা হেমচন্দ্রের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভারতে ফিরে এসে হেমচন্দ্র প্রধানতঃ বোমা প্রস্তুত কার্যেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং মুরারীপুকুরের বিপ্লবী দলের সঙ্গেই কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এই সময় মেদিনীপুরের সঙ্গে তাঁব যোগাযোগেব কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

কিংসফোর্ডেব হত্যার চেষ্টাতে হেমচন্দ্রের প্রস্তুত বোমাই ব্যবহৃত হয়েছিল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ঐ বোমা নিয়ে মজঃফরপুব গিয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের প্রস্তুত এই প্রাণঘাতী বোমার নাম উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব দিয়েছিলেন—"কালীমায়ীর বোমা"।

হেমচন্দ্রের গ্রেপ্তার ও বিচার

২রা মে ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুরেব বিপ্লবী দলের গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি ৮নং নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তাবের পূর্বেই বোধ হয় তিনি বোমার কারখানার যন্ত্রাদি ও মালমশলা সরিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন।

তারপর সেশান আদালতে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং হাইকোর্টের বিচারে ঐ রায় বহাল থাকে। অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্রের ইহাই ছিল যোগ্য পুরস্কার।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তাঁর "স্রোতের তৃণ" পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১২৮-২৯) লিখেছেন—"তাঁর (হেমচন্দ্রের) দ্বীপান্তরের হুকুমের দিন তিনি নিম্নের গানটি রচনা করে আলিপুর জজ্ কোর্টে গেয়েছিলেন ঃ—

বিদায় লইয়া আজি যেতেছি চলিয়া ভাই,
কার্যক্ষেত্রে শিশু মোবা ক্ষম যত দোষ তাই।
ভারতের ছবি আঁকি—যতনে হৃদয় রাখি,
কারাগারে দ্বীপান্তরে পূজিব যেখানে যাই।
স্বাধীনতা তুষানলে জ্বলেছে এবে কেবল,
মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা আত্মাহুতি দিতে চাই।

ভারত উদ্ধার ব্রতে ভুলিব না দীক্ষা দিতে,
বনের বিহগ ডেকে যদি না মানুষ পাই।
বাধা দিতে হেন কাজে বিধি যদি আসে নিজে,
নির্ভয়ে বলিব তাকে হেন বিধি নাই চাই।”

হেমচন্দ্রের বিপ্লবী জীবন এইভাবে ধন্য হয়েছিল। হেমচন্দ্র তাঁর 'বাংলাব বিপ্লব প্রচেষ্টা' পুস্তকে বিপ্লবী জীবনে নানা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে অগ্রণী বিপ্লবীদের মতপার্থক্য খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু তাঁর মত একজন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবীর মতামত ও উক্তি সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা হওয়া উচিত। মেদিনীপুরের এই বিপ্লবী বীর দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের একজন অগ্রদূত ছিলেন। বঙ্গে এঁরা (জ্ঞানেন্দ্র, হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্র,) যে সময় বিপ্লবপন্থা গ্রহণ করে দেশে বৃটিশ রাজত্বের অবসান ও স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন এবং সেজন্য আয়োজন আরম্ভ করেছিলেন— (১৯০২) সে সময় বিপ্লবের সর্বাত্মক অগ্নিগর্ভ রূপের কল্পনাও অনেকের মনে স্থান পায়নি।

এই মহৎ জীবন সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র সেনের রচনা উল্লেখ ক'রে হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গের উপসংহার করা হল।

হেমচন্দ্রের জীবন কথা
(১৮৭১—১৯৫১)

হেমচন্দ্র কানুনগো বাংলার গোপন বিপ্লবী সংগঠনের একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন এবং অরবিন্দের সঙ্গে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯০৮) অন্যতম আসামী ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল অদ্ভুত কর্মময়। তাঁর জন্ম হয়েছিল মেদিনীপুরে সুদূর একটি গ্রামে—একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে এবং সেখান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। কৈশোর থেকে তিনি বিপ্লবী ছিলেন। অভিভাবকগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কলিকাতায় এসে ক্যাম্বেল স্কুলে

(বর্তমান স্যার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল)-এ ভর্তি হন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর চিকিৎসা শিক্ষা আর ভাল লাগল না। তিনি এখানকার পড়া ছেড়ে চিত্রশিল্পী হিসাবে শিক্ষিত হবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা Art (আর্ট) স্কুলে ভর্তি হন। বাল্যকাল থেকে চিত্রবিদ্যার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। এখানেও তিনি শেষপর্যন্ত পড়াশুনা চালাননি। তিনি মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে চিত্রবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে এবং ঐ কলেজের রসায়নের ডিমনস্ট্রেটর (Dimonstrator) হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেন। শিক্ষাদান কর্মে আশক্তিহীন হয়ে চিত্রবিদ্যাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন কিন্তু এই কার্যে যথেষ্ট আয় না হওয়ায় তিনি মেদিনীপুর জেলা বোর্ডে পাউণ্ড ইনস্পেক্টর (Pound Inspector) এর কাজ গ্রহণ করেন।

তিনি প্রথমে গোপন বিপ্লব আন্দোলনের (১৯০২ সালে) প্রতি আকৃষ্ট হন। ঋষি রাজনারায়ণের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অরবিন্দের মাতুল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তাঁকে অরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ পূর্বেই মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। পরে ইহা বারীন্দ্র ঘোষের কলিকাতা সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন কালেক্টরীতে একজন কেরাণী। অলিপুর বোমার ষড়যন্ত্র মামলায় একরারী আসামী নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য সত্যেনের ফাঁসী হয়েছিল। এঁদের সংস্থা বঙ্গ বিভাগ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি। বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের পূর্বে হেমচন্দ্র তাঁর মাতুলের প্রাসাদতুল্য গৃহে বাস করতেন এবং এই গৃহ স্বদেশী যুবকগণের মিলনস্থান হয়ে উঠেছিল। ইহার পশ্চাৎদিকের বৃহৎ বাগিচা গোপন ভাবে এইসব যুবকদের মধ্যে বাছাই কতকগুলি ব্যক্তির আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষার স্থান রূপে ব্যবহার করা হত।

যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে এবং বৃটিশ রাজ্যের অত্যাচার ও (১৯০৬) চরমে ওঠে তখন কলিকাতায় কতকগুলি গুপ্তসংস্থা নির্যাতনকারী ইউরোপীয় কর্মচারী হত্যার কথা চিন্তা করেছিলেন। হেমচন্দ্র তখন বিবাহিত ব্যক্তি তথাপি এই কার্যে তিনি ইতস্তত না করে অগ্রসর হয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের জীবননাশের চেষ্টা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হল। হেমচন্দ্র কল্পনাপ্রবণ বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলের কাজের লোক। উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতীত এইরূপ কার্যের চেষ্টায় ব্যর্থতা তিনি খুব বুঝতেন। এই কারণে তিনি ইউরোপ গিয়ে সেখানকার গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতিগুলির কর্মকৌশল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য এবং গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে বেখে তিনি একক বন্ধুহীন ভাবে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ সামান্য অর্থ নিয়ে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে ইউরোপ যাত্রা করলেন। প্যারিসে পৌছে তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক সংস্থাব সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এতে তাঁর সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হয়ে যায়। তখন তিনি শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করেন এবং তাঁর উপদেশ মত লণ্ডন গমন করেন। শ্যামজী ভারতীয় ছাত্রগণের বাসের যে "ইণ্ডিয়া হাউস" স্থাপন কবেছিলেন তাতে তিনি কিছুকাল একাধারে পাচক ও ম্যানেজারের কাজ করতে থাকেন। পরে একজন ভারতীয় স্বর্ণব্যবসায়ীর সাহায্যে হেমচন্দ্র তাঁর বাসভবনে একটি গুপ্ত রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারীর উপায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পুলিশের নজরে পড়ায় একজন ফরাসী ঐতিহাসিকের উপদেশক্রমে তিনি পুনরায় প্যারিসে ফিরে যান। সেখানে প্যারিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং দেশভক্ত পরোপকারী ভারতীয় এস, আর, রাণে নামক একজন স্বর্ণব্যবসায়ীর নিকট সাহায্য লাভ করেন। রাণেজী

হেমচন্দ্রকে ম্যাডাম কামার সঙ্গে পরিচিত করে দেন। ম্যাডাম কামা সেই সময় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন যথার্থ সহায়ক ব্যক্তি বলে ইউরোপের বিপ্লবী সমাজে পরিচিত ছিলেন। হেমচন্দ্র ম্যাডাম কামা এবং একজন ফরাসী ঐতিহাসিকের সাহায্যে অবশেষে একটি ফরাসী গুপ্ত সমাজবাদী সংস্থার বিশিষ্ট সদস্যদের বিশ্বাস-ভাজন হয়েছিলেন। তাঁরা হেমচন্দ্র ও অপর দুইজন ভারতীয়কে তাঁদের সংস্থার কর্মপদ্ধতি এবং বিস্ফোরণ পদার্থের দ্বারা বোমা প্রস্তুতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য সাহায্য করেছিলেন।

হেমচন্দ্র এইরূপ জ্ঞানলাভ করে ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে (১৯০৭ সালের শেষভাগ ?) ভারতে ফিরে আসেন—ইউরোপীয় গুপ্ত সংস্থাগুলির অনুকরণে সংস্থা গড়ার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। বারীন্দ্র-নাথের সহিত তাঁর মতভেদ থাকলেও তিনি তাঁর সহিত যুক্ত হলেন এবং তাঁর প্রস্তুত একটি বোমা চন্দননগরের ফরাসী মেয়রের প্রতি নিক্ষিপ্ত হল কিন্তু তাতে তাঁর শরীরের কোন ক্ষতি হয়নি। বঙ্গের বিপ্লবীগণের দ্বারা চন্দননগরের পথে অস্ত্রশস্ত্রের গোপন আমদানী বাধা দিবার জন্য বৃটিশ গর্ভরমেণ্টের সঙ্গে চন্দননগরের ফরাসী মেয়রের যোগ ছিল, এইরূপ সন্দেহ করা হত। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের নিকট অপর একটি বোমা (পুস্তকাকৃতি) পাঠান হয়েছিল। একটি বড় আকারের পুস্তকের পাতাগুলি কেটে এই বোমাটি ঠিকমত প্যাক করা হয়েছিল এবং একটি স্প্রিংএর ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে ছিল কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে প্যাকেটটি না খোলা অবস্থায় কিংসফোর্ডের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর মধ্যে রাখা হয়েছিল। মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর কলিকাতাতে বারীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিপ্লবীর বিবৃতির অনুসরণে এই বোমাটি আবিস্কৃত হয়। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড পনের বৎসর বয়স্ক কিশোরকে বেত্রাঘাত দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। অরবিন্দ তাঁর ইংরাজী দৈনিক পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়েছিলেন। ঐ মামলা

শুনানীর সময় সুশীল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করেছিল। কিংসফোর্ড বিপ্লবীদলের মুখপত্র 'যুগান্তর' বাংলা ভাষায় প্রচারিত একটি প্রবন্ধের জন্য পত্রিকার সম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথ দত্তকে এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এইসব ঘটনার জন্য দেশপ্রেমিক চরমপন্থীগণের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল।

কিংসফোর্ড কলিকাতা হতে মজঃফরপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ্ পদে বদলি হন। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি তাঁর গাড়ী মনে করে অন্য একটি গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে গাড়ীর দুইজন আরোহী শ্রীমতী কেনেডী ও কুমারী কেনেডীর জীবন-নাশ ঘটে (১৯০৮ সাল ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যা।) পরেরদিন সমস্তিপুর স্টেশনে পুলিশ প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করে এবং তিনি নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম একটি পথপার্শ্বে অবস্থিত ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হন। পরের দিন (২রা মে ১৯০৮) প্রত্যুষে পুলিশ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী ক'রে অরবিন্দ, হেমচন্দ্র, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করেন। বারীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত এবং আরও ১১জন মুরারি পুকুর বাগানে ধরা পড়েন। উঁহাদের সকলকে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারের জন্য পাঠান হয়।

সেশন্স কোর্টে বিচার চলাকালীন এঁদের আলীপুর সেণ্ট্রাল (এখন প্রেসিডেন্সি) জেলে রাখা হয়েছিল। সেই সময় হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ স্থির করেন যে এই ষড়যন্ত্র মামলার একটি একরারী আসামী নরেন গোস্বামী আরও অধিক ক্ষতি করার পূর্বেই তাঁকে পৃথিবীথেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ঐ সময় তাঁরা দুটি পৃথক ওয়ার্ডে ছিলেন। এই ব্যাপারে যে রিভলভার দুইটি ব্যবহার করা হয় সেগুলি বারীন্দ্রের জেল হতে পলায়ন চেষ্টার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে গোপনে জেলের মধ্যে আনা হয়েছিল। ঐগুলি হেমচন্দ্রের হেপাজতে রাখা হয়েছিল। হেমচন্দ্র বারীন্দ্রকে না জানিয়ে কানাইলালের মারফত ঐগুলিকে সত্যেন্দ্রের নিকট চালান করে দিয়েছিলেন।

১৯২১ সালে মণ্টেগুচেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর আন্দামানে দ্বীপান্তরীত বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র এবং অন্যান্য যারা ষড়যন্ত্র মামলাতে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁরা খালাস হন। মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরলেন বটে, কিন্তু ফিরলেন বিশ্বনিন্দুকের মনোভাব নিয়ে। মেদিনীপুরে এসে তাঁর পূর্বসাথী বিপ্লবী বন্ধুগণের এবং গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের তীব্র সমালোচক হয়ে দাঁড়ান। তিনি কলিকাতায় কিছুদিন থেকে চিত্রশিল্পী হিসাবে কাজকরেন এবং এম, এন, রায় প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিকে সমর্থন করতে থাকেন। পরে তিনি তাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুর চলে আসেন এবং তাঁর জীবনের শেষাংশ সেখানে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনাই। তিনি নীরবে জীবনকাটান কিন্তু তাঁর পারিবারিক জীবন তেমন সুখের ছিল না।

ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপ

লাল বাজারের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ্‌প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কিংসফোর্ডের বিপ্লবীদমনে বদ্ধপরিকর, প্রতিহিংসা পবায়ণ নৃশংস মনোভাব যেভাবে যুগান্তরের মুদ্রাকরদের দণ্ডবিধান করেছিল এবং সুশীল সেনের ন্যায় একজন কিশোর বালককে বেত্রদণ্ডের শাস্তি দিয়েছিল তাতে তার শাস্তিবিধান অনিবার্য হয়ে উঠল। কিংসফোর্ডের খিদিরপুর বাসভবনে বৃহৎ একখানি পুস্তকের মধ্যে গর্ত্ত সৃষ্টি করে যে বোমা পাঠান হয়েছিল—বইখানি না খোলার জন্য তাহার বিস্ফোরণ হয়নি; কিংসফোর্ডের প্রাণও বেঁচে গিয়েছিল। বিপ্লবীদের উচ্চমহলে স্থির হয়েছিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মজঃফরপুর গিয়ে বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডের প্রাণনাশ করবে।

ক্ষুদিরাম ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের হাতে গড়া মানুষ। তাঁর মনোবল, দৃঢ়সংকল্প, সাহস, অকুতোভয়তা প্রভৃতি গুণের পরিচয় প্রধান বিপ্লবীদের মধ্যে সুবিদিত ছিল। প্রফুল্ল ছিলেন বারীন্দ্রের প্রিয় অনুচর। ইনিও ছিলেন একজন সুখ্যাত বিপ্লবী তরুণ।

এই ঘটনা তারিণীশংকর চক্রবর্ত্তীর 'বিপ্লবী বাংলা' পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৬২) নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ—

"কিংসফোর্ডের মৃত্যু না ঘটাতে কর্তব্যস্থির করার জন্য এক বৈঠক বসে এবং তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ ও চারু দত্তের নির্দেশে* স্থির হয় যে মজঃফরপুরে বিপ্লবী প্রেরণ করিয়া কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে হইবে। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্রের সুপারিশে ক্ষুদিরাম বসুকে বারীন্দ্রের প্রিয় অনুচর প্রফুল্ল চাকীর সহিত এই কার্যের জন্য মজঃফরপুরে প্রেরণ করা স্থির হল। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কেহ কাহাকেও চিনিত না। ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর হইতে আনিয়া প্রফুল্লকে দেখাইয়া বলা হয় ইঁহার নাম দীনেশ চন্দ্র রায় বাঁকুড়ার একজন কর্মী, ক্ষুদিরামকে হবেন সরকার নামে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। সাবধানতার জন্যই এইরূপ করা হয়। অরবিন্দ কিংসফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিলেন কিনা সন্দেহ হওয়ায় বারীন্দ্র বলেছিলেন তিনি মেজদা অরবিন্দের সম্মতি ব্যতীত ঐ কার্যে অগ্রসর হতেন না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্ষুদিরাম সে সময় ছিলেন কাঁথী মহকুমার ভগবানপুর থানার কিশোরপুর গ্রামে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আশুতোষ দের বাড়ীতে। সেখানে তাঁর নিকট চলে আসার সংবাদ পৌঁছাতে তিনি বোধহয় বুঝেছিলেন এটি একটি চরম আহ্বান। আশুবাবুদের একখানি সিল্কের চাদর তাঁর কাঁধে এবং একখানি ছড়ি তাঁর হাতে দেওয়া হয়। এই দুটি উপহারে ভূষিত হয়ে তিনি স্থানীয় সহকর্মীদের মধ্য থেকে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হলেন।

কিংসফোর্ডের হত্যার জন্য নির্বাচিত দুটি যুবক ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী যে ভাবে মজঃফরপুরে এসে কাজ করেছিলেন তার একটি বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল, ২২, ৪, ৭৯ তারিখে যুগান্তর পত্রিকাতে "ক্ষুদিরামের উকীলের ডায়েরী থেকে" নামক প্রবন্ধে এই বর্ণনাটি

---

* শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক এবং চারুচন্দ্র দত্ত এই তিনজন কিংসফোর্ডকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ—গিরিজা শংকর রায় (পৃষ্ঠা ৪২৯)।

দেওয়া হয়েছে। মজঃফরপুরে বিশিষ্ট আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ বসু আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁর ডায়েরী থেকে তথ্যগুলি পাওয়া গিয়েছিল।

পরের দিন উপেন বাবু কাছারিতে এসে শুনলেন গতকাল রাত্রে জজ্ কিংসফোর্ডের গাড়ীতে কারা বোমা ফেলে পালিয়ে গেছে। গাড়ীটা অবশ্য কিংসফোর্ডের ছিলনা। ঐ গাড়ীতে ছিলেন উপেন বাবুদেরই বন্ধু আইনজীবী কেনেডির স্ত্রী ও মেয়ে। এঁরা উভয়েই মারা গেছেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন বাংলোর গেটের কাছে রাস্তার উপর একটা জায়গা ঘিরে জনা কয়েক পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় জমাটবাঁধা রক্ত। জজ্ কিংসফোর্ড আর কেনেডির গাড়ী ছিল দেখ্‌তে একরকম, হত্যাকারীরা ভুল ক'রে কেনেডির গাড়ীতেই বোমা ছুঁড়েছে। সেদিন কেনেডি পরিবারের মৃত্যুতে জজ সাহেব কাছারি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

পরের দিন শোনা গেল মজঃফরপুর থেকে ২৪ মাইল দূরে ওয়াইনী (অধুনা ওয়েস) ষ্টেশনে একটি বাঙালী ছেলে ধরা পড়েছে। পুলিশ তাকে মজঃফরপুরে নিয়ে এসেছে। উপেনবাবু ষ্টেশনে গিয়ে শুনলেন ছেলেটিকে সাহেবদের ক্লাব হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট তার জবানবন্দী নিচ্ছেন।

২রা মে সকালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উড্‌ম্যান বাঙালী উকিলদের তাঁর এজলাসে ডেকে পাঠালেন। শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরকারী উকীল। তিনিও গেলেন উপেনবাবুদের সংগে। ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গিয়ে তাঁরা দেখলেন ১৫।১৬ বছরের একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে। চমৎকার চেহারা গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, মুখখানা ভালবাসা মাখান। চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল। কাঠগড়ার এক পাশে পুলিশের লোকেরা কলাপাতায় কিছু মিষ্টি ও এক ঘটি জল রেখে গেল। ছেলেটি সে সব স্পর্শও করল না। উড্‌ম্যান সাহেব ছেলেটির বর্ণনা পড়ে শোনালেন। নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাড়ী মেদিনীপুর। উকীল মোক্তারেরা এক মনে বর্ণনা শুনলেন।

হঠাৎ শিববাবুর নামে একটা টেলিগ্রাম এল। শিববাবুর নাতি নন্দলাল ছিল পুলিশের সাবইন্সপেকটার। দিন কয়েকের ছুটিতে দাতুর কাছে এসে থাকার পর কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে। রাস্তায় ট্রেনে একটা ছেলেকে দেখে কেমন সন্দেহ হওয়ায় দাতুকে টেলিগ্রাম করে জানতে চেয়েছে যে ছুটিতে থাকার সময়ে সে ঐ ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করতে পারে কিনা। মিঃ উড্‌ম্যান সব কথা শুনে বললেন—"এক্ষুণি ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করা হোক।"

ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও বিচার

মামলা চলার সময় ক্ষুদিরাম তাঁর উকীল উপেনবাবুব কাছে বলেছিল—তারা তুইজনে বোমা ফেলার পর রেলের রাস্তা ধরে সমস্তিপুরের দিকে যেতে থাকে। সকালে পুলিশ স্টেশনের কাছে একটা আমবাগানে তুইজনে গিয়ে লুকালো। ওদিকে সেই রাতেই পুলিশের লোক পাঠান হয়েছিল প্রতিটি রেল ষ্টেশনে—সাদা পোশাকে পুলিশ ঘুরছিল। আমবাগানে ক্ষিদের তাড়নায় প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে পাঠিয়েছিল স্টেশনের কাছাকাছি দোকান থেকে মুড়ি আনতে।

প্রফুল্লের আত্মবলিদান

ক্ষুদিরাম এই ঘটনা সম্পর্কে উপেনবাবুর কাছে বলেছিল—"আমি হিন্দী জানতাম না; দোকানে গিয়ে বললুম "এই মুড়ি দে"। অমনি পাশের একটা লোক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরল। লোকটা পুলিশের সিপাহী। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, যদি গলা শুনে প্রফুল্ল আসে এই আশায় কিন্তু প্রফুল্ল এলনা। ওদিকে আম বাগানে অপেক্ষা করে প্রফুল্ল বুঝতে পারল—নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে হয়ত ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে। এই রকম ভেবে সে সমস্তিপুরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তুপুর নাগাদ একজন বাঙালী রেল কর্মচারীর দৃষ্টি তার উপর পড়ল। ইতিমধ্যে বোমা ফাটার কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বাঙালী ভদ্রলোক ছেলেটিকে বাঙালী বিপ্লবী মনে করে বাড়ীতে নিয়ে খাওয়ালেন। দোকান থেকে নুতন জামা কাপড়, জুতা কিনে দিলেন এবং রাতের

ট্রেনে কলিকাতার টিকিট কেটে উঠিয়ে দিলেন। যে কামরাতে প্রফুল্ল উঠেছিল দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই কামরাতেই পুলিশের দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও উঠেছিল এবং প্রফুল্লকে নজর রেখেছিল। সকালে মোকামাঘাটে স্টিমারে নদী পার হওয়ার পর নন্দলাল কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবলের সাহায্যে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করল। প্রফুল্ল রিভলভারের গুলি ছুঁড়ল কিন্তু নন্দলাল মাথা নিচু করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল। প্রফুল্ল 'প্রাণ দিব তবু ধরা দিব না' এই শপথ রক্ষা করল; নিজের রিভলভার কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। রক্তের নদী বয়ে গেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মের উপর। পুলিশ এসে শহীদ প্রফুল্লের ছবি তুলে নিয়ে গেল এবং তার ছিন্ন মাথাটি নিয়ে মজঃফরপুরে হাজির করল ক্ষুদিরামকে দিয়ে সনাক্ত করবার জন্য।

ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে নিক্ষিপ্ত হল। ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ক্ষুদিরামের প্রাথমিক বিচার হল। তার পক্ষ সমর্থন করলেন উকীল উপেন্দ্র নাথ বসু ও অন্য কয়েকজন উকীল। তাঁদের নেতৃত্ব দিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী কালিদাস বসু।

দায়রা আদালতে ক্ষুদিরামের বিচারক ছিলেন প্রবীণ আই. সি. এস. জজ্ কার্ণডফ্। রায়ের দিন এজলাসে আর লোক ধরে না। রায় হল ক্ষুদিরামের মৃত্যু দণ্ড। আদেশ শুনে সে একটু হাসলো। তারপর নিষ্পাপ কণ্ঠে জজ্‌কে বলল—'একটা কাগজ পেন্সিল দিন, আমি বোমার চেহারাটা এঁকে দেখাই। অনেকের ধারণা নেই জিনিষটা কি রকম।' জজ্ ক্ষুদিরামের অনুরোধ রাখলেন না। তখন বিরক্ত হয়ে ক্ষুদিরাম পাশের কনেষ্টবলকে ধাক্কা দিয়ে বললে "চল বাইরে।"

এরপর ক্ষুদিরামের উকীলরা হাইকোর্টে আপীল করলেন—যদি মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এই আশায়। জেলে গিয়ে উপেনবাবু ক্ষুদিরামকে এই কথা জানাতেই সে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, "এ হতেই পারে না। চির জীবন জেলে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল।" কালিদাস বাবু বললেন দেখ, দেশে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যাতে

তোমাকে বেশী দিন জেলে থাকতে নাও হতে পারে। অনেক বোঝানোর পর ক্ষুদিরাম রাজি হল। কলিকাতা হাইকোর্টের আপীলে প্রবীণ আইনজীবী নরেন্দ্রকুমার বসু ক্ষুদিরামের সমর্থনে যে সব কথা বলেছিলেন তা অবিস্মরণীয়, কিন্তু কোন ফল হল না। ফাঁসীর হুকুম বহাল রইলো। কালিদাস বাবু শেষ চেষ্টা করলেন, ক্ষুদিরামকে দিয়ে বড়লাটের কাছে আবেদন করালেন; তাতেও ব্রিটিশ সিংহের মন ভিজলো না।

বিচারের শেষে উকীল সতীশবাবু জজের অনুমতি নিয়ে ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার কাউকে দেখতে ইচ্ছা হয়? ক্ষুদিরাম—হাঁ হয়। আমার ফাঁসীর আগে বড় সাধ হয় আমার জন্মভূমি মেদিনীপুরকে একবার দেখি। আর আমার দিদি ও তার ছেলে পুলেদের দেখতেও ইচ্ছা হয়।

আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মনে কোন দুঃখ বা আপশোষ আছে?

ক্ষুদিরাম বললে—বিন্দুমাত্র না।

প্রশ্ন—তোমার মনে কোন ভয় হয় কি?

বিস্মিত হয়ে ক্ষুদিরাম উত্তর দিয়েছিলো,—ভয়? কিসের ভয়। আমি কি গীতা পড়িনি?

সতীশবাবু—আমরা তোমাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছি, তুমি কেন নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করলে?

ততোধিক বিস্মিত হয়ে স্থির কণ্ঠে তরুণ কিশোর জবাব দিল—কেন স্বীকার করবো না?

১৩ই জুন ক্ষুদিরামকে তার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার কথা জানান হয়। সে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শুনে বলে উঠ্লো "বন্দেমাতরম্"।

ক্ষুদিরাম তার দণ্ড সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে—ক্ষুদিরাম হেসে ওঠে ও হাসি মুখেই বলে—হ্যাঁ সে সব বুঝেছে।

হাইকোর্টের আপীল শেষ হল ১৩ই জুলাই, ক্ষুদিরামের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞাই বহাল থাকল।

উপেনবাবুর ডায়েরীর শেষাংশ নিম্নরূপ ঃ—"ফাঁসীর দিন ধার্য হল ১১ই আগস্ট। উপেনবাবুরা দরখাস্ত দিলেন যে ফাঁসীর সময় তাঁরা উপস্থিত থাকবেন; আর ক্ষুদিরামের দেহ হিন্দুমতে সৎকার করবেন। উড্‌ম্যান সাহেব আদেশ দিলেন ফাঁসীর সময় মাত্র দুইজন বাঙ্গালী উপস্থিত থাকতে পারবেন। শব বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বারো জন আর শবানুগমনে বারো জন থাকবেন। কর্তৃপক্ষ যে রাস্তা ঠিক করে দিবেন—সেই রাস্তা দিয়ে শ্মশানে যেতে হবে। ফাঁসীর সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি পেলেন উপেনবাবু আর ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেনবাবু তাঁর গাড়ীতে একটা বাঁশের খাটিয়া তৈয়ারী করিয়ে তাঁর মাথার দিকে বাঁশের গায়ে ছুরি দিয়ে "বন্দেমাতরম্" লিখে দিলেন।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি

ভোর ছয়টায় ফাঁসি হবে। পাঁচটার সময় উপেনবাবু গাড়ীতে সেই খাটিয়া আর সৎকারের জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হলেন—জেল ফটকে। অত ভোরেও কাছাকাছি রাস্তা-ঘাটে লোক উপচে পড়ছে। বহু লোক ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপেনবাবু আর ক্ষেত্রনাথবাবু জেলের ভিতরে ঢুকলেন, খানিকটা এগিয়ে দেখলেন—ডানদিকে প্রায় ১৫ ফুট উচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুইদিকে দুটো খুঁটি মাঝখানে লোহার রড। রডের মাঝখানে বাঁধা একগাছা দড়ি তার শেষ প্রান্তে ফাঁসি। ক্ষুদিরাম আসছে অবিচল পদক্ষেপে। পেছনে চারজন পুলিশ। উপেনবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো ক্ষুদিরাম—সমুদ্রের মত গভীর তার চোখ কিন্তু তাতে আগুনের দীপ্তি। স্নান করে এসেছিল। আর একবার উকীলদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। মঞ্চের উপর ওর হাত দু-খানা পেছনের দিকে এনে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল।

একটা সবুজ রংয়ের পাতলা টুপি দিয়ে মুখ থেকে গলা পর্য্যন্ত ঢেকে দেওয়া হল। তারপর ফাঁসি লাগান হল গলায়। ক্ষুদিরাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। একটুও নড়ল না। উড্‌ম্যান ঘড়ি দেখে রুমাল উড়িয়ে দিলেন। একজন প্রহরী মঞ্চের একপ্রান্তে একটা হ্যাণ্ডেল টেনে দিল। ক্ষুদিরামের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল নীচের দিকে, শুধু উপরের দড়িটা কয়েক সেকেণ্ড ধরে নড়তে লাগল। ক্ষেত্রবাবু, উপেনবাবু মুখ ঢাকলেন দুই হাত দিয়ে। তারপর জেলের বাইরে এলেন। আধঘণ্টা পরে জেলের দুইজন বাঙালী ডাক্তার বাইরে এসে খাটিয়া আর নূতন কাপড় নিয়ে গেলেন। নূতন কাপড় পরিয়ে ডাক্তারেরা খাটিয়ায় ক্ষুদিরামকে শুইয়ে উকীলদের কাছে দিয়ে গেলেন। শবযাত্রা চলল বিলিতি সরকারের নির্দিষ্ট পথ দিয়ে। রাস্তার দুপাশে খানিক দূরে পুলিশ। তাঁদের পেছনে অগণ্য মানুষের ভীড়। অনেকে ফুল দিয়ে গেল—ক্ষুদিরামের দেহের উপর। শ্মশানে পুলিশ পাহারা।

চিতায় উঠানোর আগে স্নান করাবার সময় উপেনবাবুরা ক্ষুদিরামের মৃতদেহ বসাতে গিয়ে দেখলেন—মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। মুখে কিন্তু তখনও সেই সরল হাসি। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পরম পরিতৃপ্তি ক্ষুদিরামের সমস্ত মুখটাকে ঘিরে রয়েছে। চিতা জ্বলে উঠল। ক্ষুদিরাম শহীদ হয়ে যাত্রা করলেন অমৃতলোকের পথে।

বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হতে লাগল কোন এক অজ্ঞাত পল্লী কবির গান :—

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।
ওমা, কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইনের ধারে,
ওমা, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ইংলণ্ডবাসী।

হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা ?
ওমা, রক্ত মাংস এক করিতাম
দেখত ভারতবাসী।
থাকত যদি টাট্টু ঘোড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়ত ধরা ?
ওমা, এক চাবুকে চলে যেতাম
গয়া গঙ্গা কাশী।
শনিবার দিন দশটা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা,
ওমা, অভিরামের দ্বীপ চালানা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
ওমা মনের দুঃখ রইলো মনে
আমার হল না স্বদেশী,
কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি
পরো না মা বিলাতী শাড়ী,
এ মিনতি করি মাগো,
ভুলোনা স্বদেশী।
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসির ঘরে,
চিনতে যদি না পারিস মা
দেখিস গলায় ফাঁসি।"

মজঃফরপুরে বোমার ঘটনা সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন (বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ পৃষ্ঠা ১২৬)

"কেবল দুঃখ বা শোক নহে, প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম যে বোমা ছুঁড়িয়াছিলেন তাহা কেবল মজঃফরপুরে নহে সমস্ত বঙ্গদেশে তথা

ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া দেশের জড় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

"তোবা প্রাণ খুলে বল 'বন্দেমাতরম্'।
তোদের ঘুমের নেশা ভাঙ্গিয়ে দিলে
ক্ষুদিরামের একটি বোম্॥
তোবা শক্তি মায়েব শক্ত ছেলে
তোদের জোড়া কোথায় মেলে?
তোরা মা অভয়ার অভয় পেলি
তোরা নয়রে ছোট নয়রে কম্॥
একবার তোবা ফিরে দাঁড়া
তুলে নে মার বলির খাঁড়া
ছুটবে তোদের মনের ধাঁধা
বুঝবি নিজের পরাক্রম॥"

শহীদ ক্ষুদিরাম নিজের প্রাণ দিয়ে এনে দিয়েছিলেন লক্ষ প্রাণের জাগরণ! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—"ক্ষুদিরাম যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য নয়। সেই কার্যের অন্তরালে তাহার অন্তরের যে পরিচয় দেশ পাইয়াছে, তাহাতেই দেশবাসীর চিত্তে সে অমর হইয়া আছে।"

অষ্টাদশ বর্ষীয় ক্ষুদিরামই প্রথম বাঙালী শহীদ যিনি ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইলেন—পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমোচনের জন্য। মেদিনীপুর চিরদিন এই গৌরবের অধিকারী হয়ে থাকবে।

বাংলার প্রথম শহীদ যুগলের অন্যতম প্রফুল্ল চাকীর নামও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর নামে যে গানটি গাওয়া হত বাংলার পথে-ঘাটে, গ্রামে-নগরে তার কিছু অংশ নিম্নরূপ :—

"আজিও তোমারে ভুলিতে পারিনি
বীর প্রফুল্ল চাকী
তব পবিত্র সুকঠোর দেহ

স্পর্শিতে কভু পারে নাই কেহ
নিজ হাতে দিলে পরাণ আহুতি
বন্ধন লাজ ঢাকি।"

ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তির অলীকত্ব

কোন কোন ইতিবৃত্ত লেখক বলেছেন—ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তির ফলেই ২রা মে ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের পরদিনই মানিকতলার মুরারি পুকুর বাগানে ও অন্যান্য স্থানে খানাতল্লাসী হয় এবং অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীগণ গ্রেপ্তার হন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই জনশ্রুতির বিচারের চেষ্টা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাহা এই :—"আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র সুসংগত অর্থ এই যে ক্ষুদিরাম তাঁহার স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিলেন তিনি নিজেই এই বোমার ব্যাপারের জন্য দায়ী। কিন্তু পুলিশ অন্য কোন উপায়ে মুরারি পুকুরের বাগানে সন্ত্রাসবাদীদের বোমা তৈয়ারীর ব্যাপার জানিতে পারে এবং ক্ষুদিরামকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া ঐ বাগানের আস্তানায় যাহারা ছিল তাহাদের সকলেই ইহাব সহিত যোগ আছে ইহা প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা করে। মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের অন্ততঃ কয়েকদিন পূর্ব হইতেই যে মুরারিপুকুর বাগানের আস্তানা সম্বন্ধে পুলিশেব সন্দেহ জন্মিয়াছিল, ইহার সমর্থন হিসাবে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করা যাইতে পাবে।

"কিছুদিন থেকে আমরা প্রায় সকলেই একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে শুরু করলাম। আমরা বাইরে যখন যাই, যে কোন কাজে, হাটে বাজারে, কি লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, কেউ যেন আমাদের পেছনে চলছে একটু দূরে থেকে, তবে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় অনুসরণ করছে। থামলে সেও থেমে যায়; দেরী হলে সেও একটা ছুতো নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। আমরা

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, আবিষ্কারও করলাম এরই নাম যাকে বলে স্পাই (SPY) (পুলিশের চর)। সুতরাং এখন থেকে আমাদের বিশেষভাবেই সাবধান হতে হবে।”

১লা মে অর্থাৎ বাগান ঘেরাওয়ের আগের দিনের কথা শ্রীনলিনীকান্ত লিখেছেন ঃ—

“সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা যার যার স্থানে গিয়ে কিছু বিশ্রাম করব ভাবছি। এমন সময় অস্বাভাবিক ভাবে কতকগুলি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অন্ধকারে কতকগুলি লণ্ঠন চলা-ফেরা করছে দেখা গেল।

কে তোমরা? কি করো এখানে? আমরা যথাসাধ্য বাজে উত্তর দিতে চেষ্টা করলাম। ‘আচ্ছা বেশ কাল সকালে এসে ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে’—এই বলে তারা চলে গেল। তাদের মধ্যে সহৃদয় কোন ব্যক্তি আমাদের সাবধান হতে বলে গেল কি?

তারপর স্থির হইল পরদিন প্রাতঃকালেই সকলে বাগান ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। যদিও তৎক্ষণাৎ বাগান ত্যাগ করিবার সুবুদ্ধি হয় নাই তথাপি তাঁহারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। “অরবিন্দের বাসায় দুই তিনটি রাইফেল ছিল তা আনা হল। এগুলি এবং যেকটি রিভলভার ছিল এবং বোমার সাজ-সরঞ্জাম সব লোহার পাত দিয়ে তৈরী দুটি বাক্সের মধ্যে পুরে মাটির তলায় পুতে ফেলা হয়। তারপর কাগজপত্র নামধাম প্লান প্রভৃতি যার মধ্যে আছে যথাসাধ্য সব অগ্নি সৎকার করা হল, অনেক রাত্রি অবধি। সবকিছু পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি—অনেক নাম ছিল, তা ধরে খোঁজ করে পুলিশ অনেককে অনেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পরে।···যতটা সম্ভব শেষ করে আমরা শুয়েছি। কল্পনা—ভোর হতে না হতেই দেব সব ছুট।” কিন্তু এ কল্পনা বাস্তবে পরিণত হল না। ২রা মে প্রাতঃকালে পুলিশ বাগানের সকলকে গ্রেপ্তার করল। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার

আরও পাঁচটি বিভিন্ন স্থানে এই একই সময় খানাতল্লাসী ও অনেককে গ্রেপ্তার করা হল।

সত্যেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার

সত্যেন্দ্রনাথকে ধরা হল মেদিনীপুরে তাঁর দাদার বাড়ী খানাতল্লাস করে। তার আগে তিনি অস্ত্র আইনে দুমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর দাদার নামে লাইসেন্স নেওয়া বন্দুক তিনি ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। সত্যেন্দ্র-নাথকে বন্দীভাবে কলিকাতায় আনা হল।

আলিপুর বোমার মামলাতে দায়রা বিচারে নিম্নলিখিত ৩৬ জন আসামী ছিলেন ঃ—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো, ইন্দুভূষণ রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশচন্দ্র মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, নিরাপদ রায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্র নাথ বসু, দীনদয়াল বসু, সুধীরকুমার সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ধরণীনাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোকচন্দ্র নন্দী, সুশীলকুমার সেন, দেবব্রত বসু, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, নিখিলেশ্বর রায়, চারুচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, হরিদাস দত্ত, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বালকৃষ্ণ কানে, প্রভাসচন্দ্র দে। চব্বিশ পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্লী প্রাথমিক বিচারের পর ৩৬ জনকে দায়রা সোপর্দ করেন। ১৯শে অক্টোবর, ১৯০৮ দায়রা জজ্ বীচ্‌ক্রফ্‌টের আদালতে মামলা আরম্ভ হয়। এই বিখ্যাত মামলার বিচার শেষ হয় —১৯০৯ সালের ১৩ই এপ্রিল এবং রায় ঘোষিত হয় ৬ই মে (১৯০৯)। সত্যেন্দ্র ও কানাইলালের বিচার নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার অপরাধে পৃথকভাবে হয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মামলা আরম্ভ হলে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪ঠা মে স্বেচ্ছায় যে স্বীকারোক্তি করেন এবং সন্ত্রাসবাদীদের ইতিহাস,

কার্যপ্রণালী ও প্রধান ঘটনাবলী বিবৃত করেন তাতে নরেন গোঁসাইকে দলের কর্মী হিসাবে নাম করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে নরেনও আলিপুর জেলে ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার প্রতি অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুদের মনে সন্দেহের উদয় হয়। পুলিশ নরেনকে কয়েক দিন জেল অপিসে ডেকে নিয়ে যায়। নরেন প্রায়ই দলের অন্যান্য কর্মীদের, বিশেষতঃ যারা বাংলার বাইরে থাকে তাদের বিবরণ জানবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। অবশেষে ২৩শে জুন গভর্ণমেণ্ট তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে এবং নরেন চারি দিন যাবৎ সমস্ত কাহিনী এবং অরবিন্দের সক্রিয় অংশ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেয়। তখন নবেনকে অন্যান্য সকল আসামীর সঙ্গে না রেখে ইউরোপীয় অভিযুক্তদের ওয়ার্ডে রাখা হয়।

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে পুলিশ বেশী প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। সম্ভবতঃ সেইজন্যই পুলিশের পরামর্শে নবেন এমন সব কথা বলেছিল যাতে অরবিন্দের দণ্ড সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না। অরবিন্দকে বাঁচাতে গিয়ে বারীন্দ্র গুপ্ত সমিতির প্রসঙ্গে অরবিন্দের নামোল্লেখও করেননি। বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির ফলেই নরেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সম্ভবতঃ তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই নরেন অরবিন্দের বিরুদ্ধে অনেক কাহিনী বলে। অন্যান্য আসামীরা অরবিন্দের এই বিপদে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। হঠাৎ একটু আশার আলো দেখা দিল। আইনের স্পষ্ট বিধি অনুসারে নরেনের উক্তি সম্বন্ধে আসামী পক্ষ তাকে আদালতে জেরা না করা পর্য্যন্ত এই উক্তি সাক্ষ্য বলে গ্রহণ করা যাবে না, সুতরাং জেরার পূর্বে নরেনকে হত্যা করবার বন্দোবস্ত হল। এই কার্য্যের ভার নিলেন আসামী সত্যেন ও কানাই।

নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পরিকল্পনা

সত্যেন অসুখের অজুহাতে মাঝে হাসপাতালে যান এবং আদালতে অনুপস্থিত থাকেন। রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৭শে আগষ্ট তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। পেটে হঠাৎ কলিক

বেদনা হওয়ায় কানাই ৩০শে আগষ্ট হাসপাতালে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। কারণ তিনি বিপ্লবী কার্যের জন্ম অনুতপ্ত এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কর্তব্য স্থির করবেন। নরেন তদনুসারে সত্যেনের সঙ্গে দু'বার দেখা করে এবং সত্যেন নরেনের ন্যায় পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করবেন এই আভাস দেন। এই কথা শুনে পরদিন (৩১শে) আবার সত্যেনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়।

সত্যেন অতি সুকৌশলে নরেনের হত্যা সম্পর্কীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" পুস্তকে লিখেছেন (পৃঃ ৩২৭) "নরেন গোঁসাই মিঃ বার্লীর কোর্টে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, ঐ সাক্ষ্য দেওয়ার পর মিঃ বার্লি নরেনকে জেরা করিতে দেন নাই। এবং তাহার পর নরেনকে হত্যা করা হয়।···আমাদের পক্ষের উকীল অনেক সাধ্য সাধনায় এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়েছিলেন যে যেহেতু সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না যাবৎ না যথারীতি সেশন আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরি না নিলে গোঁসাইকে মারা প্রায় বৃথা হত—অরবিন্দবাবুর মুক্তিও নাকি অসম্ভব হত। তখন বার্লি সাহেবের কোর্টে কোন উকীলই এর আবশ্যকতা বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি তাই রাজি হন নাই। এ ফন্দীও সত্যেনের উদ্ভাবিত এবং তারই চেষ্টায় হয়েছিল।"

নরেন-হত্যার ঘটনা সম্বন্ধে হেমচন্দ্র লিখেছেন (পৃঃ ৩২৪) "পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীর রক্ষক দুই জন ইউরেশিয় কয়েদী Warder সঙ্গে করে হাসপাতালের দোতলার সিঁড়ির পাশে ডিস্পেনসারিতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসে ছিল। রিভলভারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে সেজন্য নাকি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভিতর থেকেই নরেনকে তাক করে মারে। খট্ করে শব্দ হল। কিন্তু কার্তুজ আগুন দিলে না। সত্যেন পর মুহূর্তে জামার

ভিতর থেকে রিভলভার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিগেনবোথাম নামক একজন ইউরেশিয়ান কয়েদী Warder রিভলভারটা ধরে টানাটানি করতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়। কাজেই সে রিভলভার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোঁসাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলি চালায়। কানাই দাঁত মাজার ভান করে ডিস্পেনসারিতে সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছিল। যাই হোক গুলি সামান্য ভাবে পায়ের কোন স্থানে লেগেছিল। তাই সিঁড়ি নেমে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে তুপাশে দেওয়াল এমন একটা লম্বা সরু গলির ভিতর পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া করেছিল। সত্যেন ডিস্পেনসারি থেকে বেরিয়ে সামনে একজন কয়েদী দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করছিল—"নরেন কোথায় গেল?" আঙ্গুল দিয়ে ইসারায় সে দেখিয়ে দিল সত্যেন ছুটে গিয়ে কানাই-এর সঙ্গে যোগ দেয়। তুই জনেই গুলি চালাতে থাকে। সত্যেনের একটা গুলিতে কানাই-এর গায়ের চামড়া ছোলা হয়ে গেছিল। এতে বোঝা যায় সত্যেন যখন সেখানে যায় তখনও নরেন জমি ধরেনি। নরেন নাকি তুই একবার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল।

তাহার পর যথারীতি "পাগলাঘণ্টি" ভোম্বা, কর্মচারীদের ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি, সত্যেন ও কানাই গ্রেপ্তার, সব ওয়ার্ডে তালা বন্ধ, খানা তল্লাসী ইত্যাদি যথারীতি হয়েছিল।

বারীন্দ্র লিখেছেন—"এদিকে সত্যেন পকেটে হাত রাখিয়া কথা কহিতে কহিতে পকেটেই পিস্তল সহী করিয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। গুলি নরেনের উরুতে লাগিয়া মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইউরেশিয়ান কয়েদী সত্যেনকে ধরিতে গিয়া পিস্তলের বাঁটের ঘায়ে আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া পিছাইয়া পড়িল।

নরেন্দ্র ছিল কুস্তিগির, বেশ পালোয়ান। পৃষ্ঠে গুলি খাইয়া সে হাসপাতাল ছাড়িয়া দৌড় দিল, খোলসা পথ পাইয়া কানাই তাড়া করিতে করিতে নরেনের পিঠ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি

শিরদাড়া ভেদ করিয়া বুকে বসিয়া গেল। ফলে নরেন তখনই মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।”

উপেন্দ্র লিখেছেন “একটা পুরানো চোর ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল—নরেন গোঁসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিরে? সে উত্তর করিল হাঁ। বাবু কানাই বাবু তাকে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ঐ দেখুনগে না, কারখানার সম্মুখে সে একেবারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। আর জেলার বাবুও একটু হ'লে হয়ে যেত। তিনি কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।” ১৯০৮ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই অভূতপূর্ব চমকপ্রদ ঘটনা সমগ্র ভারতে একটা গুরুতর আলোড়ন সৃষ্টি করল।

কিন্তু বারীন্দ্রনাথ এই ঘটনাকে স্বাগত জানাতে পারেননি। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর “বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা” পুস্তকে (পৃঃ ৩২৫-২৬) লিখেছেন—“সত্যেনের সঙ্গে বারীনের ঝগড়া আরম্ভ হয়—১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সমিতির গোড়াতে—সার্কুলার রোডে প্রথম আড্ডা থেকে। তারপর তাকে (বারীনকে) কিছুমাত্র জানতে না দিয়ে এত বড় একটা কাণ্ড (নরেন গোঁসাইকে হত্যা) সত্যেন করল এতে বারীনের নেতৃত্বের অভিমানে এমনই আঘাত লেগেছিল যে নরেনের হত্যার পর সেই দিনই আমাদের ২৩নং ওয়ার্ডে দস্তুর মাফিক এক মিটিং এ বসে সত্যেনের উপর দোষারোপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে সদ্য গায়ের জ্বালা কতকটা জুড়িয়েছিল।”

বারীন্দ্রের এই কার্য্য কতটা বিচার সহ বলা যায় না, হয়ত বা তিনি ভেবেছিলেন অরবিন্দকে এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হতে পারে। কিন্তু সন্দেহ নাই যে বঙ্গের তথা ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে সত্যেন্দ্র ও কানাইর এই কার্যের জন্য তাঁদের নাম চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সত্যেন ও কানাইয়ের রিভলভার সংগ্রহ

সত্যেন ও কানাই যে রিভলভার ব্যবহার করে ছিলেন সে দুটি রিভলভার কোথা হতে কি উপায়ে পাওয়া গেল সে সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল রায় তাঁর "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী" পুস্তকে যা লিখেছেন তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ—"শ্রীশচন্দ্র ঘোষ নামক তাঁহাদের এক বিপ্লবী বাবু কানাইলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করার সুবিধা সুযোগ অন্বেষণ করতে লাগলেন। নিজেকে কানাইলালের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দরখাস্ত করায় তা মঞ্জুর হয়ে গেল এবং কানাইলালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারও ঘটল। শ্রীশ বাবু মতিবাবুকে বলেছিলেন—"লোহার শিক দেওয়া এক লম্বা প্রাচীরের অপর পার্শ্বে দাড়াইয়া বহু আত্মীয় স্বজন বন্দীদের সহিত আলোচনার সুবিধা পায়। গোয়েন্দা পুলিশ পাশে পাশেই দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগকে ফাঁকি দেওয়া খুবই সহজ। বিশেষতঃ জেলার যিনি, তিনি অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি দূরে টেবিলের পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকেন। সেখানে তিনি কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করেন। তাঁহার উদার মনোভাব জনিত অন্যমনস্কতার সৌজন্যে অনেক কথা আলোচনা করার সুযোগ মিলে।***"

এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাংলাদেশের ইতিহাসে" (পৃঃ ১৩৭) লিখিত হয়েছে "এই প্রসঙ্গে একটী বহু বিতর্কিত প্রশ্ন— সত্যেন ও কানাই কোথা হইতে বন্দুক সংগ্রহ করিল ? এ সম্বন্ধে শ্রীনলিনী কান্তের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"জেলের মধ্যে পিস্তল আমদানি করা হল কি রকমে তা নিয়ে অনেক রকম জল্পনা কল্পনা করা হয়েছিল ; বিস্কুটের বাক্সের ভিতরে, মাছের পেটে বা কাঁঠালের নাড়ি ভুঁড়ির মধ্যে, কত কি ! এখন আমি বলি কি রকমে পিস্তলটা এসেছিল।......

পুলিশ যখন দেখল যে আমরা যখন অত ভয়ংকর হিংস্র জানোয়ার কিছুই নই তখন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করবার সুযোগ দিত। একটা ঘরের মাঝখানে একটা

গরাদের বেড়া তুলে দেওয়া হয়েছিল—একদিকে দাঁড়াত অভ্যাগতরা, অন্য দিকে দাঁড়াতাম আমরা। শান্ত্রী এপাশে ওপাশে থাকত বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু নজর করত না। গায়ে আলোয়ান বা মোটা চাদর জড়িয়ে রেলিংয়ের ভিতর দিয়েই বেশ ছোঁয়াছুঁয়ি চলতে পারে। এইভাবে গরাদের ভিতর দিয়ে কানাই ও সত্যেনের রিভলভার দুটি হস্তান্তরিত হয়।"

* * *

"এ বিষয়ে যে বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তদনুসারে চন্দন-নগরের কর্মী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ বারীন্দ্র ঘোষের নির্দেশ মত আগস্ট মাসের একেবারে শেষ দিকে পূর্বোক্ত উপায়ে রিভলভার দুইটী আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের হাতে দিয়া যান।"

সত্যেন ও কানাইয়ের মৃত্যুদণ্ড

নরেন গোঁসাই-এর হত্যার অপরাধে সত্যেন ও কানাইর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২/১১৪ ধারা মতে অভিযোগ আনা হয়। কানাইর বিরুদ্ধে হিগিনস্‌কে মারাত্মক ভাবে আঘাত করার অপরাধে ৩২৬ ধারা মতে অভিযোগ ছিল। আলিপুরের সেশন জজ মিঃ এফ, আর, রো-র এজলাসে কানাই বললেনঃ—ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমি বলেছিলাম আমি আর সত্যেন এই খুনের জন্য দায়ী—এই কথা প্রত্যাহার করে নিয়ে আজ বলতে চাই এই খুনের জন্য আমি একাই দায়ী। সত্যেন্দ্র একই কথা বললেন যে এই খুনের জন্য তিনি একাই দায়ী। বিচারে দুইজনেরই ফাঁসির হুকুম হল। সত্যেন্দ্রনাথের বেলায় পাঁচজন জুরির মধ্যে তিনজন তাঁকে নির্দোষ বলেছিলেন।

নানা কারণে সত্যেনের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়—বড় লাটের নিকট ও রাজার নিকটও আবেদন হয়। কানাইর মৃত্যু দণ্ডের বিরুদ্ধে কোন আপীল হয়নি। "There shall be no

appeal" কানাইলালের এই ঐতিহাসিক বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কানাইয়ের ফাঁসী হয় ১০ই নভেম্বর (১৯০৮)।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুদণ্ড শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে। ফাঁসীর আগে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর ভগ্নী সুরবালা। সত্যেন্দ্র তাঁর বিধবা মার জন্য ক্ষণকাল সামান্য মাত্র বিচলিত হয়েছিলেন এবং মার জন্য সান্ত্বনা জানিয়ে বলেছিলেন যে ভাই আমেরিকাতে আছে মা তাকে ইচ্ছা করলেই দেখতে পান না; মাকে বলো আমিও তেমনি এক দূর দেশে যাচ্ছি এইমাত্র—আমার দেহকেই তিনি চোখের সামনে দেখতে পাবেন না কিন্তু আমার আত্মা তাঁকে ঘিরে থাকবে। তার তো মৃত্যু নাই।*

সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছাক্রমে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি বলেন—"কিভাবে পরম শান্তিতে এই মরদেহ ত্যাগ করিব?" শাস্ত্রী মহাশয় বললেন—"তোমার মহান ও পরম ধার্মিক পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের কথা স্মরণ কর। তুমি তাঁহাদের নিকট পরম শান্তিধামে যাইতেছ। জাগতিক সমস্ত চিন্তা ত্যাগ কর। সমস্ত আসক্তি বিসর্জন দাও।

....তোমার সুবিখ্যাত জ্যোষ্ঠতাত রাজনারায়ণবাবুর কথা স্মরণ কর। ভগবানে ভরসা রাখ। অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত সমস্ত পাপের

*সত্যেন্দ্র ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতা অভয় চরণ বসুর পুত্র এঁরা পাঁচ ভাই—জ্ঞানেন্দ্রনাথ (বিপ্লবী গুরু), সত্যেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, সুবোধ কুমার এবং সরলকুমার (তখনকার বয়স ছিল ১৩)। এঁদের পাঁচ ভগিনী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে ছিলেন তিন ভগিনী, সুরবালা তাঁদের অন্যতম। অভয়চরণ রাজনারায়ণের স্থলে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের জননীর নাম ছিল—তারাসুন্দরী। সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর শহরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি, এ, শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেন নাই। তিনি একবৎসর কালেক্টরিতে চাকুরি করেছিলেন।

জন্য ঈশ্বরের কাছে মার্জনা ভিক্ষা কর এবং বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া লও। ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিও।" পণ্ডিত শাস্ত্রীর উপদেশ মত সত্যেন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন —"ঈশ্বর আমাকে শান্তি দাও, নির্ভীকভাবে ও পরম শান্তির সহিত আমাকে মরিতে শিক্ষা দাও—আমায় শক্তি দাও হে সর্ব-শক্তিমান বিভু। আমি পরজীবনের অনিশ্চয়তার চিন্তায় বিচলিত। কিন্তু আমি তোমার শান্তিময় লোকে যাইতে উৎসুক। সত্যেন শীতল লৌহদ্বারে মস্তক ছোঁয়াইল। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার শির স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদন উচ্চারণ করিলেন—"ঈশ্বর তোমায় কৃপা করবেন—আমি নিশ্চিত।"

সত্যেনের পূর্ব-পুরুষগণ সকলেই পরম ধার্মিক ছিলেন—সেই ঐতিহ্যই তাঁকে ঐরূপ প্রেরণা দেয়।

সত্যেন্দ্রের ফাঁসি

২৩শে নভেম্বর (১৯০৮) সত্যেনের ফাঁসি হয়। সত্যেনের ফাঁসি সম্পর্কে হেমচন্দ্রের এক বন্ধু—কে, সি, রায় হেমচন্দ্রকে নিম্ন-লিখিত রূপ লিখে পাঠান—"ফাঁসির দিন অতি প্রত্যূষে আমরা আলিপুর জেল ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ঐ নির্দয় ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে একজন বর্ম পরিহিত শ্বেত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন—" You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely. Kanai was brave but it seems Satyendra was braver. আপনারা এখন যেতে পারেন। ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে। সত্যেন্দ্র সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করেছেন। কানাই সাহসী ছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় সত্যেন্দ্র ছিলেন অধিকতর সাহসী।"

তদ্দণ্ডেই একজন সার্জেণ্ট বলিতে লাগিল—When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide

awake. When I said "Be ready" he answered "Well, I am quite ready" and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully." আমি যখন তাঁকে ফাঁসির উদ্দেশ্যে তাঁর সেলে আনতে যাই,—তিনি পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন। আমি "প্রস্তুত হন" বলতেই তিনি বলে উঠলেন "আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" তাঁর মুখে তখন মৃদু হাসি। তিনি অকম্পিত পদে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত গেলেন এবং অকুতোভয়ে মঞ্চে আরোহণ করে সানন্দে ফাঁসির রজ্জু পরলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মরদেহ জেলের মধ্যেই ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ ও পুষ্পাদি সহযোগে দাহ করা হল। কর্তৃপক্ষ বিপুল জন সমাগমের ভয়ে বাইরে সৎকারের সুযোগ দিলেন না।

মেদিনীপুরের বিপ্লবী সংগঠনের প্রাণস্বরূপ শহীদ ক্ষুদিরামের গুরু শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ অমর কীর্তির অধিকারী হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসির কয়েক দিন পূর্বে ১০ই নভেম্বর (১৯০৮) নরেন গোঁসাইর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে চরম দণ্ড দিবার অন্যতম রূপকার কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়। এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের অমর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

এই সকল শহীদ প্রাণ বলি দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্যে যে সংগতি রেখে গেছেন তা আমরা স্মরণ করি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের বড়ো নালিশ—তাঁহারা আমাদের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। সেই তো তাঁহারা মরিলেনই, যদি তাঁহারা মরার মতোই মরিতেন তবে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিতাম।"

আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী হেমচন্দ্র কানুনগোকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভোগের জন্য যথা সময়ে আন্দামানে পাঠান হল। আসামী পূর্ণচন্দ্র সেন খালাস পেলেন। এঁর নাম মেদিনীপুরের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে চিরদিন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকবে।

বিপ্লবের তাত্ত্বিক জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রায় একলা হয়ে পড়লেন। সত্যেন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম ও হেমচন্দ্র কার্যক্ষেত্র থেকে অপসৃত হওয়ার পর ১৯০৯ সাল থেকে মেদিনীপুরের বিপ্লবী সংস্থাগুলি নেতৃশূন্য হয়ে পড়ল।

সত্যেন্দ্রনাথ যে স্মরণীয় আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন সেই মামলার পরিণতি ঘটে ১৯০৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। ৬ই মে তারিখে দায়রা জজ্ বীচ্ক্রফট্ তাঁর রায় ঘোষণা করেন। শ্রীঅরবিন্দ ও অন্য ১৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। হাইকোর্ট আপীলের ফলে দুইজন জজ্ জেন্কিন্স্ ও কার্নডাফ ২৩শে আগষ্ট (১৯০৯) যে রায় দেন, তার ফলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম রদ করা হয় এবং চার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিন জনের দশ বছরের দ্বীপান্তর, তিন জনের সাত বছরের দ্বীপান্তর এবং দুই জনের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পাঁচজন আসামী সম্বন্ধে বিচারকদের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় বিচার্ড হ্যারিংটনের পুনর্বিচারের ফলে তিন জনের মুক্তি হয় এবং আর দুইজনের যথাক্রমে সাত বছরের দ্বীপান্তর ও পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের পরিবর্তিত দণ্ডাদেশ ছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

মেদিনীপুরের যে বিপ্লব কাহিনী বিবৃত হ'ল তার উদ্ভব হয়েছিল ১৯০২ সালে। শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সাহচর্য্য লাভ হয়েছিল স্থানীয় বিপ্লবীগণের। শহীদ ক্ষুদিরাম, শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ এবং বীরহৃদয় হেমচন্দ্রের চিরস্মরণীয় আত্মত্যাগে অনুরঞ্জিত ছিল সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা। মেদিনীপুর সহরবাসী নরনারীর জীবন ও কর্মের সংগে সেই বিপ্লবপ্রচেষ্টার নিবিড় যোগাযোগ ঘটেছিল।

জেলার অন্যান্য বিপ্লবীগণ

মেদিনীপুর জেলাতে অপর কোন কোন অংশে বিপ্লবীদের সন্ধান পাওয়া যায়। জেলার অন্য বিপ্লবীগণের কর্মকাণ্ডের সহিত তাঁদের তেমন যোগাযোগ দেখা যায় না। তাঁরা তাঁদের ছাত্রজীবনে

বাহিরের বিপ্লবীগণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁদের সাহচর্যোই তাঁদের বিপ্লবী জীবন বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছিল।

বসন্তকুমার সরকার ছিলেন সদর মহকুমার গড়বেতা থানার অধিবাসী এবং গণেশ চন্দ্র দাসের বাস ছিল তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ময়না থানাতে। তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগের কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

বসন্তকুমার তাঁর যে স্মৃতিকাহিনী লিখেছিলেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হল।

গণেশচন্দ্র সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে তাও লিখিত হল।

বিপ্লবী বসন্তকুমার সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।

'যুগবাণী' পত্রিকার ২০শে মার্চ্চ, ১৯৬৫ ষষ্ঠ সংখ্যা পৃঃ ৯০, ২৭শে মার্চ্চ, ১৯৬৫ ৭ম সংখ্যা পৃঃ ১০৪, ৩রা এপ্রিল ১৯৬৫ ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ১১৮ এবং ১০ই এপ্রিল ১৯৬৫ ৯ম সংখ্যা পৃঃ ১৩৭ সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত "অগ্নিযুগের স্মৃতিকথা" প্রবন্ধ হতে সংকলিত :—

বিপ্লবী বসন্তকুমার সরকার গড়বেতা থানার অধিবাসী। তিনি ১৯০৫-০৬ সালে বর্দ্ধমান কলেজে এফ এ পড়ার সময় স্বদেশী নেতাগণের বক্তৃতাদি শুনে ইংরাজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হন। আমলাগড়াতে (গড়বেতা) তখন নীল চাষীদের উপর ওয়াটসন কোম্পানীর (পরে জমিদারী কোম্পানী) অত্যাচার প্রবলভাবে চলছিল। গড়বেতার মনু ভট্টাচার্য্য ও সতীশ অগস্তির সঙ্গে পরামর্শ হল কোম্পানীর সদর কাছারি ধ্বংস করার। বর্দ্ধমানে আর্য মেসে ওঁরা একটি লাঠি খেলার আখড়া খুলে ছিলেন। সঙ্গী ছিলেন পূর্ণ মোদক ও ব্রজ মাহাত। গড়বেতাতে সতীশ অগস্তি, হাবু অগস্তি, মনু ভট্টাচার্য্য, অবোধ দে, ফণী সিং (মৃত), বিপিন, সরোজ, নীলু হাজরা, প্রভাকর চৌধুরী, চণ্ডী পান প্রভৃতি গড়বেতাতে আখড়া স্থাপন করেন। নিজ বাড়ীর কাছে সন্দিপুরে এক সভা ডাকেন। ঐ সভাতে বিপ্লবের দ্যোতক একটি লাল পতাকা উড়ান হয়েছিল। তাতে কেউ সভাপতি হতে সম্মত না হওয়ায় বসন্তবাবুর মাতামহ রামধন নিয়োগী সভাপতি হন। তিনি তেজস্বিতার সঙ্গে বললেন—ফাঁসি হয় আমারই হোক্।

তারপর বসন্তবাবু বহুগ্রামে পর পর আখড়া স্থাপন করেন। ওঁর সঙ্গী ছিলেন—রাখাল, পঞ্চানন, রঘু, রাজেন্দ্র ঘটক।

বসন্তবাবু বি. এ. পড়ার সময় যখন হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন সেই সময় ওঁরা "ম্যাটসিনি সোসাইটি" নাম দিয়ে একটি সমিতি স্থাপন করেন। সঙ্গী ছিলেন শ্রীরামপুরের সতীশ সেনগুপ্ত, পঞ্চানন সিংহ, উত্তর পাড়ার অমর মুখার্জ্জী, কালী বাঁড়ুয্যে, আশুতোষ দাস। সমিতি স্থাপনের পর দিন হোষ্টেলে বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব হয়। মাঝে মাঝে সঞ্জীবনী অফিসের পাশে এঁদের সভা হত।

বসন্তবাবু অনুশীলন দলের সম্পাদক সতীশ সেনগুপ্ত প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত আখড়ায় যোগ দেন। বিপিন গাঙ্গুলীর আখড়াতে তিনি তলোয়ার খেলা শিখতেন।

১৯০৭ সালে পটুয়াটোলা লেনে পুলিন দাসের পরিচালিত ঢাকা অনুশীলন সমিতির জন্য একটি ঘর ভাড়া করা হয়। সিমলা স্ট্রীটে দেবেন্দ্র মল্লিকের বাসায় যোগেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বসন্তবাবু তাঁর নিকট বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রতিজ্ঞাপত্র এইরূপ ছিল—"ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে যতদিন না দেশোদ্ধার হয় ততদিন বিলাসিতা করিব না, প্রত্যহ একটি করিয়া সভা সংগ্রহ করিব। এই কাজের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত রহিলাম"। ঐ সালে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন-কে ষ্টীমারে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মৈমনসিং নিবাসী যুবকটি মেঘনা সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায় এবং বসন্তবাবু তাঁকে ৬ মাস নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন। তাঁকে তিনি নলিনী সরকার নাম দিয়েছিলেন। বসন্তবাবু খুলনা জেলার মহেশ্বর পাশার মজুমদার বাড়ীতে নেপাল সরকার, রাজেন্দ্র কর্মকার, নলিনী প্রভৃতিকে নিয়ে একটি আখড়া স্থাপন করেন। বন্দনী মহলেও একটি আখড়া হল, সঙ্গী ছিলেন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও সর্ব্বেশ্বর।

বিপ্লবী দলের অর্থাভাবের সমাধানের জন্য ১৯০৮ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পাশের ঘরে জাল টাকা, কার্তুজ তৈয়ারী করার জন্য একটি লেদ্ মেশিন ও যন্ত্রপাতি বসান হয়। টাকশাল হইতে একজন

মিস্ত্রি সংগ্রহ করা হয়। তার ডাইসে ভাল কাজ না হওয়ায় তাঁরা ভাল ডাইসের সন্ধানে লক্ষ্ণৌ যান।

বসন্তবাবুদের দলের সঙ্গে নড়াইলের জমিদারের সাহায্যে বিজয় কবিরাজের প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদলের এবং ঢাকার ও কলিকাতার অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জাহাজের নাবিকগণের নিকট ও বন্দুকের দোকান থেকে এবং ধনী জমিদারের বাড়ী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল।

পুরুলিয়া জেলাতে ঝালদায় দেশী রিভলভার ও বন্দুক তৈয়ারীর একটি ছোট কারখানা স্থাপন করা হয়। এই কাজে অম্বিকানগরের রাজা বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। ওঁদের দলের নলিনী দেব ওঁকে একটি ভাল রাইফেল সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সিমলা স্ট্রীটে নগেন ঘোষ সপরিবারে একটি ঘরের দোতলার ভাড়াটে ছিলেন। তাঁর নীচের ঘরে ওঁদের দলের অস্ত্রশস্ত্র থাকত।

১৯০৮ সালের জুন মাসে ঢাকা জেলাতে মেঘনার উপর অবস্থিত বাহ্‌রা বাজার লুট করবার পরিকল্পনা করা হয়। বসন্তবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির সহায়তায় ঐ কার্যে বিশেষভাবে লিপ্ত হন। কলিকাতা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাওয়ার ভার তাঁর উপর পড়েছিল। বাঁকুড়ার মুন্সেফের ছেলে শৈলেন চক্রবর্ত্তী তাঁর সঙ্গী হন। তাঁরা ১লা জুন রাত্রের ট্রেনে একটি ট্রাঙ্কে রিভলভার ও ৫।৬টি পিস্তল নিয়ে রওনা হন। পূর্ব্ব ব্যবস্থামত লোক ছিল। তারা ৫০।৬০ জন লোক ২রা জুন নৌকা নিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হয়। মাখনলাল সেন ওদের দলে ছিলেন। এঁরা যখন অগ্রসর হতে থাকেন তখন একদল মুসলমান বাধা দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করে। বসন্তবাবু প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গুলি ছুঁড়ে ওদের নিবৃত্ত করেন। ডাকাইতিতে কৃতকার্য হয়ে বিপ্লবীরা নৌকা যোগে ফিরে আসেন এবং আসার সময় বিলাতী কাপড়ের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেন। সশস্ত্র পুলিশ এঁদের নৌকা অনুসরণ করে। পরস্পর গুলি বিনিময় হয়। পুলিশ এঁদের ধরতে পারল না। এঁরা অস্ত্র বোঝাই ট্রাঙ্ক নিয়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং যথাস্থানে রাখেন।

বসন্তবাবু বি. এ. পরীক্ষায় ফেল হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি বিভিন্ন জেলাতে আখড়ার সংগঠন চালাতে থাকেন। কর্ম্মীদের আশ্রয় দিবার জন্য তিনি হ্যারিসন রোডে ঘর ভাড়া করে একটি খাবারের দোকান খুলেন। এই সময় খুলনা-যশোহর জেলাতে রাজনৈতিক ডাকাতি হতে থাকে। যশোহর-খুলনা-গ্যাঙ্গ-কেস্ (Gang case) নামক একটি মামলাতে বসন্তবাবুকে আসামী করা হয়। এই কেসে ৪৪ জন আসামী ছিলেন। ১৭ জন এপ্রুভার হল। ১৫ জন তাঁদের উক্তি প্রত্যাহার করেন। জেলসুপার বসন্তবাবুকে সাক্ষী ভাঙ্গাবার নেতা মনে করে সেলে রাখেন।

সেসন জজ দায়রা সোপর্দের আদেশে মন্তব্য করেন—Their object was to form a gang and obtain money with which to purchase arms in order to shake off the British Rule. There can be little doubt from all evidences on record that Basanta was the leader and living spirit of the gang and provided brains to inspire and direct them.

বসন্তবাবু ও অন্যান্য আসামীদের প্রেসিডেন্সি জেলে আনা হয়। সেখানে বড়লাট একদিন জেল পরিদর্শনে এসে রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি যখন প্রশ্ন করেন তাঁরা কেমন আছেন, বসন্তবাবু উত্তর দেন যে তা'দিগকে জেলে রাখা হয়েছে—কারণ তারা দেশকে ভালবাসেন। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য কি তাঁর লজ্জা বোধ হচ্ছে না ? তাঁদের প্রতি অমানুষিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গত এক বৎসর তাঁদের জেলে আটক রাখা হয়েছে—কোন মানুষের মুখ তাঁরা দেখতে পান না। বড়লাট জেলের অফিসারদের বললেন ওঁদের ভাল ব্যবহার ক'রে ওঁদের মন পরিবর্তন করার জন্য।

হাইকোর্টে Special Tribunal এ প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স. আশুতোষ মুখার্জী ও লয়েড বিচারক ছিলেন। এঁরা স্থির করেন যদি আসামীরা নিজেদের দোষী ঘোষণা করেন তাহলে বড়লাটের উপদেশ মত ওঁদের মুক্তি দেওয়া হবে।

এঁদের আত্মীয়-স্বজন, এডভোকেট প্রভৃতি 'দোষী' ঘোষণার জন্য পরামর্শ দিলেও বসন্তবাবু তাঁর দুজন বন্ধুসহ অটল রইলেন। তথাপি সরকার মোকদ্দমা তুলে নিলেন।

The case is withdrawn. The accused are released. No judgement is delivered in this case. But it is the wish of the Government as well as the Hon'ble High Court that this case should not stand in their way.

শোনা যায় এই মামলায় ২২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।

এর পর বসন্তবাবু বিনপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা অনুমোদন করেন নাই। ইতিমধ্যে তিনি মেদিনীপুরে আইন (Law) পড়তে আসেন। সেখানেও ম্যাজিষ্ট্রেট আপত্তি করেন কিন্তু সিভিল সার্জেন্ট গ্যারাণ্ট'র থাকায় তাঁকে পড়তে দেওয়া হয়।

১৯১২।১৩ সালে বসন্তবাবুরা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং মেদিনীপুরে 'জর্জ লাইব্রেরী' নাম দিয়ে একটি বইয়ের দোকানও খোলেন। ওঁর ভাই, পঞ্চানন, রাজীব, ভাগ্নে, রামদীন, তারাপদ মুখার্জী প্রভৃতি অনেকে এসে যোগ দেন।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সময় যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন) সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। জার্মানী হতে ভারতীয় বিপ্লবীগণ 'ম্যাভেরিক্' জাহাজে অস্ত্র আমদানির যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে বসন্তবাবুর উপর চাঁদবালিতে থেকে অস্ত্রশস্ত্র রাখবার ভার পড়েছিল। তিনি সেখানে ঘরভাড়া করে প্রস্তুত ছিলেন।

এছাড়া ১৯১৫ সালে একটি নির্দিষ্ট দিনে যে বিদ্রোহ সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে মেদিনীপুর জেলার ভার ছিল বসন্তবাবুর এবং তারাপদ মুখার্জী, বিপিন হাজরা, মনু ভট্টাচার্য, পঞ্চানন, রাখাল প্রভৃতি ৮ জনের উপর। তাঁরা সেণ্ট্রাল জেল দখল করে কয়েদীদের মুক্ত করবেন, অস্ত্রাগার ও ট্রেজারী দখল করবেন এই ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ওঁদের হাতে কতকগুলি অস্ত্রও দেওয়া হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়নি।

১৯১৫ সালে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ওঁর বাড়ী খানাতল্লাসী হয় ও বসন্তবাবু গ্রেপ্তার হন। মেদিনীপুর জেলে একমাস থাকার পর তিনি বাগের হাটে এবং তারপরে কাকদ্বীপে নজরবন্দী ছিলেন এবং পুনরায় তাঁকে বাগের হাটে পাঠান হয়। তিনি চার বছর অন্তরীণ ছিলেন।

ইহার পর ১৯২২ সালে তিনি মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ৬ মাস ছিলেন। ১৯২৯ সালে ইনি লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩০ সালে বাড়ীতে বোমা তৈয়ারীর অজুহাতে তাঁর ও তাঁর ভাইপোর বিরুদ্ধে মামলা খাড়া ক'রে ওঁদের এক বৎসর ক'রে সাজা দেওয়া হয়। এঁরা দমদম জেলে ছিলেন।

১৯৪২ সালে গড়বেতা থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে ওঁকে গ্রেপ্তার ক'রে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়।

বসন্তবাবু লিখেছেন—

"ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিপ্লবীদের রক্তে রঞ্জিত। কত অজানা অচেনা, অসম সাহসী, নির্ভীক, তেজস্বী দেশপ্রেমিক যুবক আত্মাহুতি দিয়াছে– তাহাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দান করা হয় নাই। তাহার সম্যক ইতিহাস এখনও অজানা এবং তাহা সংগ্রহ করা কঠিন। স্বাধীনতার অগ্রগতিতে তাহাদের ত্যাগ ও দান অতুলনীয়।"

বিপ্লবী গণেশচন্দ্র দাস

ময়না থানার বিপ্লবী গণেশচন্দ্র দাস, শরৎচন্দ্র দাস, রামচক নিবাসী সদানন্দ সামন্ত, ময়নার আনন্দপুর ও তমলুক থানার শিবরাম-পুর পাটনা প্রভৃতি মৌজার জমিদার চৈতন্যচরণ বাগ, নিত্যানন্দ কর, তাঁদের সহকর্মী পুৎপুতা গ্রামের রাসবিহারী জানা, শ্রীরামপুর গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোক যোগেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন। যোগেন বাবু গ্রেপ্তার ও বন্দী হয়েছিলেন। এঁদের পুকুর-পাড়ে মাটির নীচে পুলিশ বারুদ ও টোটা পাওয়ায় যোগেনবাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়েছিল। পিঁয়াজবেড়িয়া গ্রামের জমিদার সুরেন্দ্র

নাথ মাইতিও বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন। এদের নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্র, যুবক ও প্রৌঢ় গ্রামবাসীদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়।

গণেশবাবুকে হলুদবাড়ী ডাকাতির সম্পর্কে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। ঐ সময়ে গোপনে তমলুক শহরের রক্ষিত বাড়ীর বাগানে তমলুক রাজবাড়ীর পুবাকালের ডাঙ্গাতে এবং ময়না রাজার ঘন কাঁটা বাঁশ বাগানের ভিতর লাঠি খেলার মহড়া হত। তখন ময়নার রাজা ছিলেন নিরঞ্জনানন্দ বাহুবলীন্দ্র বাহাদুর। ঐ সব কর্মীদের সহিত ক্ষুদিরাম বসু এবং যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রুদ্রনাথ বর্মণ, ঘাটালের পূর্ণ সেন এবং শৈলেন দাস প্রমুখ বিপ্লবীদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। গণেশ চন্দ্র দাস তাঁর তমলুক আবাসবাড়ীতে একটি গোপন আড্ডা ও ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করেন।

১৯০৮ সালে গণেশচন্দ্র দাস ও তদানীন্তন মুন্সেফের পুত্র শৈলেন্দ্র নাথ দাস হলুদবাড়ী ডাকাতি মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

যে সকল বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকগণের বিষয় উল্লিখিত হল তাঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন দেশসেবক বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। গড়বেতা থানার উদ্যমী যুবক রামসুন্দর সিংহ স্বদেশীর একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন; কাঁথির প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বদেশীর সময়কার সুপরিচিত কর্মী, ঘাটালের মোহিনী মোহন দাস ও যতীশ চন্দ্র ঘোষ ও তাঁদের স্বদেশী আন্দোলন ও সেবামূলক কার্যের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ডেবরা থানার বলাই চন্দ্র হাজরা ছিলেন একজন সুপরিচিত যুবকর্মী। এঁরা সকলে তাঁদের ছাত্রজীবনে বিপ্লবী কর্মীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং কারুর কারুর কলিকাতার বিপ্লবীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও স্থাপিত হয়েছিল। কংগ্রেসের আন্দোলনের সময় এঁরা যথেষ্ট ত্যাগ ও ক্লেশ বরণ করেছিলেন এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কারাদণ্ড ইত্যাদি রাজরোষ ভোগ করেছিলেন। মেদিনীপুরে বিপ্লবকর্মের জন্য এঁরা দণ্ড ভোগ না করলেও কলিকাতার বিপ্লবীকর্মীগণ অনেক বিষয়ে এঁদের সাহায্য লাভ করতেন।

বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টা

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রুশের যুদ্ধ ঘোষিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের জন্য বিপ্লবীগণ তৎপর হন এবং বঙ্গের অধিকাংশ বিপ্লবী দল তদানীন্তন বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অসামান্য দেশপ্রেমিক, নির্ভীক, হৃদয়বান পুরুষ। ১৯০৬ সালে একটি ভোজালী মাত্র সম্বল ক'রে তিনি একটি বাঘ মেরে 'বাঘা যতীন' খ্যাতি লাভ ক'রেছিলেন।

দুই বিপ্লবী বীর যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বাংলা ও উত্তর ভারতে একযোগে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) দিন স্থির হয়। রাসবিহারী বসু দেরাদুনে উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি চন্দননগরের বিপ্লবীগণের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের মুক্তি সাধনার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হ'য়ে দাঁড়ান। উত্তর ভারতের বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব তাঁর হাতে এসে পড়ে। তিনিও ইউরোপীয় যুদ্ধের সুযোগে সেনাদলে বৃটিশবিদ্বেষ সৃষ্টি ক'রে একটি ব্যাপক বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টায় ছিলেন।

কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক সৈনিক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলে এই বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। রাসবিহারী ছদ্মবেশে জাপান পলায়ন করেন। যতীন্দ্রনাথের দেহান্ত হয় অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে বালেশ্বরে কোপ্তিপদার যুদ্ধক্ষেত্রে। যতীন্দ্র নাথ ও মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য), যাদুগোপাল মুখার্জী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর সহকর্মীগণ জার্মানীর সাহায্যে অস্ত্র আনিয়ে জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য সেই অস্ত্র ব্যবহার করবেন এইরূপ পরিকল্পনা হ'য়েছিল। জার্মান প্রতিনিধি হেল সারিশের ব্যবস্থায় জার্মানী থেকে অস্ত্রসম্ভার 'ম্যাভেরিক' নামক জাহাজে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রেরিত হ'য়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অস্ত্র-জাহাজটি ধরা পড়ে যায় এবং বিপ্লব প্রচেষ্টার গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। এই জাহাজটি থেকে অস্ত্র নামিয়ে নেওয়ার জন্য যতীন্দ্রনাথ

বালেশ্বরের সমুদ্রোপকূলে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনিও তাঁর চারিজন সঙ্গী মেদিনীপুরের পথে ওই ঘাঁটিতে যান। যতীন্দ্রনাথকে প্রথমে তমলুক শহরে এবং পরে কুমরআড়া গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় বিপ্লবপন্থীগণ তাঁর গোপন যাত্রাপথ যাতে পুলিশের নিকট অজ্ঞাত থাকে সেজন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন। অনুমান হয় কুমর-আড়া গ্রামের পর তাঁকে কাঁথির কর্মীগণের সাহায্যে কাঁথির পথেই বালেশ্বর নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল। কাঁথি মহকুমার সীমানা পার হলেই বালেশ্বর জেলা। কাজেই রেলপথ বর্জন ক'রে যতীন্দ্রনাথকে তমলুকের পর কাঁথির পথেই নিয়ে যাওয়া হয় ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। যতীন্দ্রনাথের সংগে স্থানীয় কর্মীগণের একটি আত্মিক যোগ স্থাপিত হ'য়েছিল। ১৯১৩ সালে কাঁথির বন্যার সময়ে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ-ক্রমে বিপ্লবী সমাজের দুই খ্যাতনামা ব্যক্তি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মাখনলাল সেন কাঁথিতে বন্যা সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা করেন—কাজেই নেতা যতীন্দ্রনাথকে নিরাপদে তাঁর আশ্রয় স্থলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কাঁথির কর্মীগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত ক'রে থাকবেন। যা হোক যতীন্দ্রনাথ নিরাপদে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছেন কিন্তু কতকগুলি সূত্র থেকে পুলিশ জানতে পারে যে যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীগণসহ কোপতিপদা ও নিকটবর্তীস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। ধুরন্ধর পুলিশ কর্মচারী ডেনহ্যাম ও টেগার্ট তাঁদের বাহিনীসহ এঁদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেন। বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবার মানুষ ছিলেন না যতীন্দ্রনাথ। তিনি উইয়ের ঢিপির আড়ালকে Trench রূপে ব্যবহার ক'রে পুলিশ বাহিনীর সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। একদিকে মাত্র ৫টি মানুষ, কিন্তু অপর দিকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় দুইশত জনের পুলিশ বাহিনী। চিত্তপ্রিয় ও জ্যোতিষ বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। টোটা ফুরিয়ে যাওয়ায় নীরেন ও মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণে বাধ্য হ'লেন। নেতা যতীন্দ্রনাথ গুরুতর আহত অবস্থায় বালেশ্বর হাসপাতালে নীত হ'য়ে শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পুলিশের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ পরিচালক টেগার্ট যতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে ব'লেছিলেন, "আমি সাহসে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় দেখলাম। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা র'য়েছে—(I have met the brevest Indian I have very high regard for him.)"

এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী ভারতীয় বিপ্লব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে রইলো।

যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ ক'রে সমগ্র ভারতে যে অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হ'য়েছিল তা সফল হওয়া সম্ভবপর হয়নি।

যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলার কলিকাতা প্রবাসী ছাত্র ও যুবকগণের মধ্যে বিপ্লবী দলের সদস্য সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হ'য়েছিল। কয়েকটি ছাত্র ও যুবক ভারতরক্ষা আইন (Defence of India Act) অনুসারে গ্রেপ্তার হ'য়ে অন্তরীণে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন। নন্দীগ্রাম থানার সামসাবাদ গ্রামের ডাক্তারী পাঠরত ছাত্র অতুলচন্দ্র মহাপাত্র, খেজুরী থানার রামচক নিবাসী প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এস্ সি শ্রেণীর ছাত্র বসন্তকুমার দাস এই আইন অনুসারে অন্তরীণ হন। খেজুরী থানার ধবজিভাঙা গ্রামের কলিকাতা প্রবাসী যুবক কর্মী মোহিনীমোহন সামন্তকে এবং রামনগর থানার বেলবণি গ্রামের কলিকাতা প্রবাসী ছাত্র শরৎচন্দ্র পট্টনায়ককেও অন্তরীণ করা হ'য়েছিলো। শরৎবাবু মেদিনীপুরের বিপ্লবী নেতা সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন। শহীদ ক্ষুদিরামের সহিতও তাঁর যোগ ছিলো। তিনি মালদহ ও দিনাজপুর জেলাতে অন্তরীণ জীবন অতিবাহিত করেন। আরও যে সমস্ত ছাত্র ও যুবক বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তাঁদের দলের কার্যে সহায়তায় রত ছিলেন তাঁদের সকলের খোঁজ পাওয়া কঠিন।

শহীদ ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রের এবং নির্যাতিতদের মুকুটমণি হেমচন্দ্রের আত্মত্যাগে ও শত শত বিপ্লবী কর্মীর সাধনায় মেদিনীপুরে যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছিল তার শিখা নেতৃবৃন্দের অন্তর্ধানের

ফলে অনেকটা ম্লান হ'য়ে পড়েছিল এবং বিশ্ব যুদ্ধের দাবাগ্নি বিপ্লবীদের অন্তরে যে আশার আলো পুনরুজ্জীবীত করেছিলো তাও মেদিনীপুরে কোন সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়নি—কিন্তু গান্ধী নেতৃত্বের প্রবল বেগ মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নূতন ধারায় প্রবাহিত ক'রে সমগ্র বঙ্গে ও ভারতে এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি ক'রেছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় মেদিনীপুরের চিরসংগ্রামী রূপটি বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছিল দেখা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মেদিনীপুরের বোমার মামলা

স্মরণীয় ঘটনা

আলিপুরের বোমাব মামলা বঙ্গদেশ তথা ভারতের বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা।

মেদিনীপুরেও একটি বোমার মামলার সৃষ্টি হয়েছিল, যার বিবরণও ঐতিহাসিকের প্রণিধান যোগ্য।

পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি স্বতঃই মেদিনীপুরের দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা, যুবক দলের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য, আখড়া সৃষ্টি, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, তাঁতশালা ও স্বদেশী ভাণ্ডারাদি স্থাপন, বিদেশী বর্জনের (বয়কটের) ব্যাপকতা, নরমদল ও গরমদলের সঙ্ঘর্ষ ইত্যাদি নানা কারণে প্রশাসনের দিক থেকে জেলাটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। জেলা বিভাগের দ্বারা এর সঙ্ঘশক্তি দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা সফল হতে পারেনি।

মজঃফরপুরে মেদিনীপুরের একটি বীর সন্তান ক্ষুদিরাম যে অচিন্ত্যনীয় ঘটনার নায়ক রূপে কার্য করেছিলেন এবং মুরারিপুকুর বাগানের বিপ্লবী চক্রে মেদিনীপুরের অপর দুই বিপ্লবী হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্র নাথের যে কর্ম্ম প্রচেষ্টার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছিল তাতে মুরারিপুকুরের খানাতল্লাস ও কার্যধারার অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরেও পুলিশের জাল বিস্তারিত হতে থাকে। ফলে সৃষ্টি করতে হয়েছিল একটি বোমার মামলা। ইহা পুলিশ অপকীর্ত্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ব্যাপক খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

এই সময়কার ঘটনাবলী অতুলচন্দ্র বসু লিখিত "মেদিনীপুরের বোমার মামলা" ও চিত্তরঞ্জন দাসের "মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস" অবলম্বনে লেখা হল :—

১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই প্রাতে মীরবাজার মহল্লায় প্যারী মোহন দাসের, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ও রাখালচন্দ্র পালের বাড়ী এবং কর্ণেল গোলাতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোসের বাড়ী খানাতল্লাস হল। ঐ দিন রাত্রিতে মীরবাজারের চৌধুরী জনমেজয় মল্লিকের, কেরাণী টোলায় অবিনাশচন্দ্র মিত্র, সদর বাজারের ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, মিয়াবাজারের অতুলচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার ও ডাক্তার অভয়াচরণ চৌধুরী এবং কোতবাজারের মেদিনীবান্ধব সম্পাদক দেবদাস করণের বাড়ী খানাতল্লাসী হ'ল। ৯ই জুলাই কোতবাজারের রাসবিহারী বসুর বাড়ী এবং পুনরায় দেবদাসবাবুর বাড়ী খানাতল্লাসী হয়।

৮ই জুলাইর খানাতল্লাসের ফলে পুলিশ প্যারীমোহন দাসের বাড়ীর বৈঠকখানায় একটি ভাঙ্গা পালকীর পাশে কাঠের চৌকাঠের উপর থেকে ১টি গোলাকার বল বাহির করিয়া পুলিশ তাহা বোমা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সাবধানে গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যারী মোহন দাসের ৩য় পুত্র সন্তোষচন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করেন। পরে ২৩শে জুলাই সন্তোষের পিতা প্যারীমোহনও গ্রেপ্তার হইলেন।

প্যারীমোহন দাস ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সাব্ রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষের আত্মীয়। তাঁহার পুত্র সন্তোষকুমার ছিলেন একজন উৎসাহী স্বদেশী। সত্যেন্দ্রনাথ গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলেও তিনি সংযুক্ত ছিলেন।

মিরবাজারের "বসন্ত মালতী" আখড়ার তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। সহরে যে সকল স্বদেশী শোভাযাত্রা বাহির হইত সন্তোষ তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন।

জেলা কনফারেন্সে যে স্বেচ্ছাসেবক দল চরম পন্থীদের আনুগত্য করিয়াছিল সন্তোষ তাহাদের অন্যতম।

গ্রেপ্তার হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পুলিশ সাব্ ইন্সপেক্টরের চাকরীর জন্য রাঁচীর ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলেন। তিনি ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। ৩রা মে তারিখে তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়া ছিল। কিন্তু তখন পুলিশ অপরাধমূলক কোন দ্রব্য পায় নাই। গোলাকার বলটি বাহির হইলে পুলিশ সাহেব মিঃ ব্রেথ তাহা ১টি রুমালে বাঁধিয়া নিজ হাতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। সন্তোষের মাতা তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই বলটিতে বারংবার আঘাত করিয়াছিলেন।

জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নেলসনের নিকট সন্তোষ বলিয়াছিল যে গোলাকার বলটি একটি 'বেনেটী' মাত্র—যাহা লইয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খেলা করে।

৯ই জুলাই জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভাসিভিন সার্জ্জেন্ট ক্যাপ্টেন উইণ্ডম্যান ঐ গোলাকার বলটি খুলিয়া দেখেন তাহার ভিতর কি আছে। তিনি রিপোর্ট দেন—বলটি খুলিবার সময় দেখা গেল সেটি প্রথমে পাটের ছোবড়া, তাহার গায়ে নানা রংয়ের টুকরা কাপড় এবং সর্ব্বশেষ ছাপা কাগজের টুকরা দিয়া জড়ান। ভিতরে ধূসর রঙের গুঁড়ো কতকগুলি গুলি (shot)। জিনিসটা বেশ শক্ত ভাবে জড়ানো ছিল।

১০ই তারিখ মিঃ ব্রেথ সেটা কলিকাতা রাসায়নিক পরীক্ষকের

নিকট লইয়া যান। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে জিনিসটার ভিতর আছে—সালফাইড অফ আর্সেনিক (মন্‌ছাল) এবং ক্লোরেট অফ পটাশ। তাহার সঙ্গে আছে কতকগুলি (shot)। সাধারণতঃ আছড়ান পটকায় যে বারুদ থাকে ইহাতে তাহাই আছে তবে পরিমাণ কিছু বেশী। বিস্ফোরণ হইলে নিকটবর্ত্তী লোকের পক্ষে সাংঘাতিক হইত।

যেখান হইতে বোমাটি বাহির হইয়াছিল সেখানকার একটু বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। প্যারী দাসের বাড়ীর সম্মুখস্থ মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। সেই রাস্তার উপর সদর দরজা কিন্তু তাহাতে কপাট নাই। সর্বদা খোলা থাকে।

সদর দরজা হইতে বৈঠকখানা পর্যন্ত খোলা উঠান। উঠানের পশ্চিমদিকে কয়েকখানা ঘর। সেই ঘরে শম্ভুনাথ রায় উকিল বাবু ভাড়ায় থাকেন। বৈঠকখানার এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া, অন্য এক দরজা দিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করা যায়। ইহাকে বৈঠকখানা অপেক্ষা 'চলনঘর' বলাই সঙ্গত। যে কেহ ঐ ঘরে বিনা বাধায় আসিতে পারে। সেই ঘরের এক দিকে একটা ভাঙ্গা পালকী রাখা ছিল। তাহার পশ্চাতে কতকগুলি তক্তা ও চৌকাঠ দেওয়ালে ঠেসান ছিল। সেইরূপ একটা চৌকাঠের নিম্ন দিকের কাঠের উপর বোমাটি বসান ছিল। দেওয়ালে একটা জানালা ছিল তাহার একটা গরাদে ভাঙ্গা।

৩১শে জুলাই আবার মীরবাজারে স্বনাম খ্যাত ধনী ও জমিদার গঙ্গারাম দত্তের বাড়ী খানাতল্লাস হইল। ৺গঙ্গারাম দত্ত একসময় বিরাট ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গা পূজা হইত। পূজার তিনদিন আহুত ও অনাহুত সকলকেই পরমাদরে খাওয়ান হইত। গঙ্গারামের মৃত্যুর পর এক সময়ের নীলকর পরে জমিদার ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত মামলায় তাঁহার পুত্রগণ অর্থহীন হইয়া পড়েন। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যহেতু তাঁহাদের এস্টেটের জন্য একজন কমন ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঘটনার সময় কমন ম্যানেজার ছিলেন উকিল মধুসূদন দত্ত এবং

তাঁহার মুহুরী ছিলেন শ্যামলাল সাহা। জমিদারীর কাগজপত্র যে ঘরে রক্ষিত ছিল তাহাই "মহাফেজখানা"। সেই ঘরেই ৩১শে জুলাই সার্চ হইল। অবশ্য তৎপূর্বে দত্ত বাবুদের বসতবাড়ীও সার্চ হইয়াছিল। মহাফেজ ঘরটি তালাবন্ধ ছিল। তাহা ভাঙ্গিয়া পুলিশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করিল। সদর রাস্তার ধারেই সেই ঘরটী। রাস্তার পাশেই একটা জানালা। জানালায় একটা গরাদে ভাঙ্গা। সার্চের পূর্বে দুইজন পুলিশকে সেই ভাঙ্গা জানালার বাহিরের দিকে দুই পার্শ্বে মোতায়েন রাখা হইয়াছিল।

খানিকটা খানাতল্লাসীর পর পুলিশ আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল "পাওয়া গিয়াছে"। গরাদে ভাঙ্গা জানালার নীচে ভিতরের দিকে কতগুলি বাঁধান খাতার তলা হইতে আবিষ্কৃত হইল একটা গোলাকার পদার্থ। পুলিশ বলিল ইহাই বোমা। পুলিশ সাবধানে তাহা হস্তগত করিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হইলেন ৺গঙ্গারাম দত্তের দুই পৌত্র সারদা প্রসাদ দত্ত এবং বরদা প্রসাদ দত্ত, "কমন ম্যানেজার" মধুসূদন দত্ত এবং শ্যামলাল সাহা।

সেই দিন পুলিশ আরো গ্রেপ্তার করেন (১) সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং (২) নিকুঞ্জবিহারী মাইতিকে। "মহাফেজ খানার" পাশের একটা কুঠরীতে যতীন্দ্র ও নিরাপদ বন্দোপাধ্যায় নামে দুই ভ্রাতা রাত্রি বাস করিত। তাহারাও পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইল। সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন মির্জা বাজারের হনুমান বীর মন্দিরের পুরোহিত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। ৮ই জুলাই এই উপেন্দ্রবাবুর বাড়ী সার্চ হয়। সেদিন কিন্তু সুরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। সুরেন্দ্র ছিলেন "বসন্ত মালতী" আখড়ার একজন সদস্য এবং সন্তোষ রাঁচী গমন করিলে তাহার স্থলে সুরেন্দ্র হইলেন আখড়ার ক্যাপ্টেন। সুরেন্দ্রও স্বেচ্ছাসেবকদলভুক্ত ছিলেন এবং অন্য সব তরুণদের মত শোভাযাত্রায় যোগদান করিতেন।

নিকুঞ্জ মাইতি ছিলেন মেদিনীপুর কালেক্টারীর একজন কেরানী। চরমপন্থী বলিয়া তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হয়। ধৃত আসামীগণের

১৫ই আগস্ট জামিন প্রার্থনা করা হয়। বিচারক আদেশ দিলেন—দুইজন আসামী একরার করিয়াছে। একরার হইতে জানা যায় যে নিরাপদ ব্যতীত অন্য সকলেই মিয়াবাজার গুপ্ত সমিতির সভ্য। সুতরাং একমাত্র নিরাপদকে জামিন দেওয়া হইল। অন্য সকলে হাজতে থাকিবে।

এইদিন জানা গেল যে সন্তোষ চন্দ্র দাস এবং সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অপরাধ স্বীকার করিয়া বিবৃতি প্রদান করিয়াছে।

২৮শে ও ২৯শে আগস্ট আবার কতকগুলি বাড়ী খানাতল্লাস করা হইল এবং আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইল। সার্চ হইল—(১) রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনের গোপপ্রাসাদ। কর্ণেল গোলার কাছারি বাড়ী এবং আবাস গড়ের বাড়ী। রাজার নাড়াজোলের বাড়ীও সার্চ হইল।

(২) দেবদাস করণের মেদিনীবান্ধব অফিস ও তাঁহার শিরোমণি গ্রামের বাড়ী সার্চ হইল।

গ্রেপ্তারের তালিকা

গ্রেপ্তার হইলেন :—

(১) রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন (২) অবিনাশ চন্দ্র মিত্র (৩) যামিনী নাথ মল্লিক (৪) মন্মথনাথ কর (৫) উপেন্দ্রনাথ মাইতি (৬) নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৮) দেবদাস করণ (৯) অখিলচন্দ্র সরকার (১০) রাসবিহারী বসু (১১) পরাগচন্দ্র চাবড়ী (১২) যতীন্দ্রনাথ দাস (১৩) গোষ্ঠ বিহারী চন্দ্র (১৪) কৈলাসচন্দ্র দাস মহাপাত্র (১৫) জগজীবন ঘোষ।

২৯শে আগষ্ট প্রমাণাভাবে প্যারিমোহন দাস, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খালাস দেওয়া হইল। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আলিপুর বোমার মামলার আসামী করিয়া আলিপুর পাঠান হইল। পরে আসামী শ্রেণীতে যোগ করা হইল—(১) নলিনীনাথ সেনগুপ্ত (২) গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, (৩) মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও কিষণচন্দ্র সাহাকে। আসামী করা হইল কিন্তু পুলিশ

মতিলালকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। মতিলাল মুখোপাধ্যায় কিছু-দিন অন্তরালে থাকিবার পর স্বয়ং আসিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

(খ) মেদিনীপুরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী মজহরুল হক ছিলেন নারায়ণগড় ট্রেন ধ্বংস ব্যাপারের এবং বর্তমান মোকদ্দমার তদন্তকারী। তাঁহার গৃহের সন্নিকটে একটি নর্দমার ভিতর হইতে একটি বোমা আবিষ্কৃত হয় কিন্তু পুলিশ এই ব্যাপারে কোন মনোযোগ দেয় নাই।

সারদা প্রসাদ দত্তের মহাফেজ থানা হইতে যে বোমাটি পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষকের রিপোর্ট হইল যে বোমাটি সালফাইড অফ আর্সেনিক ও ক্লোরেট অফ পটাশ দ্বারা প্রস্তুত। বোমাটির ভিতরে ছিল ২৩৮টি বড় গুলি (shot) এবং ৪২টি ছুঁচালো লোহার পেরেক। প্রত্যেকটি ⅞" লম্বা। বারুদগুলি ও পেরেক একসঙ্গে বেশ মজবুত করিয়া লাল রঙের পাটের সঙ্গে বাঁধা। পাটের বাঁধনের মধ্যেও সাতটি ধারাল পেরেক ছিল। নিকটবর্তী লোকের পক্ষে বোমাটি খুব বিপজ্জনক।

নর্দমার ভিতর হইতে যে বোমাটি পাওয়া গিয়েছিল তাহাও সালফাইড অফ আর্সেনিক ও ক্লোরেট অফ পটাশ দ্বারা প্রস্তুত। বোমার ভিতরে ছিল ছয়টি সীসার গুলি। প্রত্যেকটির ওজন ৭৫ গ্রেন, এবং ১১টি লোহার পেরেক। সবগুলি লাল কাগজে মোড়া। তাহার উপর কাপড়ের ফালি ও পাটের বাঁধন। এই বোমাটিও কাছাকাছি লোকের পক্ষে বিপদজনক।

পুলিশের প্রথম এজেলা

ডেপুটি পুলিশ সুপার মৌলবী মজহরুল হক ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯০৮) তারিখে এই মামলায় প্রথম এজেলা প্রদান করেন। তাহার সারাংশ এইরূপ ঃ—

নারায়ণগড় ট্রেন ধ্বংস মোকদ্দমার তদন্ত করবার সময় মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের সূত্র পাই। এই সমিতি মেদিনী-

পুরের নানা স্থানে এবং অন্যত্র কার্য করিতেছে। মেদিনীপুরেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোমা, বিস্ফোবক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা হত্যা করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সংবাদ পাইয়া সমিতির কার্য কলাপেব উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সমিতিব সদস্যগণ যে যে স্থানে মিলিত হইয়া তাহাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য ও অন্যান্য আইন বিরুদ্ধ মতলব সিদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র করিত তাহাদেব কতকগুলি নাম প্রদত্ত হইল :—মেদিনীপুর শহরে—

(১) বসন্ত মালতী আখড়া, (২) মল্লিকবাবুদের রাসমঞ্চ এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যক্তিব বাড়ী ও স্থান : (৩) কামিনী বেশ্যা (৪) গঙ্গারাম দত্ত (৫) গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) যামিনী মল্লিক (৭) মহিষাদল রাজবাড়ী (৮) দেবদাস করণ (৯) উপেন্দ্রনাথ মাইতি (১০) সারদা চরণ দত্ত (১১) ত্রৈলোক্যনাথ পাল (১২) সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৩) প্যারিলাল ঘোষ (১৪) অধরচন্দ্র রায় (১৫) যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক (১৬) রাজবালা বেশ্যা (১৭) এ্যাসিসট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বি, দে (১৮) হনুমানজীর মন্দির (১৯) অমর সরকার (২০) উমেশচন্দ্র দত্ত (২১) ময়ুরভঞ্জের রাজবাড়ী প্রাঙ্গন (২২) দেবদাস করণের প্রেস (২৩) লালদীঘি।

এই সমস্ত স্থানে প্রায় ১৫৪ জন লোক মেলামেশা করিত। তাহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সংবাদ পাইয়া অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ ও বিস্ফোরকেব সন্ধানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শরৎ বেরা, যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষ চন্দ্র দাস ও বরোদা প্রসাদ দত্তের বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয়। খানাতল্লাসের ফলে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল। তবা যে যে খানাতল্লাসী হইযাছিল তাহার ফলে অস্ত্র আইনের ধারায় সত্যেন্দ্র, যোগজীবন ও শরৎচন্দ্রদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। তাহাতে তাহাদের যথাক্রমে দুইমাস ও এক মাস করিয়া কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্ট আপীলে যোগজীবন ঘোষ খালাস পায়।

এপ্রিল মাসের শেষে ক্ষুদিরাম বসু যে হাতির দাঁতের হাতল-

ওয়ালা ৪৫০ বোবের পিস্তল লইয়া মজঃফরপুরের জেলা ও সেশন্ জজ্ মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়াছিল তাহা পুর্বে সতেন্দ্রনাথ বসুর নিকট ছিল। সত্যেন্দ্র এখন অলিপুর মামলায় বিচারাধীন আছেন।

খানাতল্লাসীর ফলে যে সকল অপরাধ মূলক কাগজপত্র মেদিনীপুর এবং অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতি কলিকাতার গুপ্ত সমিতিব সহিত সংশ্লিষ্ট। কলিকাতার কতকগুলি সদস্য এখন আলিপুরে বিচারাধীন আছে। সন্তোষ চন্দ্র দাস ও সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে ২৯শে জুলাই এবং ১৫ই আগষ্ট অপরাধ স্বীকার করিয়াছে এবং পূর্বোক্ত ১৫৪ জনের মধ্যে ৬২জনকে জড়িত করিয়াছে। খানাতল্লাসীর ফলে সন্তোষ দাসের গৃহ হইতে একটি এবং বরদা প্রসাদ দাসের বাড়ী হইতে একটি তাজা বোমা পাওয়া গিয়েছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে ঐ দুইটি বোমা মিঃ ওয়েষ্টনকে হত্যা করিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। অতএব আমি আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের ৬৬ আইনের (ভাবতীয় বিস্ফোবক আইন) ৪।৫।৬ ধারা মতে প্রথম এত্তেলা দাখিল করিলাম।

১৫৪ জন আসামীর তালিকার মধ্যে জমিদার ২৮ জন, উকীল ১৭ জন, মোক্তার ৫ জন, ডাক্তার ৬ জন, ব্যবসায়ী ২০, সরকারী চাকুরীয়া ১১ জন, অন্য চাকুরীয়া ৬ জন, ছাত্র ২৮ জন, টাউট ৭ জন, বাকী ১৬ জন। অন্যান্য বৃত্তিজীবী ছিলেন আসামীদের মধ্যে একমাত্র মীর বাজারের অধিবাসী ৫৭ জন। নীচে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হল।

জমিদার ঃ—(১) নরেন্দ্র লাল খাঁন (২) নবীন চন্দ্রকোটাল, (৩) যামিনী নাথ মল্লিক (৪) হেমচন্দ্র কুণ্ডু (৫) সারদা নাগ (৬) নটবর দত্ত (৭) হরেকৃষ্ণ কোটাল (৮) গিরা বেনিয়া (৯) লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (১০) আশুতোষ রায় (১১) সরোজ রঞ্জন পাল (১২) অবিনাশ চন্দ্র মিত্র (১৩) যোগিনী ঘোষ (১৪) বরদা প্রসাদ দত্ত (১৫) রামমোহন সিংহ (১৬)

মন্মথ নাথ পাল (১৭) হারাধন মল্লিক (১৮) জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী (১৯) ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরী (২০) অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২১) প্রসাদ চন্দ্র মিত্র (২২) রতন (ওঃ ভূপতি) মল্লিক (২৩) সারদা প্রসাদ দত্ত (২৪) জগন্নাথ ভকত (২৫) প্রমথ নাথ কর (২৬) যোগেন্দ্র নাথ মল্লিক (২৭) মনোমোহন সিংহ (২৮) নারায়ণ চন্দ্র পাল (২৯)।

উকীল ঃ—(১) উপেন্দ্র নাথ মাইতি (২) রাধানাথ পতি (৩) খগেন্দ্র (ও ঃ রমেশ) বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) মতিলাল মুখার্জী (৫) জয়হরি বেরা (৬) নিবারণ চন্দ্র মিত্র (৭) গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৮) বরেন পাল (৯) মধুসূদন দত্ত (১০) কুমেদ ঘোষ (১১) ত্রৈলোক্য নাথ পাল (১২) উপেন্দ্র নাথ ঘোষ (১৩) ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ (১৪) শম্ভুনাথ রায় (১৫) গঙ্গাধর ঘোষ (১৬) প্যারী লাল ঘোষ (১৭) প্রকাশ চন্দ্র মাইতি।

মোক্তার ঃ—(১) গোবিন্দ পাল (২) কৈলাস দাস (৩) সত্যচরণ মুখার্জী (৪) রাজেন্দ্র ব্যানার্জী (৫) রঘুনাথ সাহা।

ডাক্তার ঃ—(১) পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২) অভয় চরণ কুণ্ডু (৩) শশীভূষণ লাহা (৪) পিয়ারী ডাক্তার (৫) চুনীলাল দত্ত (৬) শচীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী।

ব্যবসায়ী ঃ—(১) আশুতোষ কুণ্ডু (২) রামচরণ নন্দী (৩) আশুতোষ দত্ত (৪) কিষণ সাহা (৫) আশুতোষ সেন (৬) অন্নদাপ্রসাদ দে (৭) অম্বিকা সিকদার (৮) নন্দ রায় (৯) যদুনাথ সাহা (১০) বিনোদ সাহা (১১) প্রসন্ন সাহা (১২) যোগী সাহা (১৩) নিবারণ কুণ্ডু (১৪) আশুতোষ দে (১৫) শিব বেরা (১৬) পূর্ণচন্দ্র দে (১৭) যতী সিংহ (১৮) কান্তি সেন (১৯) রামচরণ রায়।

ছাত্র ঃ—(১) অতুলচন্দ্র বসু (২) যতীন্দ্রনাথ দাস (৩) গোষ্ঠবিহারী দে (৪) সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস (৫) ভোলা ভকত (৬) বিজয় দত্ত (৭) মন্মথ নাথ মিত্র (৮) শৈলজানন্দ সেন (৯) ব্রজেন্দ্র মাইতি (১০) বিভূতি ভূষণ দত্ত (১১) অমূল্য বসু (১২) যোগজীবন ঘোষ (১৩) সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (১৪) মন্মথ নাথ রায় (১৫) রাজকুমার সিংহ (১৬) শরৎ চাবাড় (১৭) বিনয়কৃষ্ণ দে (১৮) মনীন্দ্র ঘোষ (১৯) প্রভাস দত্ত (২০) রাজেন্দ্র

নাথ কুণ্ডু (২১) পরিতোষ দাস (২২) গোবিন্দ চন্দ্র মুখার্জী (২৩) হরেন্দ্র নাথ সরকার (২৪) চারুচন্দ্র বসু (২৫) নবীন দে (২৬) চারুচন্দ্র দাস (২৭) বিজয়কুমার দে (২৮) শরৎ চন্দ্র দত্ত।

সরকারী চাকুরীয়া ঃ—(১) অখিল চন্দ্র সরকার (২) আশুতোষ দাস (৩) প্রমথনাথ বসু (৪) রাখালচন্দ্র পাল (৫) পরেশনাথ চক্রবর্তী (৬) সত্যচরণ কর (৭) নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি (৮) সতীশ বিশ্বাস (৯) হেমচন্দ্র কর (১০) সুরেশ চন্দ্র দাস (১১) সন্তোষ দাস (১২) জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩) মিহির চন্দ্র দত্ত (১৪) ভরত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫) সুকুমার রায় (১৬) শীতল প্রসাদ রায় (১৭) মন্মথ নাথ বসু (১৮) ভূদেব দাস (১৯) অমর চন্দ্র রায় (২০) হীবন্ময় সেন।

অন্য চাকুরীয়া ঃ—(১) কালীচরণ বসু (২) খগেন্দ্রনাথ সরকার (৩) গোসাই দাস ঘোষ (৪) অন্নদা চরণ পাল (৫) মন্মথনাথ দে (৬) শ্যামলাল সাহা।

টাউট ৭ জন। অবশিষ্ট ১৬ জন ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন মেদিনী বান্ধব সম্পাদক দেবদাস করণ, গায়ক তাদ্দক খাঁন এবং মেদিনীপুরের আদি বিপ্লবী শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু।

২৮ জনের গ্রেপ্তার

প্রথম প্রস্তাবে ১৫৫ জনের মধ্যে কেবলমাত্র ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। তাহাদের মধ্যে প্যারী মোহন দাস, যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিনজনকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ২৫ জনের বিরুদ্ধে সরকার মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি প্রদান করেন। পরে আরও দুইজন মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও কিষাণ সাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে না পারায় কেবলমাত্র ২৫ জনের বিরুদ্ধেই ৭ই সেপ্টেম্বর মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। মতিলাল মুখোপাধ্যায় ১৭ই অক্টোবর আত্মসমর্পণ করেন। কিষাণ সাহা আদৌ গ্রেপ্তার হন নাই। এই ২৭ জন আসামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল ঃ

(১) নরেন্দ্র লাল খাঁন—নাড়াজোল ও মেদিনীপুর জমিদারীর মালিক।

(২) অবিনাশ চন্দ্র মিত্র —জমিদার ও শহরের অন্যতম ধনী।

(৩) যামিনী নাথ মল্লিক— " " " "

(৪) উপেন্দ্র নাথ মাইতি—স্বনাম প্রসিদ্ধ উকিল।

(৫) মন্মথ নাথ কর—জমিদার।

(৬) খগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জমিদার + উকিল।

(৭) গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— " "

(৮) দেবদাস করণ সম্পাদক, মেদিনীবান্ধব পত্রিকা এবং নির্ভীক দেশসেবক।

(৯) অখিল চন্দ্র সরকার—কালেক্টারীর আমলা, পরে কর্ম্মচ্যুত।

(১০) রাসবিহারী বসু—মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের চিত্র শিক্ষক এবং চিত্র শিল্পী।

(১১) পরাণ চন্দ্র চাবড়ী—দরিদ্র সূত্রধর।

(১২) যতীন্দ্র নাথ দাস—বি, এ, পাশ যুবক, স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী।

(১৩) গোলকবিহারী চন্দ—সুগায়ক + সঙ্গীত শিক্ষক।

(১৪) সন্তোষ চন্দ্র দাস—প্যারী মোহন দাসের পুত্র, স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক। বসন্ত মালতী আখড়ার ক্যাপ্টেন। ইহার বাড়ী হইতে একটি বোমা পাওয়া যায়। পুলিশের চাকুরী লইয়া ট্রেনিং এ ছিলেন।

(১৫) আশুতোষ দাস—সন্তোষ চন্দ্র দাসের অগ্রজ ভ্রাতা + পোষ্ট অফিসের সর্টার।

(১৬) সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—মীর বাজারের হনুমানজীর মন্দিরের পরিচালক, বসন্তমালতী আখড়ার অন্যতম পরিচালক—স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক।

(১৭) যোগজীবন ঘোষ—উকিল উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র + সন্তান

সমিতির বিশিষ্ট সদস্য+স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক+সত্যেন্দ্র নাথের বিশ্বস্ত সহচর।

(১৮) নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি—মেদিনীপুর কালেক্টারীর কর্ম্মচারী +চরমপন্থী বলিয়া কর্ম্মচ্যুত।

(১৯) সারদা প্রসাদ দত্ত— } দুই ভ্রাতা শহরের স্বনাম প্রসিদ্ধ
(২০) বরদা প্রসাদ দত্ত— } ধনী জমিদার; গঙ্গারাম দত্তের পৌত্র এবং উমেশ চন্দ্র দত্তের পুত্র। ইহাদের মহাফেজ খানা হইতে ১টি বোমা পাওয়া যায়।

(২১) মধুসূদন দত্ত—ব্যারীষ্টার মিঃ কে, বি, দত্তের জ্ঞাতি ভাই, উকিল এবং দত্ত জমিদার বাবুদের ষ্টেটের কমন ম্যানেজার। যে মহাফেজ থানা হইতে বোমা বাহির হয় সেই কুঠী ইহার হেপাজতে ছিল।

(২২) শ্যামলাল সাহা—পূর্বোক্ত দত্ত বাবুদের জমিদারী সেরেস্তার মুহুরী।

(২৩) নলিনী নাথ সেনগুপ্ত—মহিষাদল রাজার আমমোক্তার এবং উকিল।

(২৪) কৈলাস চন্দ্র দাস মহাপাত্র—মোক্তার এবং স্বদেশী আন্দোলনের উগ্র সমর্থক।

(২৫) গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়—বালকছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক।

(২৬) মতিলাল মুখোপাধ্যায়—স্বনামধন্য ফৌজদারী উকিল।

(২৭) কিষাণ সাহা—ব্যবসায়ী যুবক এবং স্বেচ্ছাসেবক।

জামিনের চেষ্টা

উল্লিখিত আসামীগণের জামিনের আবেদন ৪ঠা সেপ্টেম্বর অগ্রাহ্য করা হয়। পুলিশ আইনজীবীদিগকে ভয় দেখাতে লাগলেন যেন কেউ আসামীদের পক্ষ সমর্থন না করেন। তথাপি মি. কে. বি. দত্ত, এ. চৌধুরী, এইচ. মল্লিক, কিজ, গড্‌ফ্রে, এ. সি. দত্ত প্রভৃতি ব্যারিষ্টার এবং প্যারীলাল ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, বঙ্কিমচন্দ্র

ঘোষ, জ্যোতিপ্রসাদ চ্যাটার্জী, উপেন্দ্রনাথ হাজরা, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী, সন্তোষকুমার ব্যানার্জী প্রমুখ আইনজীবীগণ আসামীদের পক্ষ সমর্থনে সম্মত হন।

আসামীদিগকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পশ্চিম ডিগ্রীর এক একটি নির্জন কক্ষে রাখা হয়। এই কক্ষগুলি একেবারে আলো-বাতাসহীন—এইগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলার সুপারিশ বহু দিন থেকে ছিল। জামিন না পেয়ে এতগুলি গণ্যমান্য সম্পন্ন ব্যক্তি জঘন্য জেল হাজতে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে লাগলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি. এইচ্ রীডের এজলাসে বোমার মামলার বিচার আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালাতে আসেন মিঃ ব্যাক্স্টার। রাজা নরেন্দ্রলাল খানের পক্ষে ছিলেন—মিঃ কীজ ও মিঃ আর. কে. নাগ। অন্যান্য আসামীদের পক্ষে ছিলেন —মিঃ কে. বি. দত্ত। মি. গড্ফ্রে, মিঃ এ. এন. চৌধুরী, মিঃ এ. সি. দত্ত, মিঃ এইচ. মল্লিক। স্থানীয় উকীলগণ ইহাদিগকে সাহায্য করেন।

১০ই সেপ্টেম্বর আসামীগণের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হল। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিচারপতিগণ রায় দিলেন যে রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। যাঁরা তাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট বলে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। অন্য আসামীদের সম্বন্ধে বিচারপতি বললেন যে সরকার ২৩শে অক্টোবর থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে রীতিমত মামলা চালাবেন বলেছেন কাজেই আপাততঃ তাঁদেরকে জামিন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি মত ২৩শে থেকে রীতিমত মোকদ্দমা চালাতে না পারেন তাহলে তাঁরা জামিনের জন্য পুনরায় প্রার্থনা করতে পারবেন।

নজরবন্দীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে ২০শে সেপ্টেম্বর রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনকে ৫০,০০০ হাজার টাকা করে দু'জন জামিনদারের জামিনে মুক্ত করা হয় এবং তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয়ে তাঁর প্রাসাদে পুলিশ প্রহরা

রাখতে হয়। "মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস" পুস্তকে লেখা হয়েছে—"মুক্তির পূর্বে তাঁহার কাছারির সর্বত্র তল্লাসী করা হয়। তল্লাসকারী পুলিশ দল রাজ কাছারিতে রক্ষিত সমস্ত তরবারি, রাইফেল, বন্দুক ও কার্টরিজ হস্তগত করিয়া একটি ঘরে রাখিয়া চাবি লাগাইয়া চাবি নিজেদের কাছে রাখিল। রাজাকে দ্বিতলে থাকিতে দেওয়া হইল। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বেয়নেট সমেত রাইফেল লইয়া প্রহরায় নিযুক্ত হইল। প্রধান দুইটি ফটকে দুই জন, নীচ তলায় অফিসের সম্মুখে দুই জন, দুই জন সিঁড়িতে উপর তলায় প্রহরী বসান হইল। ম্যানেজার, রাণী, রাজার দুই পুত্র, তাঁহার খুল্লতাত, খুড়িমা, জামাতা, জামাতার ভাই, ছয় জন ভৃত্য, রাজশ্বশুর, দুই জন পাংখাপুলার ও একজন পাচক মাত্র রাজার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইল।"

১লা অক্টোবর হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র অন্যতম বিচারপতি কক্সের মতের বিরুদ্ধে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা বলে সন্তোষ ও সুরেন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য আসামীদের জামিনে মুক্তির আদেশ দিলেন ২রা অক্টোবর থেকে এঁরা খালাস হলেন। যামিনীনাথ মল্লিক, উপেন্দ্রনাথ মাইতি, মন্মথনাথ কর, অবিনাশচন্দ্র মিত্র প্রত্যেককে ৫০,০০০ হাজার টাকার জামিন, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২০,০০০ হাজার টাকার জামিন, যোগজীবন ঘোষ ও দেবদাস করণের প্রত্যেককে ১০,০০০ হাজার টাকার জামিন এবং অন্যান্য আসামীকে ১৫,০০০ হাজার টাকা হতে ৬০০০ হাজার টাকার জন্য জামিন দিতে হলো।

বিচার পর্ব্ব

৪ঠা নভেম্বর সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালাবার জন্য এলেন স্বয়ং এড্‌ভোকেট জেনারেল মিঃ এস. পি. সিংহ (পরে লর্ড সিংহ)।

ইতিমধ্যে আসামী সন্তোষচন্দ্র দাস ২৯শে জুলাই এবং আসামী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫ই আগষ্ট তাঁদের একরার দাখিল করে-

ছিলেন। ৩১শে আগষ্ট তারিখে সন্তোষ ও সুরেন্দ্র নিজেদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন।

৪ঠা নভেম্বর মেদিনীপুরের মীরবাজার মহল্লার অধিবাসী রাখালচন্দ্র লাহাকে সরকার পক্ষের প্রথম বেসরকারী সাক্ষী রূপে কাঠ গড়ায় হাজির করা হল। তার জবান বন্দীটি 'যেমনই অভিনব তেমনিই চমকপ্রদ' বলে 'মেদিনীপুরের বোমার মামলা' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। তার বিবৃতি এইরূপ ঃ—'একদিন রাত্রিতে সে অবিনাশ মিত্রের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় স্কুল বাজারে তাহাকে পুলিশ ৫ আইনের অপরাধে অর্থাৎ মাতলামি করার জন্য গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনিল। তথায় তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার প্রদত্ত হইল। তখন সে কাতর হইয়া দয়া ভিক্ষা করিলে তাহাকে বলা হইল যে তাহাকে যাহা যাহা করিতে বা বলিতে বলা হইবে তাহা যদি করিতে বা বলিতে সে সম্মত হয় তবে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে। নচেৎ তাহাকে জেলে পাঠান হইবে। সে পুলিশের রুদ্র মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থে ও পুলিশের নিকট পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় পুলিশের শিক্ষামত কার্য করিতে সম্মত হইল।

তখন তাহাকে এই মামলা সম্বন্ধে যাহা বলিতে হইবে তাহা শেখান হইতে লাগিল। এক একদিনের সম্বন্ধে যাহা বলিতে হইবে তাহা একটা কাগজে লেখা হইতে লাগিল এবং তাহাকে মদ খাওয়াইয়া ও প্রলুব্ধ করিয়া তাহাতে তাহার স্বাক্ষর লওয়া হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া আসামীগণের সম্বন্ধে নানা কথা, বহু বহু সভা সমিতির কথা তাহাকে আদালতে বলিবার জন্য শেখান হইতে লাগিল। পড়িয়া মুখস্থ করিবার জন্য কতক কতক ঘটনার কথা পৃথক কাগজে লিখিয়া দেওয়া হইল। তাহাকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দেওয়া হইত এবং নাড়াজোল রাজার গোপ প্রাসাদ তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল।

কিন্তু শেষে তাহার মনে অনুতাপ আসিল। সে দেখিল যে তাহার এই কার্যের ফলে সহরের অনেক নির্দোষ সম্ভ্রান্ত লোক কষ্ট পাইতেছেন এবং জেলে যাইবেন। তখন সে আদালতে সত্য কথা বলিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল। এখন আদালতে সে যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য। রাখাল আরও বলিল যে তাহার স্বাক্ষরিত রিপোর্টে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা সমস্ত মিথ্যা ও ভুল এই কথা সে রিপোর্টে সর্বনিম্নে লিখিয়া রাখিয়াছে।

রাখালের এই প্রকার জবানবন্দী শুনিয়া সরকার পক্ষ আকাশ হইতে পড়িলেন—তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট আনীত হইল। রিপোর্টের নিম্নে দেখা গেল সত্য সত্যই লেখা আছে "এ সমস্ত ভুল"।

এডভোকেট জেনারেল কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য তিনি মোকদ্দমার মুলতুবী প্রার্থনা করিলেন। ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী রহিল। রাখালকে ৯ই নভেম্বর পুনরায় হাজির হইবার আদেশ দিয়া তাহার নিকট জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এইদিন মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ২০,০০০ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি পাইলেন। ৯ই নভেম্বর মোকদ্দমা আবার উঠিল। এই দিন এডভোকেট জেনারেল ২৭জন আসামীর মধ্যে সন্তোষ, সুরেন্দ্র ও যোগজীবন বাদে অবশিষ্ট ২৪ জন আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণাভাবে মোকদ্দমা তুলিয়া লইলেন। ২৪ জন আসামী বেকসুর মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রাখাল লাহার নামে মিথ্যা ভাষণের অভিযোগ উত্থাপিত হইল। বিচারে রাখাল ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

২৪ জন আসামীকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট ৩ জনের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা চলিয়াছিল—তাহাও হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসিয়া যায়। সুতরাং রাখালের জবানবন্দী যে সত্য তাহা প্রকারান্তরে সাব্যস্ত হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া রাখালের যে সত্য ভাষণের স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল এবং তাহার জন্য দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতে

সে অগ্রসর হইয়াছিল এই সুবুদ্ধি ও সৎসাহস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। আত্মবিলোপ করিয়া দেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত নির্দোষ বহুজনের কল্যাণ সাধন রাখালের মহানুভবতারই পরিচয় দিতেছে।"

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি. এইচ রীডের এজলাসে দীর্ঘদিন সন্তোষ, সুরেন্দ্র ও যোগজীবনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলেছিল। ৩০।১১।০৮ তারিখে বিচারক তিনজন আসামীকেই দায়রা সোপর্দ করলেন।

১৯০৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকে দায়রা বিচার আরম্ভ হল। মিঃ স্মিথারকে দায়রা জজ্ স্বরূপে মেদিনীপুরে আনা হল। সন্তোষ, সুরেন্দ্র ও যোগজীবনের পক্ষে দাঁড়ালেন ব্যারিষ্টার মিঃ কে. বি. দত্ত। যোগজীবনের পক্ষে তাঁর পিতা উকিল উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মোকদ্দমার ভার নিলেন। সরকার পক্ষে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ গ্রেগরী মোকদ্দমা চালাতে এলেন।

৫৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হল। তাদের মধ্যে ৩৭ জন পুলিশ এবং সরকারী কর্মচারী এবং মাত্র ১৬ জন বে-সরকারী লোক ছিলেন। ৩০।১।০৯ তারিখে দায়রা জজ মিঃ স্মিথার তিনজন আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করে সন্তোষ ও যোগজীবনকে ১০ বৎসরের জন্য এবং সুরেন্দ্রকে ৭ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিলেন।

"মেদিনীপুরের বোমার মামলা"—পুস্তকে লিখিত হয়েছে যে "মিঃ স্মিথার রায় প্রদান করিয়াই মেদিনীপুর ত্যাগ করিলেন। যাহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা প্রকাশ করিল যে পূর্ব্ব রাত্রিতে কলিকাতা হইতে কয়েকজন সাহেব বিবি মিঃ স্মিথারের অতিথি হইয়াছিলেন এবং রাত্রিতে প্রচুর ভোজ ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়। মিঃ স্মিথার যে রায় লিখিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তন করিয়া নূতন ভাবে রায় লিখিত হয় এবং পরিত্যক্ত পাতাগুলি পোড়াইয়া ফেলা হয়। প্রভাতে অনেক পোড়া কাগজ বাংলোর প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। ইহা প্রকৃত ঘটনা অথবা অমূলক রচনা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স্ জেঙ্কিন্স্ এবং অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে আপীলের শুনানী হইল। সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালালেন—তৎকালীন এড্ভোকেট জেনারেল মি. গ্রেগরী। দাশরথি সান্যাল, দেবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এস. সি. মিত্র ও অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায় আসামী যোগজীবনের, এ. চৌধুরী, কে. সি. বসু, অমরেন্দ্রনাথ বসু ও যতীন্দ্রনাথ সেন আসামী সন্তোষের, কে. বি. দত্ত, অজয় দত্ত ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় আসামী সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন।

১৯০৯ সালের ১৭ই মে থেকে ২১শে মে এবং ২৪শে মে থেকে ২৭শে মে মোট ৭ দিন উভয় পক্ষের ব্যবহারজীবিগণের সওয়াল জবাব হয়। বিচারপতিগণ আসামীদের দণ্ডাদেশ বাতিল করে তাহাদিগকে বেকসুর খালাস দেন।

হাইকোর্টের রায়

১৯০৯ সালের ২৭শে মে উভয় পক্ষে সওয়াল জবাব শেষ হইল। বিচারপতিগণ ১লা জুন রায় প্রদান করিলেন। তাহারা ৩ জন আসামীকেই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি দিলেন। তাদের রায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম :—

(১) আসামীদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে তাহা আইন সঙ্গত নহে। আসামী কাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল। এই মোকদ্দমায় যোগ জীবনের বিরুদ্ধে প্রমাণ—(১) সন্তোষ ও সুরেন্দ্রের একরার।

(২) আবদার রহমনের সাক্ষ্য।

সন্তোষের বিরুদ্ধে প্রমাণ—

(১) তাহার নিজের একরার।

(২) সুরেন্দ্রের একরার।

(৩) তাহার গৃহে বোমা প্রাপ্তি।

(২) চার্জ্জে অপরাধ করার সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—১৯০৮ সালের ৬ই জুন হইতে। কিন্তু তৎপূর্ব্বের বহু ঘটনার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা আসামীদের ক্ষতি করা হইয়াছে।

(৩) একজিবিট (Exibit) ৫৬ আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই দলিল দ্বারা কেবলমাত্র জানা যায় যে সরকার পক্ষ কিভাবে মামলাটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, ইহা সরকার পক্ষের ভিত্তিভূমি মাত্র। এই দলিলের যদি কোন মূল্য থাকে—তবে তাহা মামলার সমর্থক নহে। ইহা মামলার ধ্বংসাত্মক।

(৪) সন্তোষের একরার আদৌ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পুলিশের চাপে ও প্রলোভনে সন্তোষ যে একরার করিয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ৭ই জুলাই পুলিশ সন্তোষের বাড়ী সার্চ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন পুলিশ সংবাদ পাইয়াছে যে সন্তোষের বাড়ীর বৈঠকখানায় ১টী বোমা আছে। সার্চ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হওয়ায় এবং খানাতল্লাসীর ফলে কোন কিছু পাওয়া গেলে তাহা আদালতে দাখিল করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ৮ই জুলাই ভোরে সন্তোষের বাড়ী সার্চ হয় এবং একটি গোলাকার জিনিষ যাহা বোমা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা পাওয়া যায়। বেলা ১১টার সময় সন্তোষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার গৃহে প্রাপ্ত জিনিষটি পরীক্ষা সাপেক্ষে সন্তোষকে হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হয়। সন্তোষকে থানার হাজতে রাখা হইয়াছিল। সেই রাত্রে মৌলবী সন্তোষের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে থানায় সন্তোষের সহিত দেখা করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। মৌলবী অবশ্য তাঁহার এজাহারে বলিয়াছেন যে তাঁহার কিছু স্মরণ হয় না কিন্তু ভদ্রমহিলা সন্তোষের মাতাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। সন্তোষের মাতা সন্তোষের সহিত দেখা করিল থানায় নহে, থানার সন্নিকটে এক পুলিশ কর্মচারীর গৃহে। সন্তোষের মাতা পুত্রকে উপদেশ দেন যে মৌলবীর উপদেশমত

কার্য্য কর নচেৎ বিষয় সম্পত্তি সব যাইবে এবং তোমার দুই ভ্রাতা ও পিতাকে কারাগারে যাইতে হইবে। ইহাতে সন্তোষ উত্তর দিয়াছিল--তুমি কেন আসিয়াছ এখান হইতে চলিয়া যাও। এজাহারে সন্তোষের মাতা এই কথা বলিয়াছেন। ৯ই জুলাই সন্তোষকে কোর্টে হাজির করা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট অর্ডার সীটে লিখিলেন—"সন্তোষ একরার করিল না। ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতে রাখা হউক।" "সন্তোষ একরার করিল না" এরূপ কথা লিখিবার কারণ কি? নিশ্চয়ই আশা করা হইয়াছিল সন্তোষ একরার করিবে। ইহার দ্বারা সন্তোষের মাতার উক্তিই অনেকটা সমর্থিত হয়। ১০ই জুলাই সন্তোষেব পিতা প্যারীমোহন দাস জেলে সন্তোষের সাথে দেখা করিল। তাহার ভ্রাতা যাহাকে এক সপ্তাহ আগে মজঃফরপুরে বদ্‌লি করা হইয়াছিল সেই আশু দাস মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিল।

১১ই জুলাই মৌলবী জেলে সন্তোষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুমতি পাইলেন। লালমোহন দারোগাও মৌলবীর সহিত গিয়া সন্তোষেব সহিত দেখা করিল। সন্তোষ বলিল—"শরীর খারাপ, কাল আসিবেন।"

১২ই জুলাই মৌলবী ও লালমোহন জেলে সন্তোষের সহিত দেখা করিল। সন্তোষ বলিল—"পিতার সহিত দেখা না করিয়া কোন কিছু বলিতে পারিব না।" জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবর সন্তোষ এক দরখাস্ত লিখিল—"আপনার নিকট কোন কিছু বলবার আগে আমি পিতাব সহিত দেখা করতে চাই।" এই দরখাস্ত জেলের ব্যবহৃত কাগজ নয়। সাধারণ বালি কাগজে লেখা। পুলিশ তাহাকে এই কাগজ দিয়াছিল। সহজেই বোঝা যায় —পুলিশের উপদেশ অনুসারে সন্তোষ এই দরখাস্ত লিখিয়াছিল। এই দিনই সন্তোষের পিতা ও ভ্রাতা আশুতোষ জেলে সন্তোষের সহিত দেখা করিল। ইহার পরেও প্যারী ১৫ই, ১৯শে, ২১শে ও ২২শে জুলাই জেলে সন্তোষের সহিত সাক্ষাৎ করে এই

সময়ের মধ্যে মৌলবী ও লালমোহন বহুবার প্যারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্যারী বলিয়াছে তাহারা প্রায় প্রতিদিনই আসিত। প্যারীর সহিত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টনের দেখা সাক্ষাৎ হইতেছিল। প্যারী বলিয়াছেন—"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমায় কামরায় ডাকিয়া পাঠাইতেন তাই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম। তিনি বলিয়াছিলেন—তোমার ছেলের বিরুদ্ধে ভয়ানক ভয়ানক অভিযোগ রহিয়াছে। তাহার নিকট হইতে বোমা পাওয়া গিয়াছে। তাহার দ্বীপান্তর হইতে পারে, যদি পুত্রের মঙ্গল চাও তবে তাহাকে approver হইতে উপদেশ দাও। তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করা হইবে এবং তোমাদের পরিবারের উপরে আর কোন অত্যাচার হইবে না। প্যারী পুত্রের সহিত দেখা করিলে সন্তোষ বলিল—"যাহা ঘটে ঘটুক। আমি যাহা জানি না তাহা বলিতে পারিব না।" প্যারী যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সন্তোষের এই কথা জানাইল তখন মিঃ ওয়েষ্টন বলিয়াছিলেন যে "তোমাকেও জেলে পাঠাইতে হইবে।" প্যারীর এই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিলেও স্বয়ং মিঃ ওয়েষ্টন স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি দু'তিন দিন প্যারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তখন প্যারীকে বলিয়াছিলেন যে সন্তোষকে বুঝাইয়া যেন সে সব কথা বলে। ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও সন্তোষের একটা একরারের প্রত্যাশা করিতেন। এড্ভোকেট জেনারেল তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে পুলিশ ১২ই জুলাই হইতে ২৯শের মধ্যে আদৌ জেলে সন্তোষের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহা প্রমাণিত হইত যদি জেলের গেট রেজিষ্টার প্রমাণে গৃহীত হইত কিন্তু জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা হইতে দেন নাই। ২৩শে জুলাই সন্তোষকে কোর্টে আনা হইল। প্যারীও মোকদ্দমা তদ্বির করিতে আসিলেন। তাহাকে আদালতেই সন্তোষের চক্ষের সম্মুখে গ্রেপ্তার করা হইল। বৃদ্ধ, রুগ্ন প্রায় দৃষ্টি শক্তিহীন পিতাকে গ্রেপ্তার হইতে দেখিয়া সন্তোষ কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু প্যারীকে গ্রেপ্তার করা হইল কেন? পুলিশ যে সার্চ ওয়ারেন্ট বলে সন্তোষের বাড়ী খানা তল্লাসী করিয়াছিলেন তাহাতে প্যারী মোহন দাসের বাড়ী লেখা ছিল কিন্তু যেদিন সন্তোষকে গ্রেপ্তার করা হইল সেদিন প্যারীকে গ্রেপ্তার করা হইল না। প্যারী যে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহার কোন প্রমাণ পুলিশের নিকট ছিল না। ২৮শে জুলাইও থাকে নাই। প্যারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য কোন সরকারী sanction গৃহীত হয় নাই। তবে অকস্মাৎ ২৮শে জুলাই প্যারীকে গ্রেপ্তার করা হইল কেন? মিঃ ওয়েষ্টন বলিয়াছেন—"প্যারীর গ্রেপ্তারেব জন্য তিনিই দায়ী। আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলাম।"

প্যারীকে গ্রেপ্তারের একমাত্র কারণ সন্তোষকে একরার করিবার জন্য চাপ দেওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

২৯শে জুলাই পুলিশ আসিয়া মিঃ ওয়েষ্টনকে সংবাদ দিল যে সন্তোষ একরার করিতে সম্মত হইয়াছে। তাহাকে জেল হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে আনা হইল। মিঃ ওয়েষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন —সে কোন বিবৃতি দিবে কি না? সন্তোষ সম্মতি জানাইলে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেখানে ডাকিয়া আনা হইল। মিঃ নেলসন আসিলে পুলিশ হেফাজতে সন্তোষকে তাহার সম্মুখে আনা হইল। একরার লিখিবার পূর্বে আসামী স্বেচ্ছায় একরার করিতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য আসামীকে কতকগুলি প্রশ্ন করিবার বিধান আছে। এ ক্ষেত্রে মিঃ নেলসন্ সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি জান আমি কে? যাহা বলিতে চাও স্বেচ্ছায় বলিবে। সেজন্য কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এবার বল কি বলিবে।" এরূপ প্রশ্নের দ্বারা আদৌ আইনের নির্দেশ প্রতিপালিত হয় নাই। সেজন্য এরূপ একরার গৃহীত হইতে পারে না। সন্তোষের একরার যে স্বেচ্ছাকৃত নহে তাহা একরার পড়িলে বুঝা যায়।

সন্তোষ বোমা রাখিয়াছে ইহাই বলিবে। তাহা না করিয়া সে আখড়া প্রতিষ্ঠার কথা স্বদেশী শোভাযাত্রার কথা ইত্যাদি বহু প্রাচীন

ঘটনা দিয়া তাহার একরার আরম্ভ করিল। কোন সরকারী উকিল মামলা আরম্ভ করিবার পূর্বে যেমন উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন সন্তোষ যেন সেরূপ ভাবে একরার আরম্ভ করিল। সন্তোষ উকিল নহে, সুতরাং তাহার নিকট এইরূপ কৌশলপূর্ণ বিবৃতি আশা করা যায় না। ইহাতে মনে হয় তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে কিভাবে কোথা হইতে আরম্ভ করা হইবে।

৩০শে জুনের কথা বলিতে গিয়া সন্তোষ সভায় উপস্থিত ব্যক্তি-গণের নাম যে পর্যায়ে বিবৃত করিয়াছে তাহা exhibit (একজিবিট) ৫৬ দলিলের বিবরণের সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়। এরূপ মিল সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

উপেন্দ্রনাথ মাইতির বাড়ীতে যে সভাব কথা বলিয়াছে তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য। উপেন্দ্রবাবু একজন বিশিষ্ট সচ্চরিত্র ব্যক্তি। তিনি এরূপ সভা তাঁহার বাড়ীতে হইতে দিবেন এবং তিনি তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন ইহা অসম্ভব ঘটনা। সেসন জজ্‌ও ইহা বিশ্বাস করেন নাই।

৭ই জুলাই তারিখের সভার বিবরণ সন্তোষের একরার ও এক-জিবিট দলিল একভাবেই লিখিত হইয়াছে। রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন আসিয়াছিলেন যামিনী মল্লিকের বাড়ীতে বোমা দেখিতে, তিনি বোমা দেখিলেন এবং সুরেন্দ্র যে সে বোমা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর নিক্ষেপ করিবে ইহাতে তাহার সম্মতি আছে ইহা জানাইয়া গেলেন। সন্তোষ সেই বোমা লইয়া নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখিল। এরূপ কাহিনী আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। মেদিনীপুরে পুলিশের প্রচুর সমাবেশ। এরূপ অবস্থায় রাজার যে বোমা দেখিবার এতটা কৌতুহল হইবে এবং সন্তোষ যে বোমা লইয়া রাস্তায় ঘোরাফেরা করিবে ইহা অস্বাভাবিক।

এ্যড্‌ভোকেট্ জেনারেল বলিয়াছেন—"রাজা যদি ষড়যন্ত্রী বলিয়া প্রমাণিত না হইয়া থাকেন তবে এসব কাহিনী বিশ্বাস করা যায় না। রাজা যে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং

সন্তোষের একরার যে সত্য এবং আইন সম্মত তাহা সাব্যস্ত করা যায় না।

বলা হইয়াছে যে সন্তোষ দীর্ঘদিন পুলিশ হেফাজতে থাকে নাই কিন্তু তাহার উপর যে বিশেষ চাপ দেওয়া হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাকে নির্জ্জন কক্ষে রাখা হইয়াছিল। বিচারাধীন আসামীকে যে ভাবে রাখিবার নিয়ম জেল হাজতে আছে তাহার বিপরীত ব্যবস্থা তাহার জন্য করা হইয়াছিল। সন্তোষ প্রায় তিন সপ্তাহ জেলে ছিল। তাহার মধ্যে মাত্র ছয় আট দিন সে সকল আসামীর সংগে ছিল। পরে তাহাকে পৃথকভাবে নির্জ্জন কারাকক্ষে রাখা হয় যাহা দণ্ডিত আসামীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহা যে সন্তোষের মনোভাবের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩১শে আগষ্ট সন্তোষ একরার প্রত্যাহার করিবে বলিয়াছিল কিন্তু তাহা মঞ্জুর করা হয় নাই। ৭ই সেপ্টেম্বর যখন তাহাকে আদালতে হাজির করা হয় তখন সে প্রকাশ্য আদালতে একরার প্রত্যাহার করে। ৩১শে আগষ্ট হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সময়টা সন্তোষ যাহাতে একরার প্রত্যাহার না করে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে সন্তোষের পক্ষে কোন ব্যবহারজীবীকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই।

এই প্রত্যাহার দরখাস্ত লইয়া অনেক ব্যপার ঘটিয়াছিল। সরকার পক্ষ বলিয়াছিলেন যে ইহা আদালতের কাগজপত্রের মধ্যে অলিখিত ভাবে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেজন্য আসামীপক্ষের ব্যরিষ্টাব শ্রীযুক্ত দত্ত দায়ী। আসামী পক্ষের প্রতিবাদে সরকার পক্ষ শ্রীযুক্ত দত্তের বিরুদ্ধে ইংগীত প্রত্যাহার করিয়া উকিল শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষের উপর দায়িত্ব নিক্ষেপ করেন। কিন্তু প্যারীবাবু সন্তোষের সহিত তিন মিনিটের বেশী কথা বলিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আসামীপক্ষের উকিল ব্যারিষ্টারদের প্রতি এরূপ ইঙ্গিত শোভনীয় নয়। মৌলবী জেরার সময় শ্রীযুক্ত দত্তের বিরুদ্ধে অনেক অশোভন উক্তি

করিয়াছিল। কিন্তু আদালতে তাহা নিবারণ করা উচিত ছিল। সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে সন্তোষের একরার আইন সঙ্গত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

(৬) সুরেন্দ্রের একরার সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার মন্তব্য করা যায়। সুরেন্দ্র গ্রেপ্তার হয় ৩১শে জুলাই এবং একরার করে ১৫ই আগষ্ট। এই সময়ের মধ্যে সে বরাবর পুলিশ হেফাজতে ছিল। সুরেন্দ্র কিছুতেই একরার করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাকে একরার করিতে সম্মত করাইবার জন্য সন্তোষকে জেল হইতে থানায় আনিয়া সুরেন্দ্রের সহিত মোকাবিলা করা হয়। সন্তোষ দুঘণ্টা ধরিয়া সুরেন্দ্রর সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। তাহার ফলে সুরেন্দ্র একরার করিতে রাজী হয়। ১৪ই আগষ্ট লালমোহন গুহ সুরেন্দ্রের একটা বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া লয়। ১৫ই তাহাকে একরার করাইবার জন্য জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে একরার লিখিবার জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীকে ডাকা হয়। তিনি আসিলে সুরেন্দ্রের বিবৃতি পড়িতে দেওয়া হয়। তিনি পনের মিনিট ধরিয়া তাহা পড়েন এবং পরে একরার লিখিতে আরম্ভ করেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে বরাবর উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ নিকটে কোথাও ছিল। একরার লিপিকার ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্রকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু যে প্রশ্ন সর্ব্বাধিক পরিমাণে অত্যাবশ্যক সেই প্রশ্নটি অর্থাৎ সুরেন্দ্র কতদিন যাবত পুলিশ হেফাজতে আছে সেই প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই ভদ্রলোক সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে তাঁহার ধারণা ছিল যে আসামীকে জেল হইতে আনা হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একরার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা আদৌ গ্রহণ যোগ্য নহে। সন্তোষের ক্ষেত্রে যেরূপ এক্ষেত্রেও সেইরূপ একরার লিখিবার সময় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার হস্তেও পুলিশ রিপোর্ট ছিল এবং তিনিও আসামীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। একরার গ্রহণ কালে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি এবং একরার গ্রহণ ব্যাপারে অংশগ্রহণ আদৌ আইন সঙ্গত নহে।

স্থরেন্দ্রের একরার পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে যে ইহা অসত্য উক্তিতে পূর্ণ।

২৩শে মে তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সত্যেন্দ্র ও সন্তোষ সেখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু ২৩শে মে সত্যেন্দ্র হাজতে ছিল এবং সন্তোষ আদৌ মেদিনীপুরে ছিল না। এই একরারেও উপেন্দ্র নাথ মাইতির বাড়ীর সভার কথা লিখিত হইয়াছে যাহা সেসন জজ অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে ৭ই জুলাই রাজার যামিনী মল্লিকের বাড়ীতে আগমন ও বোমা দর্শনের কথা বলা হইয়াছে যাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এই সম্বন্ধে সন্তোষ বলিয়াছে যে সে বোমাটি নিজে লইয়া গিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে কিন্তু স্থরেন্দ্রে বলিয়াছে যে রাস্তায় যাইতে যাইতে সন্তোষ বোমাটি তাহার হস্তে দেয় এবং সে তাহা সন্তোষের বাড়ীতে রাখিয়াছিল। সত্য ঘটনা হইলে উভয়েব বিবৃতিব মধ্যে—এরূপ পার্থক্য হইত না। স্থরেন্দ্রর একরারের সহিত exhibit ৫৬ এর যথেষ্ট মিল আছে। Exhibit ৫৬ দলিলে লিখিত কাহিনীই স্থরেন্দ্রেব মুখ দিয়া বলান হইয়াছে মনে করা স্বাভাবিক। ৭ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে স্থরেন্দ্রকে কোর্টে হাজির করা হয় নাই। ৭ই সেপ্টেম্বর সে একরার প্রত্যাহার করিয়াছে এবং কি অবস্থায় তাহার নিকট হইতে একরার আদায় করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থতরাং স্থরেন্দ্রের একরারও প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পাবে না। দুইটি একরার প্রমাণ হইতে বাদ গেলে স্থরেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ নাই।

যোগজীবনের বিরুদ্ধে রহিল একমাত্র প্রমাণ—আবদার রহমনের সাক্ষ্য। আবদার রহমন যে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নহে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেসন জজ বলিয়াছেন যে তাহার কোন সামাজিক মর্য্যাদা নাই। সে এক সময়ে কসাইগিরি করিত পরে সামান্য ফেরীওয়ালা ছিল। যোগজীবনের সহিত তাহার বিবাদ ছিল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে স্থতরাং তাহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। বোমা

তৈরী সম্বন্ধে আবদার রহমন যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাও বিশ্বাস যোগ্য নহে। আবদার রহমান বলিয়াছে—জামিনে খালাস হইয়া যোগজীবন তাহাকে বলিয়াছিল যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিবার জন্য একটি বোমা প্রস্তুত করিতে হইবে। সেজন্য তাহাকে মাল-মশলা যোগাড় করিতে বলিয়াছিল। আবদার রহমন সে কথা মৌলবীকে জানাইলে মৌলবী তাহাকে বলিয়াছিল যে উহাদিগকে বোমা তৈরী করিতে দিও না। কেমন করিয়া তৈয়ার করিতে হয় তাহা জানিয়া লও। তদনুসারে যোগজীবন একটি ইংরাজী বই পড়িতে লাগিল এবং তাহা বাংলা করিয়া রহমনকে বুঝাইয়া দিল এবং রহমন তাহা নোটবুকে লিখিয়া লইল। এরূপ কাহিনী বিশ্বাস করা শক্ত। আবদার রহমনেব নোটবুক প্রমাণ স্বরূপ প্রদত্ত হয় নাই। যোগজীবন দুইবার জামিনে খালাস হইয়াছিল। একবার ৮ই জুনেব পূর্বে আর একবার ৪দিন লেখাব সময়ের পরে সুতরাং কোন বারের জামিনে খালাসের পর ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক জানা না গেলে যোগজীবনকে এই ব্যাপাবে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না বা তাহাকে দণ্ডিত করা যায় না।

একরার গুলি বাদ দিয়া সন্তোষের বিরুদ্ধে অপর প্রমাণ হইল তাহার গৃহে বোমা প্রাপ্তি কিন্তু এজন্যও তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। বোমা পাওয়া গিয়াছে বৈঠকখানায় এবং সেখানে বাড়ীর লোকদের ও বাহিরের লোকদের যাতায়াত আছে সুতরাং সেখানে প্রাপ্ত বোমার জন্য সন্তোষের অপরাধ অনুমান করা অসঙ্গত। যদি বোমাটি সন্তোষের নিজের কক্ষে পাওয়া যাইত যেমন তাহার কক্ষ হইতে পাওয়া গিয়াছে স্বেচ্ছা-সেবকগণের নাম তালিকা, বন্দেমাতরম্-চিহ্নিত ব্যাগ, খাতাপত্র প্রভৃতি তাহা হইলে তাহাকে দোষী অনুমান করা যাইত।

বোমা প্রাপ্তির পর সন্তোষের আচরণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা হইয়াছে। সে নাকি প্রথমে সেই গোলাকার পদার্থটিকে দেখিয়া তাহা 'ল্যাংগোট' পরে বেনেটি বল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া-

ছিল কিন্তু সেজন্য সন্তোষকে দোষ দেওয়া যায় না। জিনিষটা দেখিয়া জেলা সুপারিন্‌টেনডেন্ট ক্যাপটেন উইনমাণিও প্রথমে বলিয়াছিলেন—“এটা একটা তামাসা (hox) অথবা একটা খেলার বল।

সন্তোষ বোমা তৈরীর দলে ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। লালমোহন বলিয়াছেন, “৮ই জুলাইর পূর্বে তাহার নিকট কখনো কোন সংবাদ ছিল না যে সন্তোষ বোমা তৈরীর সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা সে গুপ্ত সমিতির সভায় যোগদান করিয়াছে।” এমন কি সেসন জজ পর্যন্ত রায়ে বলিয়াছেন যে ষড়যন্ত্রীগণের আলোচনা বা কার্যের সহিত তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

সুতরাং সন্তোষের আচরণে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাহাতে তাহাকে বোমার সহিত সংশ্লিষ্ট করা যায়। তদুপরি সন্তোষ জানিত যে ৩রা মে তাহার গৃহ একবার খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। সে জানিত যে সহরে পুলিশের লোক সতর্কভাবে পাহারা দিতেছে এরূপ অবস্থায় সে যে জানিয়া শুনিয়া বোমা লইয়া ঘোরাফেরা করিবে বা বোমা নিজ গৃহে রাখিবে তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। সারদা দত্তের বাড়ীতে যে বোমা পাওয়া গিযাছিল তৎ সম্বন্ধে Advocate General বলিয়াছেন যে তিনি সে বোমার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না। তাহা হইলে সন্তোষকে কোন মতেই অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। সন্তোষের বাড়ী সার্চ হইবার পূর্ব্বেই তাহার দাদা আশুকে মজঃফরপুরে বদলী করা হয়। সন্তোষ বোমা আনিয়া বৈঠকখানায় রাখিয়াছে ইহা জানা সত্বেও কেন সর্ব্বাগ্রে বৈঠকখানা ঘর খানাতল্লাসী হইল না? কেন বনমালীকে নজর বন্দী করিয়া বসাইয়া রাখা হইল? গোলাকার জিনিষটি দেখিয়া আসাদ্দুল্লা কি করিয়া জানিতে পারিল যে সেটা 'গোলি কি চিজ।' সে চীৎকার করিয়া উঠিল যে “গোলি কি চিজ পাওয়া গিয়া।” এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও এগুলি যে একেবারে অবহেলার বস্তু তাহা নহে।

বনমালীর সাক্ষ্য বোমা রাখার বিষয়ে চরম প্রমাণ না হইলেও

এগুলি যে অবহেলার বস্তু তাহা নহে। আসাদ্দুলা সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে গোয়েন্দা রাখাল লাহার ৩-৪টি নোটবই ছিল তাহা হইতে Exhibit সংকলন করা হইয়াছে। একথা সত্য হইলে ৭ই জুলাইর সভার কথা exhibit ৫৬তে আছে অথচ 'জি'তে নাই কেন? এসব অবস্থা বিবেচনা করিলে সন্তোষকে অপরাধী করা যায় না। দুইটি একরারই বাতিল হইলে সুরেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ থাকে না। সুতরাং সুরেন্দ্র নিরপরাধ।

অতএব তিনজন আসামীর বিরুদ্ধে যে দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বাতিল করিয়া আসামীগণকে খালাস দেওয়া হইল। এই ভাবে বহুসন্ত্রাসজনক মেদিনীপুর বোমার মামলার যবনিকাপাত ঘটল।

পুলিশের অপকীর্তি

মেদিনীপুরের এই বিয়োগান্তক নাটকখানির প্রধান পরিচালক ছিলেন মেদিনীপুরের তদানীন্তন পুলিশ ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী মজহরুল হক্! মেদিনীপুরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তিকে অপদস্থ ও হয়রাণ ক'রে এবং সমস্ত জেলায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে তিনি যে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন সরকার তার উপযুক্ত পুরস্কার তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে প্রশ্নোত্তর হয়েছিল নিম্নে তা দেওয়া হল। এতে বৃটিশ সুশাসনের একটি প্রকৃষ্ট রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য কেয়ার হার্ডি প্রশ্ন করেন—"বঙ্গের প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের দ্বারা ধিকৃত মেদিনীপুরের পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী মজহরুল হককে জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে কাজ করার জন্য উন্নীত করা হয়েছিল কিনা।" উত্তরে বলা হয়, "অনুসন্ধান রিপোর্ট পাওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অস্থায়ী ভাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল।" ভারতে বৃটিশ সুশাসনের কি অপূর্ব মহিমা!

সপ্তম অধ্যায়

গান্ধী-নেতৃত্বের সূচনা ও অসহযোগ

ভারতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের নূতন পথ

ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব দেশবাসীর সম্মুখে এক নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়গণের অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিকার এবং সম্মানের সঙ্গে জীবন ধারণের সংগ্রামে তিনি অহিংস সত্যাগ্রহের পথে যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা অনেক পরিমাণে সফল হয়েছিল। দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল অধিকাংশ শ্রমিক মজুর ভারতীয় নরনারীর মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে তাঁর অভিনব সংগ্রামের কাহিনী দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সংগ্রাম ছিল সম্পূর্ণ অহিংস।

তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে ফিরে এলেন ১৯১৫ সালে। তাঁর গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের উপদেশে তিনি ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হলেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ১৯১৭ সালে বিহারের চম্পারণ জেলার দুস্থ কৃষকগণকে নিয়ে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। এর ফলে একটি কমিশন নিযুক্ত হল এবং তাদের সুপারিশে নূতন আইন প্রণয়ণ করে অত্যাচার বন্ধ করা হল। পর বৎসর গুজরাটের খেড়া জেলাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষকদের খাজনা মকুব না হওয়ায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত ও জয়যুক্ত হল। আহমেদাবাদের মিল মালিকদের নিকট মিল মজুরদের ন্যায্যদাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় গান্ধীজী অনশন করেন এবং মালিকগণ অবশেষে তাদের দাবী মেনে নেন।

এইভাবে সত্যাগ্রহের পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ন্যায়কে

প্রতিষ্ঠিত করার এবং অবিচারের স্থানে সুবিচার প্রাপ্তির যে পথ তিনি দেখালেন তার প্রভাব সমগ্র দেশে এক নূতন ভাবাবেগের সৃষ্টি করল। জাতির নেতৃত্ব আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান এই মহান পুরুষের করায়ত্ত হতে লাগল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের বিরতি ঘটল ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই মহাসমরে বিজয়ী পক্ষে ইংরাজের সাফল্যের মূলে ছিল ভারতবাসীর ত্যাগ ও জীবন দান। ১৫ লক্ষ ভারতবাসী মিত্র শক্তির সাহায্যের জন্য যুদ্ধে যোগদান করেছিল এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ লোক। বৃটিশের সাহায্যে ভারত থেকে গিয়েছিল প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা নগদে ও জিনিষ পত্রে। ভারতবাসীর আশা ছিল বৃটিশের মহা সঙ্কটে ভারতবাসীর এই সহায়তা অবশ্যই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে। ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ জাতি অবশ্যই সহায়ক হবেন।

কিন্তু ভারতবাসীর প্রতি সন্দেহের বশে ও চিরপোষিত ক্ষমতার লোভে বৃটিশ জাতি পূর্ব পন্থাতেই দেশে শাসন চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিপ্লবীদিগকে দমন করার ছলে রৌলট কমিটির সুপারিশ ক্রমে 'রৌলট আইন' নামে একটি স্থায়ী আইন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হতে লাগল। তাতে বিধান রইল সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার, অন্তরীণ ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের এইরূপ একটি হাতিয়ার আমলাতন্ত্রের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হল। সর্ব্ব প্রকার প্রতিবাদ ও জনমত অগ্রাহ্য করে ব্যবস্থাপরিষদে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যে এই আইন পাশ করিয়ে নেওয়া হল ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ।

পাঞ্জাবের অত্যাচার

গান্ধীজী প্রস্তুত হলেন এই বে-আইনি আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার জন্য। ভারতব্যাপী 'হরতাল' ঘোষণা করলেন। অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করল হরতাল কিন্তু দিল্লী ও পাঞ্জাবে গোলমাল বাধে এবং দুই নেতা ডাঃ সত্যপাল ও সৈফুদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং

এইজন্য অমৃতসর সহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। বিক্ষুব্ধ জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি বর্ষণ করা হয়। ক্ষিপ্ত জনতা সরকারী অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। গোলমাল দমনের জন্য ১১ই এপ্রিল সহরে সৈন্য মোতায়েন করা হয় এবং জেনারেল ডায়ারের উপর শান্তি রক্ষার ভার দেওয়া হয়। ১২ই এপ্রিল সভা সমিতি বন্ধ করে যে ঘোষণা দেওয়া হয় জনগণ তা সম্যক অবগত হতে পারেনি। ১৩ই এপ্রিল নেতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবীতে জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সভা হয়। প্রায় দশ হাজার লোক এই সভায় জমায়েত হয়েছিল। বাগটি ছিল চতুর্দিকে বড় বড় বাড়ী ও প্রাচীর ঘেরা একটি স্থান, যাতায়াতের ফটক ছিল মাত্র একটি। জেনারেল ডায়ারের আদেশে ফটক থেকে সভার উপর মেশিন গান থেকে গুলি বর্ষণ করা হল। পলায়নের পথ না পেয়ে শত শত লোক গুলিতে প্রাণত্যাগ করল ও আহত হল। সরকারী হিসাব মত মৃতের সংখ্যা ছিল ৩৭৯ এবং আহতের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। বেসরকারী হিসাবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় এক হাজার। নিরস্ত্র জনতার উপর এই অতর্কিত আক্রমণের বীভৎসতা বর্ণনাতীত। কোন প্রকার সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল না। জেনারেল ডায়ারের মেশিনগানের গুলি শূন্য হওয়ার পর তিনি বাগ থেকে বিজয়ী বীরের মতো সদর্পে স্বস্থানে চলে গেলেন।

এরপর পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হয়। নৃশংস অত্যাচারে সমগ্র প্রদেশ হাহাকারে নিমজ্জিত হলো। প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত, হামাগুড়ি দিয়ে উপদ্রুত স্থানে যাতায়াতে বাধ্য করা, বৃটিশ পতাকা অভিবাদন করান, কোমরে দড়ি ও হাতে শিকল বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা, নেতাগণের নির্ব্বাসন ইত্যাদি অকথ্য অত্যাচারের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। সামরিক আইনে দণ্ডিত করে বহু লোককে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হল।

পাঞ্জাবের অবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছিলেন—"অমৃতসরের জঘন্য গলির ভিতর একজন পাঞ্জাবীকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করায় তার দ্বারা সমগ্র ভারতকে এই প্রকার বুকে হাঁটতে বাধ্য করা

হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাতে একজন উদ্ধত রাজকর্মচারী একটি মাত্র নিরীহ স্ত্রীলোকের মুখাবরণ জোর করে খুলে দেওয়ায় তাতে ভারতের সমগ্র নারী সমাজের মুখাবরণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। অল্প বয়স্ক স্কুলের ছাত্রদিগকে প্রতিদিন চারি বার এসে বৃটিশ পতাকা (ইউনিয়ন জ্যাক্) অভিবাদন করতে বাধ্য করার ফলে সাত বৎসর বয়স্ক দুইটি বালককে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছিল। ভারতের সমগ্র কিশোর সমাজের প্রতি কি নির্মম অপমান।"

মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিরও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কংগ্রেস থেকে যে বেসরকারী তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল তাতে এইসব অত্যাচারের নির্মম চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। সরকার নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির নিকট সাক্ষ্যদানকালে জেনারেল ডায়ারের দম্ভোক্তি এবং বিলাতে তাঁকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থার নগ্নরূপ জগতের সামনে প্রকট ক'রে তোলে। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি ত্যাগে অত্যাচারীদের প্রতি চরম ধিক্কার ধ্বনিত হয়। ৩০শে মে (১৯১৯) তারিখের এক পত্রে তিনি ভাইসরয়কে লেখেন যে—তাঁর দেশবাসীর প্রতি যে ব্যবহার করা হ'চ্ছে তা যে-কোন মানুষের পক্ষে বর্বরোচিত; কাজেই তিনি কোন বিশেষ সম্মানের চিহ্ন ধারণ করা লজ্জাজনক মনে করেন —এই সময়ে তাঁর দেশবাসীর পাশে দাঁড়ানোই তাঁর কর্তব্য।

খেলাফৎ সমস্যা

অপর একটি সমস্যাও দেশের সামনে গুরুতরো আকারে দেখা দেয়। যুদ্ধের সময় একটি সংকট মুসলমান সমাজকে অত্যন্ত বিব্রত ক'রে তোলে। তুরস্কের সুলতান ছিলেন 'খলিফা' বা মুসলমানদের ধর্মনেতা। তাঁর সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না এই অঙ্গীকার লাভ ক'রে ভারতীয় মুসলমানগণ ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন ক'রেছিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর নির্লজ্জভাবে এই অঙ্গীকার

ভঙ্গ করা হয়। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতের বড়লাট প্রতিশ্রুতি দেন যে তুরস্কের সুলতান মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি প্রদেশগুলিসহ আরবের উপর কর্ত্তৃত্ব করবেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেন। শান্তি প্রস্তাবের সর্ত দেখে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ভারতীয় মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করেন। নভেম্বর মাসে দিল্লীতে একটি সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলন হয়। গান্ধীজী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজী অনুভব ক'রেছিলেন, মুসলমানদের এই বিপদে হিন্দু খৃষ্টান পার্সী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত এবং সর্বতোভাবে এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন (১৯২০)

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রখ্যাত নেতা লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতাতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং অসহযোগ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজীর হাতেই কংগ্রেস ও খিলাফতের নেতৃত্ব এসে পড়ে। কলিকাতাতে গৃহীত প্রস্তাব অধিকতর বিশদ ও দৃঢ়তর রূপে নাগপুর সহরে অন্ধ্রনেতা বিজয় রাঘব আচারীয়ার সভাপতিত্বে পুনরায় গ্রহণ করা হয়। কলিকাতাতে প্রস্তাব গ্রহণের সময় চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অসহযোগ প্রস্তাবের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হতে পারেননি। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন নেতা গান্ধীজীর প্রস্তাবের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের অসহযোগ সমর্থন

মেদিনীপুরের নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সর্বান্তঃকরণে প্রস্তাবটি সমর্থন ক'রে ঐ প্রস্তাবের অনুকুলে ভোট দান করেছিলেন এই সময় বীরেন্দ্রনাথের মনোভাব ও কার্য্যধারা কিরূপ হয়েছিল তাঁর নিজের

কথায় (স্রোতেরতৃণ পৃঃ ৪) তা বুঝতে পারা যায়—"ব্যবসায় ছাড়তেই হবে এবং ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ করতেই হবে স্থির করেছিলাম। কিন্তু একটু লজ্জা হচ্ছিল যে সে সময় বাংলার অন্য কোন ব্যারিষ্টার আমার সাথে এই কাজে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং একটু দুঃখও হচ্ছিল যে যাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করতাম যাঁদের হৃদয়ের সবলতা ও গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁদের সম্মুখেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমাকে ভোট দিতে হবে। আমার কোন কোন বন্ধু উপযাচক হয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এ সময়ে একবার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত। কিন্তু পাছে কেহ মনে করেন যে আমি প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করছি সেইজন্য তাঁর সঙ্গে একেবারেই সাক্ষাৎ করিনি। তাব প্রায় এক বৎসর পরেই মেদিনীপুরে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ভাবে সর্বপ্রথম আলাপ হয়েছিল।

যাহা হউক, ভোট দিবার সময় উপস্থিত হলে, স্রোতরাশির চঞ্চল তরঙ্গমালার উপর আমার তৃণ-বিনিম্মিত ক্ষুদ্র তরীখানিকে নিজের হাতেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

ফলে ব্যবস্থাপক সভায় আসবার জন্যে যে আয়োজন কবেছিলাম, তাহা প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে লিখে বন্ধ করে দিই। নূতন মক্কেলগণকে বলতে সুরু করি যে, আমি আর তাদের কোন কাজ করতে পারবো না। আমার কলকাতার বাসায় বসবাস ক'রে যে কয়জন মেদিনীপুব ও হাওড়া জেলার ছাত্র স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করত তাহাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত অন্যত্র বসবাসেব ব্যবস্থা করতে বলি :···শেষে রাষ্ট্রীয়মহাসমিতির ষটত্রিংশ অধিবেশনের জন্য ···নাগপুরের কংগ্রেস নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

বঙ্গের চিত্তরঞ্জন এইখানে এই সময়েই কত সত্য কথা ও কত মিথ্যা কাহিনীর মধ্যে ভারতরঞ্জন হয়েছিলেন। তাঁর অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে দূর থেকে গোপনে তাঁকে নমস্কার করেছিলাম।"

নাগপুরে কংগ্রেস নেতাগণের অসহযোগ গ্রহণ

নাগপুরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পূর্ব্ব বিরোধীতা ত্যাগ করে নিজেই কংগ্রেসের সম্মুখে অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী পেশা পরিত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও তাঁর পূর্ব সঙ্কল্প অনুযায়ী ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় ত্যাগ করেন।

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের পর সমগ্র ভারতে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং ভারতবাসী বৃটিশের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে স্বাধিকার আয়ত্তে আনার একটি প্রকৃষ্ট পথের সন্ধান লাভ করে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদাত্ত আহ্বানে ছাত্রগণ দলে দলে স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে—দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য যুব সমাজের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে। ১০ই, ১১ই ও ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতার কয়েকটি পার্কে যে বিরাট সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা উৎসাহ উদ্দীপনায় ছিল অপূর্ব্ব। কলিকাতার ছাত্র সমাজকে দেশবন্ধুর আবেদন বিপুল ভাবে আন্দোলিত করে তুলেছিল। ১৩শে জানুয়ারী একটি বিরাট সভা হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। (তখনকার মির্জাপুর পার্ক)। সমগ্র পার্ক কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। চারিদিকের পথ, বাড়ী, বারান্দা, ছাদ, গাছের শাখা সর্ব্বত্র তিল ধারণের স্থান ছিল না। সমগ্র ছাত্র সমাজও ভেঙ্গে পড়েছিল—ঐ সভায় নেতৃবৃন্দের প্রাণস্পর্শী আবেদনে ছাত্রদের দ্বিধা, সঙ্কোচ দূর হয়ে গিয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাঁদের প্রাণে গভীর ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বলেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রাণে বাগ্মী বিপিনচন্দ্রের বাণী অনুরণিত হচ্ছিল —"Education may wait but Swaraj cannot."

মেদিনীপুর জেলাতেও ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ব্যারিষ্টারী ব্যবসা

পরিত্যাগ করে সর্ব সময়ের জন্য দেশের সেবায় ব্রতী হন। তাঁর ত্যাগ-পূত জীবন তাঁকে বঙ্গের অন্যতম নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন মেদিনীপুর জেলার 'মুকুট হীন রাজা'। নূতন নিয়মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি পুনর্গঠিত হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সমিতির সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক নির্বাচিত হন। হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে রত মেদিনীপুরের সুপরিচিত নেতা সাত কড়িপতি রায় ওকালতী ত্যাগ করে দেশ সেবায় ব্রতী হয়ে বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন এবং মেদিনীপুর জেলার অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। মেদিনীপুর জেলাতে যে জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তার সভাপতি এবং কিশোরীপতি রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিশোরীবাবু মেদিনীপুর জজ কোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন এবং অনুজ সাতকড়ি বাবুর ন্যায় তিনি মেদিনীপুর জেলার বহু সৎ কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন। কিশোরীবাবুর মেদিনীপুর সহরের বাড়ীতেই জেলা কংগ্রেসের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং স্থানটি দিবারাত্র কর্ম্মমুখর হয়ে উঠল। কিশোরীবাবুর সহায়ক ছিলেন প্রশান্ত মেদিনীপুর কোর্টের অসহযোগী আইনজীবীগণ এবং রামসুন্দর সিংহ, শৈলজানন্দ সেন, নারায়ণদাস সরকার, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ দেশকর্ম্মীগণ। কিশোরীবাবু নিজ চরিত্র গুণে সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। দেশপ্রাণ শাসমল তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে কিশোরীবাবু সম্বন্ধে লিখেছেন—"...তাঁর মত সৎ, ধীর, বিজ্ঞ ও ত্যাগী মহাজনের সহায়তা না পেলে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল কাজ সংসাধিত হয়েছে তার সিকি কাজ কেউ সংসাধন করতে পারতেন কি না সন্দেহ।"

কিশোরীবাবু ব্যতীত মেদিনীপুর কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল মন্মথনাথ দাস, অতুলচন্দ্র বসু, জহরলাল অধিকারী, নগেন্দ্রনাথ বসু ও রামমোহন সিংহ এবং খ্যাতিমান মোক্তার উমেশচন্দ্র বেরা আইন ব্যবসা ত্যাগ করে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেছিলেন। তমলুক

বারের বর্ষীয়ান নেতা মহেন্দ্রনাথ মাইতি এবং উকীল চণ্ডীচরণ দত্ত, রজনীকান্ত প্রামাণিক, শ্রীনাথ চন্দ্র দাস প্রভৃতি, কাঁথির উকীল বিপিনবিহারী অধিকারী, প্রবীণ মোক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাস ও উকীলের ক্লার্ক উদয়নারায়ণ মণ্ডল ; ঘাটাল আদালতের প্রবীণ উকীল মোহিনীমোহন দাস ও মনোতোষণ রায় মহাশয়গণ কংগ্রেসের ডাকে আইন ব্যবসা বন্ধ করে ত্যাগের বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। প্রতি মহকুমাতে এই সকল অসহযোগী আইনজীবী কংগ্রেস সংগঠনে অংশ গ্রহণ করে এবং জেলা ও মহকুমা কংগ্রেস কমিটিগুলির কর্মাধ্যক্ষ রূপে কার্য্য করে জেলাতে কংগ্রেসের কার্য্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কংগ্রেস নেতাগণের প্রধান অবলম্বন ছিলেন অসহযোগী ছাত্রদল। জেলার অসহযোগী কর্মীগণের মধ্যে স্কুল-কলেজের পড়াশুনা ত্যাগ করে যে ছাত্রগণ নিজ নিজ স্থানে ফিরে গিয়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দান করেছিলেন তাঁরাই ছিলেন প্রধান। অসহযোগী আইন ব্যবসায়ীগণ ও শিক্ষকগণ সাধারণতঃ এই তরুণ সম্প্রদায়ের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু সাংসারিক জীবনের বন্ধন হীন ছাত্রকর্ম্মীগণ অসহযোগ কর্মধারাকে সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ করতেন।

সমগ্র জেলাতে যখন অসহযোগ কর্মযজ্ঞের বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই সময়ে জেলাতে একটি নূতন আইনের প্রবর্ত্তন জনগণের দৃষ্টিকে সচকিত ক'রে তুলেছিল। বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের প্রবর্ত্তন ও তদনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের চেষ্টা চলতে লাগল। এই সরকারী নব বিধানের ফল কি হতে পারে তা চিন্তা ক'রে সদাসতর্ক বীরেন্দ্রনাথ বিচলিত হলেন এবং ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

অসহযোগী বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ও ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলন

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন

বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনেব বলে সরকার মেদিনীপুব জেলাতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রচলনে প্রবৃত্ত হলেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ১৯২০ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসেব বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর উত্থাপিত অসহযোগ প্রস্তাবেব পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন—যদিও বাংলাব নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন কবেননি। এবপব ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুব অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ অসহযোগ প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আইনজীবী, জননেতাগণ অসহযোগ নীতির নির্দেশে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ কবায় দেশে একটি নূতন অবস্থাব সৃষ্টি হয়। সমগ্র ভারতে যে অসহযোগের বন্যা আসে তা সর্বতোভাবে সবকার বিরোধী মনোভাবের দ্বাবা আপ্লুত ছিল। এমনি এক সময়ে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন প্রচলন প্রচেষ্টা আদৌ সমীচীন ছিল মনে হয় না। এই আইনটি প্রচলিত হলে গ্রাম্য কব দাতাগণেব কোন দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বিচার করেছিলেন। গ্রামগুলি সমগ্রভাবে কোন কোন দিক দিয়ে তৎকালীন সরকারী অশুভশক্তির বশীভূত হবে তা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন এই আইনের বলে সাত গুণ পর্য্যন্ত ট্যাক্স বৃদ্ধি হতে পারে এবং ঐ ট্যাক্স বিভিন্ন গ্রামোন্নয়নের কার্য্যের জন্য পর্য্যাপ্ত নাও হতে পারে। অন্য এক দিক থেকে এই আইনের কুফল তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ

বলেছেন অসহযোগ আন্দোলনেব সঙ্গে তাঁর ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ সমগ্র দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসের পরিচালনায় এক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল ইহা সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ বিশেষ নহে। এতে পাঞ্জাবের ভয়াবহ অত্যাচারের প্রতিকারের বা স্বরাজ লাভের জন্য বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের কোন কথা নাই। তথাপি গ্রামাঞ্চলে এই আইনের কুফল অতীব প্রবল রূপ ধারণ করবে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল।

সংস্কৃতির অবনতির আশঙ্কা

ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের নেতা বীরেন্দ্রনাথেব মনে গভীর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল যে এতদিনের ইংরাজ শাসন সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতবাসীর মনকে যে অবনতির পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়েছে তার বহিরাবরণ ছিল ভারতবাসীকে উন্নত করা। সেই মিথ্যা কুহক থেকে আত্মরক্ষার যে ডাক কংগ্রেসেব অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে প্রকট হয়েছে তাতে গ্রাম্য সরল সহজ সংস্কৃতি অধিকতর বিপদগ্রস্ত হবে। তিনি যে সকল কারণে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন প্রচলনের বিরোধী বলে মত প্রকাশ করেছিলেন তাব মধ্যে এই কারণটিকে অন্যতম বলে গ্রহণ করলে তাঁর কার্য্যকলাপের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভবপর হবে। তাঁর অনুষ্ঠিত সভাগুলিতে সহস্র সহস্র লোক যোগদান করত এবং তিনি গ্রাম্য-স্বায়ত্ত-শাসন আইনের অপকারিতা ব্যাখ্যা করার সময় ট্যাক্সেব বোঝা বাড়ার কথা এবং ট্যাক্স বৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামের বিভিন্নমুখী উন্নতির সম্ভাবনার অভাবের কথা যেরূপ জোর দিয়ে বলতেন ততোধিক দৃঢ়ভাবে বলতেন ইংরাজ শাসনে গ্রামগুলির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অনুকরণ প্রবৃত্তি, ধর্মবোধের অবনতি বা বিলুপ্তি সহজ সরল জীবন যাত্রায় বাধা, দাস মনোভাব, সরকারী কর্মচারীর ইঙ্গিতে নানা ব্যাপারে স্বার্থ দুষ্ট চিন্তার প্রচার এ পর্য্যন্ত বহুলভাবে

ঘটেছে। তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ঘটবে এইগুলি গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তনের ফলে। গ্রামে গ্রামে পুলিশের ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের লোকের ঘন ঘন যাতায়াত এই অবনতিকে আরও অবারিত করে তুলবে। এই দুর্য্যোগ থেকে জনসাধারণকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং এই আইন বর্জন করে নিজেদের বাঁচাতে হবে। এই সব কথা তাঁর সদ্য ত্যাগপূত জীবনের মন্ত্র গ্রহণের মধ্যে বারংবার তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেন।

কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে কার্য্য

গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন বিরোধিতা, ঐ আইনের নিয়মে নির্দ্ধারিত ট্যাক্স প্রদানে অস্বীকার এবং শান্তি ও নিরুপদ্রবতার সহিত দণ্ড গ্রহণে আগ্রহ—এইগুলির জন্য যে মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয় এবং যে সাহস ও দৃঢ়তা অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে তা একটি আন্দোলনের মধ্যেই সঞ্জীবিত হতে পারে। কাজেই বীরেন্দ্র নাথ অন্বেষণ করেছিলেন একটি মাধ্যম যার সুসংগঠিত কার্য্য জনগণকে শক্তি দিতে পারে এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এজন্য তিনি স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস কর্মীগণের সাহায্য নিয়েছিলেন।

আন্দোলন আরম্ভ করার সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁর মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেগুলি তিনি তাঁর লিখিত "স্রোতের তৃণ" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"মেদিনীপুর জেলায় স্বরাজ, অসহযোগ ইত্যাদি কংগ্রেস নীতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্থায়ী আর একটি আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছিল। আমি যে সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন পূর্বে, মেদিনীপুর জেলায় প্রত্যেক মহকুমার কয়েকটি থানাতে বাংলা গভর্নমেণ্ট বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইন প্রচলন করেন। এই আইনের বিধান অনুসারে লোকের উপর ১২ টাকা স্থলে ৮৪ টাকা ট্যাক্স হ'তে পারে শুনে লোকে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

আইনখানি ভাল করে পড়ে সরলচিত্তে এই বুঝেছিলাম যে এর দ্বারা দেশের কোন উপকার হতে পারে না—বরং মূর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তির উপর এর দৌলতে নানা রকমের উপদ্রব সৃষ্টি হতে পারে। কি কারণে আমার এরূপ ধারণা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতি-মধ্যে পত্রান্তরে ছাপিয়েছি।

আন্দোলন সম্বন্ধে প্রাদেশিক সম্মেলন ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের অভিমত

সে যাহা হোক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন উপস্থিত করা উচিত কিনা ঠিক সেই সময়েই তাহা পরিষ্কার রূপে কেহই অবগত ছিলেন না। বিগত নাগপুর কংগ্রেস জেলা ও লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ইত্যাদি সর্বথা পরিত্যাগ করতে হবে না—প্রকারান্তরে এই রূপই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন সম্বন্ধে নাগপুর কংগ্রেস কিংবা তাহার বিষয় নির্বাচনী সভা কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। অতএব এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক হয়েছিল—কিন্তু এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে বরিশাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হবে বলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে এ সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পত্রে কোনও মতামত জিজ্ঞাসা করি নাই। পরে যথা সময়ে বরিশাল কনফারেন্সে এক রকম সর্ব সম্মতি ক্রমে এই স্থির হয়েছিল যে, বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের সঙ্গে আমাদিগকে অসহযোগ করতে হবে। আমি বরিশাল কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কাউন্সিল বা কার্য্য-করী সভা পুনরায় সকলকে অনুরোধ করেন যে সদ্য সদ্য বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন আইনের সঙ্গে সহযোগ বর্জন না করলে ভাল হয়। আমি কার্য্য গতিকে এই কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে যোগদান করতে পারি নাই। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে

আমাকে প্রথমে যথেষ্ট চিন্তান্বিত হতে হয়েছিল। একদিকে যেমন এই আইনের সঙ্গে অসহযোগ করবার জন্য মেদিনীপুর বাসীর বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়েছিল তেমনই অন্যদিকে আইনটির দ্বারা মেদিনীপুব জেলার যে কোন উপকার হবে না তা আমি নিঃসন্দেহচিত্তে অনুভব করেছিলাম কিন্তু কংগ্রেস বা তদধীনস্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে আমাব আর এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে বরিশাল কনফারেন্সের প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত অভিমতকে আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্যকরী সভায় কোনও প্রকারে ব্যতিক্রম করা উচিত হয় নাই। তথাপি তাদের অনুরোধ সম্পূর্ণ রূপে অমান্য করে মেদিনীপুর জেলাব এই আন্দোলনে যোগদান করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

অসহযোগের সহিত সম্পর্ক বিহীন আন্দোলন

কিন্তু শেষে আমাব জেলাবাসীব বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে আমাকে ব্যক্তিগত ভাবেই এই আন্দোলনে যোগদান করতে হয়েছিল। আমি তমলুক ও কাঁথি প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্য সভায় একথা স্পষ্ট করে বলেছিলাম, এমনকি আমি সংবাদ পত্রে পর্য্যন্ত আমার নাম দিয়ে বহুবার লিখেছিলাম যে সহযোগিতা বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে আমাব এই আন্দোলনের কোন সংশ্রব ছিলনা। কিন্তু না বললে বোধ হয় চলে না যে তথাপি আমার কোন একজন বন্ধু আমার এই আন্দোলনকে সহযোগিতা বর্জন আন্দোলনের একাংশ বলে সংবাদপত্র ইত্যাদিতে প্রচার করেছিলেন এবং আমাকে মন্দবুদ্ধি এবং চতুর্দশ বৎসরের পুরাতন এক সর্বজনবিদিত আখ্যায়িকার উল্লেখ করে প্রকারান্তরে আরও কত কি বলে ইঙ্গিত করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমি বিশ্বস্তসূত্রে আরও অবগত হয়েছি কোন কর্মচারীকে কেহ কেহ ইশারায় এমনও জানিয়েছিলেন যে আমাকে কোন প্রকারে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে রাখতে না পারলে

মেদিনীপুর জেলাতে বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন আইনের প্রচলন কার্য্য তেমন সুবিধা হবে না।"

এই অবস্থার মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ নিজ দায়িত্বেই ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন পরিচালনার জন্য অগ্রসর হলেন। প্রথম পদ-ক্ষেপেই তাঁর মনেই ভীতির বিভীষিকা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তিনি শুনতে পেয়েছিলেন অন্তরের অমোঘ আহ্বান—"একলা চলো রে, একলা চলো রে।"

কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি আহূত হল। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ সমিতির সভাপতি এবং অসহযোগী কলেজ ছাত্র ও কাঁথির বিশেষ মর্য্যাদা সম্পন্ন শাঁকাবাইএর 'জানা' পরিবারের সন্তান সতীশ চন্দ্র জানা ছিলেন সম্পাদক। মহকুমা কংগ্রেস কমিটি বীরেন্দ্রনাথের ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন প্রস্তাবকে সাদরে বরণ করে নিলেন। অসহ-যোগী যুবক সমাজের মধ্যে অপূর্ব সাড়া পড়ে গেল।

জেলাতে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলাতে স্থাপিত হল ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড। কাঁথি শহরে স্থাপিত বোর্ডটি হল প্রথম ইউনিয়ন বোর্ড। চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান ও সভ্য মনোনয়ন ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেল। সরকার লোকের বিরূপ মনোভাব অগ্রাহ্য করে যেতে লাগলেন। বীরেন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন জনসাধারণের দরবারে। তাঁর সহকর্মীগণ যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কংগ্রেস কর্মীগণ, জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবর্গ তাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রে সভা ও আলোচনা বৈঠক করতে লাগলেন। বীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং পথঘাটের অসুবিধা, জলবায়ুর বিরূপতা, দূর দূরান্তে গমনের পরিশ্রম ইত্যাদি অগ্রাহ্য করে জনসভাগুলিতে যোগদান করতে লাগলেন।

কাঁথি মহকুমার আন্দোলন

কাঁথি শহরে যে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল তার একটিতে সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন কাঁথির লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিল নগেন্দ্র চন্দ্র বক্সী—অপর একটি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন —কাঁথির অন্যতম উকিল বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঁথি বাজারে যে জনসভা ডাকা হয়েছিল তার আহ্বায়ক ছিলেন—বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র চন্দ্র বক্সী। মিটিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল—সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি কি আছে তা বুঝে লোকে কর্তব্য স্থির করুক।

বীরেন্দ্রনাথ ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভার শেষে সকলে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে হাত তুলেন।

ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলনের সূচনায় কাঁথিতে অপর একটি সভা হল ১৯২১ সালের মে মাসে। ঐ মিটিংয়ে কাঁথি ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য রাখালচন্দ্র জানা বোর্ডের সদস্য পদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বীরেন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ইউনিয়ন বোর্ডের অপকারিতাগুলি বর্ণনা করেন। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ দাস ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান। কাঁথি ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইউনিয়ন বোর্ডের উপকারিতা বর্ণনা করেন। সমবেত জনমণ্ডলী ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করলেন।

দারুয়া ময়দানে একটি জনসভা হল। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা তারকনাথ পাল। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ দাস ব্যাখ্যা করলেন ইউনিয়ন বোর্ডের অপকারিতাগুলি। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল :-

"বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে। এই চেষ্টার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

বোর্ডের সদস্যগণকে সদস্যপদ ত্যাগের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে।”

বিদেশী বর্জ্জন, মাদক দ্রব্য বজ্জন, আদালত বর্জ্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, চরকা প্রচলন, সালিশ মীমাংসা, জাতীয় শিক্ষা প্রচলন, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কর্মসূচী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন কর্মধারা জনগণের মনে অসাধারণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। অসহযোগ আন্দোলনেব উদ্দেশ্যের সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলনকে জড়িয়ে না ফেলার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও সমগ্র দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা যেভাবে জনগণকে আপ্লুত কবে ফেলেছিল, সমাজের সকল স্তরে সমাজ বিরোধী মনোভাবের বিপুল বেগ যেভাবে মানুষের মন প্রাণকে কাঁপিয়ে তুলেছিল তাতে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জনের চেষ্টা যে দুর্ব্বার হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

সভার পর সভা চলতে লাগল। কাঁথি মহকুমার কাঁথি থানা ও অন্যান্য থানাতে যেখানে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রচলন করা হয়েছে বা ইউনিয়ন বোর্ড প্রচলনের চেষ্টা চলছে সর্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী সভা চলতে লাগলো। বীরেন্দ্রনাথের নিকট ডাক আসতে লাগলো বিভিন্ন স্থানে জনসভার অনুষ্ঠান করবার জন্য।

সবং থানাতে পঞ্চায়েতগুলি প্রকৃতই ট্যাক্সের রেট বাড়িয়েছিল তাতে গুরুতর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে সকল স্থানে যাওয়া সম্ভবপর হল না কিন্তু কাঁথিতে সরস্বতীতলা ও দারুয়া ময়দানে যে বিরাট জনসভাগুলি হতে লাগলো এবং প্রতি সভাতে যে সহস্র সহস্র লোক যোগ দিতে লাগলো তাতে সমগ্র জেলায় একটি সাড়া পড়ে গেল।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন সমগ্র জেলার একটি বিশেষ ব্যাপারে পরিণত হল এবং সরকারের সহিত এই সংগ্রামের গতি কোন দিকে যায় সেজন্য গ্রামে গ্রামে লোকের ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। ঘটনাটি বীরেন্দ্রনাথ নিজেই

তাঁহার "স্রোতের তৃণ" পুস্তকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ—
(পৃঃ ১১)

ফতেপুরের (রামনগর থানা) ঘটনা

"ক্রমে ব্যাপার এত জটিল হতে থাকে যে রামনগর থানার কোন এক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি, তাঁর অধীনস্থ কয়েক জন কর দাতার বিরুদ্ধে, অনধিকার প্রবেশ ও গৃহ ভগ্ন ইত্যাদির দাবিতে ফৌজদারী আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। তাঁর উপর এই উপদ্রবের কারণ এই বলে প্রকাশ পায় যে তিনি তাঁর ইউনিয়নের অন্তর্গত ফতেপুর নামক একটি গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় ক'রতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফতেপুর গ্রামের উল্লিখিত আসামীগণ ধর্মঘট ক'রে সে ট্যাক্স তো আদায় দেয় নি, অধিকন্তু ফরিয়াদির উপর উক্ত প্রকার অত্যাচার ক'রেছে। বিচারে সাত জন আসামীর পনর দিন ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়েছিল।

এখন এই মোকদ্দমার আসামীগণ আমাকে যেমন তাদের জমিদার বলে স্বীকার ক'রতো, তেমনি এই মোকদ্দমার ফরিয়াদিও আমার একজন প্রজা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রায় বেরোবার পূর্বে, এই ঘটনার বিন্দু বিসর্গও আমি জানতে পারিনি। কিন্তু এই সময়ে কিছুদিন আমি তমলুক মহকুমায় এবং কয়েকদিন কলিকাতায় ছিলাম। যখন সাত জন ফতেপুরবাসীর একপক্ষ ক'রে কারাদণ্ডের সংবাদ সর্ব প্রথম আমি শুনেছিলাম, তখন তাদের খালাস হ'তে বোধ হয় ছয় দিন বাকী ছিল। অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম, তারা এক মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় কাঁথির জেল থেকে খালাস পাবে। ইউনিয়ন বোর্ডের নামে কাঁথি মহকুমায় তারাই সর্বাগ্রে কারারুদ্ধ হ'য়েছিল ব'লে, তাদের খালাসের সময় কাঁথিতে একটি শোভাযাত্রা ও সেই দিন বিকালে সেখানে একটি সাধারণ সভার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। তৎপূর্বে আমি যেখানেই থাকি না কেন, সেই মঙ্গলবার ভোর ছ'টার সময় আমাকে কাঁথিতে উপস্থিত হ'য়ে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে। সেজন্য আমি অনেকের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়ে

ছিলাম। লাঞ্ছিতের সম্মান কাঁথিতে এই নূতন ব'লে, আমি নিজেই সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করতে কম উদ্বিগ্ন ছিলাম না। পরিণামে, সকলের আকাঙ্ক্ষাকে যথাসময়ে কার্য্যে পরিণত ক'রতে গিয়ে আমাকে যেমন বেশ একটু বেগ পেতে হ'য়েছিল, তেমনি কৌশলময়ের মহাকৌশলের নিকট মানবের সমস্ত বিদ্যা ও বুদ্ধি যে নিতান্ত হেয় এবং অকিঞ্চিৎকর, তাহাও সে ব্যাপারে অতি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রেছিলাম।

যে মঙ্গলবার প্রাতে পক্ষান্তরে ফতেপুর লাঞ্ছিত গণের খালাস হবার কথা ছিল, তার পূর্ব শুক্রবারে আমি আমাদের বীরকুলের কাছারী বাড়ীতে যাই। এই কাছারী বাড়ী থেকে ফতেপুর গ্রাম পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। তারপর দিন অর্থাৎ শনিবার সকালে আমি ফতেপুর গ্রামে গিয়ে স্বচক্ষে ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করেছিলাম, এবং গ্রামে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনা সম্বন্ধে নানাকথার আলোচনা হয়েছিল। আসামীদের স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের সঙ্গেও দেখা করে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হয়েছিলাম। ফরিয়াদিও কি জানি কেন সেই শনিবার বিকেলে আমাদের দুর্গাপুর হাটে আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁকে যে আমি তখন বহু লোকের সমুখে ঘটনা সম্বন্ধে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিনি, এমন নয়। কিন্তু সকলের নিকট সকল কথা শুনে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার নিজের কি ধারণা হ'য়েছিল, তা এতদিন পরে এখানে বর্ণনা ক'রে পুঁথি ভারি ক'বার আবশ্যক দেখছি না।

সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদানের আকুলতা

আমি স্থির করেছিলাম, রবিবারদিন বিকেলে আমাদের বীরকুল কাছারী বাড়ী থেকে পাল্কী ক'রে কাঁথি রওনা হবো এবং যতরাত্রি হোক সেইদিনই কাঁথিতে পৌঁছবো। কিন্তু রবিবার ভোর থেকে সোমবার বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত এমন অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি হ'তে থাকে যে, তার মধ্যে নরবাহনে কোন স্থানে যাত্রা করা একেবারে

অসম্ভব হয়েছিল। বিশেষতঃ আমাদের বীবকুল কাছারী বাড়ী থেকে কাঁথি পর্যন্ত রাস্তা সুদীর্ঘ বাইশ মাইল ব'লে এবং তার উপর আমার মত এক বিপুল কলেবর মনিবকে কাঁধে ক'রে বহন করতে হবে দেখে বেহারারা সত্য সত্যই কোথায় লুকিয়ে গিয়েছিল। ফলতঃ পরদিন মঙ্গলবার সকাল ছটার সময় কিরূপে কাঁথিতে পৌঁছে শোভাযাত্রায় যোগদান করতে পারবো সেই চিন্তায় আমি বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। সুতরাং সোমবার মধ্যাহ্নে সম্পূর্ণরূপে মেঘ না কেটে গেলেও যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তখনই আমি বেহারাগণকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েদি। অনেক কষ্টে তারা প্রায় সাড়ে ৩টার সময়ে এসে বলে তারা আমাকে সেইদিন কিছুতেই কাঁথি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেনা। তবে, কাছারী বাড়ী থেকে প্রায় ১২ মাইল নিয়ে গিয়ে পথিমধ্যে দেউলি ডাকবাঙ্গালায় সেইদিন রাত্রি অবস্থান করবে এবং পরদিন মঙ্গলবার বেলা ৯টায় নিশ্চয়ই আমাকে কাঁথি পৌঁছে দিবে। আমার কিন্তু মঙ্গলবার সকাল ছটায় কাঁথিতে না পৌঁছিলে চলবে না বলে আমি তাহাদিগকে বলি যে তারা আমাকে দেউলির ডাক বাঙ্গলায় সেইদিন সন্ধ্যায় পৌঁছিয়ে দিলে আমি সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে গরুরগাড়ী করে কাঁথি রওনা হবো এবং মঙ্গলবার সকাল ছটার পূর্ব্বে কাঁথি পৌঁছিতে পারবো। আমি আগে থেকেই অবগত ছিলাম, দেউলির ডাক বাংলার কাছে সর্ব্বদাই গরুরগাড়ী পাওয়া যায়।

আমার প্রস্তাবে বেহারারা সম্মত হলে বেলা প্রায় ৪ টার সময় আমরা দেউলী রওনা হই। পথিমধ্যে দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় এবং প্রায় সিকি রাস্তা দু'দিনের বারিপাতে জলমগ্ন হয়েছিল ব'লে, বেহারাগণের দেউলী পৌঁছতে প্রায় রাত্রি আটটা বেজে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গরুরগাড়ী না পাওয়ায় অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বেহারাগণ আমাকে আর দু'মাইল পথ নিয়ে গিয়ে রাত্রি প্রায় দশটার সময় ইসলামপুর গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে কোনও ভদ্রলোক আমার আগমন সংবাদ পেয়ে, আগে থেকে আমার জন্য

আহার্য্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর ওখানে আহারাদি ক'রে শয়নের উদ্যোগ ক'রছি, এমন সময় পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিলাম যে, যে গরুরগাড়ীর আশায় বেহারাগণকে এত কষ্ট দিয়ে দেউলী থেকে ইসলামপুর পর্য্যন্ত এনেছিলাম, সেই গরুরগাড়ী এত দুর্য্যোগে এখানেও পাওয়া যাবেনা। এদিকে রাস্তার দুর্গতিতে বেহারাগণের দুর্গতি দেখে তাদিগকে আর কোন অনুরোধ ক'রব না যেমন স্থির করেছিলাম, তেমনি পরদিন সকাল ছ'টায় যে ক'রে হোক্ কাঁথিতে পৌঁছবো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, ভগবান প্রদত্ত পৈতৃক দু'খানি শ্রীচরণকমল ব্যতীত সে কর্দ্দমাক্ত চার ক্রোশ ব্যাপী পথসমুদ্রে আমার আব অন্য কোন উপায় বা ভরসা ছিল না। কাজে কাজেই সঙ্গের জিনিষ পত্রের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে, শ্রীমান সুরেশ চন্দ্র প্রভৃতি তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সহ রাত্রি আন্দাজ দু'টার সময় অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে খালি পায়ে পদব্রজেই কাঁথি রওনা হয়েছিলাম। ইসলামপুর থেকে উত্তব পূর্ব্ব দিকে প্রায় দেড মাইল এসে পথিকগণকে পিছাবনীব খাল পেরোতে হয়। রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় যখন পিছাবনার খালের তীরে এসে আমরা উপস্থিত হই, তখন দেখেছিলাম—তাতে বন্যা হয়েছে এবং যে খাল সাধারণতঃ চল্লিশ হাতের বেশী প্রশস্ত ছিলনা, তাকে বন্যার জলে আজ প্রায় দেড়শ হাত প্রশস্ত দেখাচ্ছে। তার উপর, অনুসন্ধানে অবগত হয়েছিলাম যে পারাপারের নৌকাখানি ঘাটমাঝির অতি সাবধানতায় বন্যার স্রোতে আমাদিগের খেয়াঘাটে পৌঁছবার পূর্ব্বেই জলমগ্ন হয়েছিল। সংবাদ শুনে স্বীকার করছি, মুহূর্ত্তের জন্য মনটা আমার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কি জানি কেন হঠাৎ, মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠেছিল—লাঞ্ছিতের সম্মানের জন্য শোভাযাত্রায় যোগ দিতে যাচ্ছি, তাতে এত বাধা পড়ছে কি জন্য ? কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, পরদিন মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় যে ক'রে হোক কাঁথিতে পৌছবো বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম ; অতএব অনতিবিলম্বে স্থির করেছিলাম, সন্তরনের দ্বারাই বন্যাপ্লাবিত খাল অতিক্রম করবো। সহযাত্রী স্নেহের স্বেচ্ছা-

সেবকগণের তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিলনা, বরং তাদের আগ্রহই পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু আমাদের কথাবার্তা শুনে কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমাদিগকে একটু অপেক্ষা করতে বলেছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে দু'জন লোক ও একখানি নৌকা এনে আমাদিগকে পিছাবনী খালের পরপারে দয়া করে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আমরা পুনরায় যখন কাঁথির দিকে অগ্রসর হ'তে সুরু করি, তখন আবার পিট পিট ক'রে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে। একে তো পল্লী-গ্রামের সনাতন কাঁচা রাস্তার অবস্থা এদিকে নূতন মাটি ও দুদিনের বৃষ্টির কৃপায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল তার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে অনুভব করেছিলাম, বসুন্ধরা বুঝি সত্যই বায়ুশূন্য হয়েছেন। শেষে ব্যাপার এত দূর গড়িয়েছিল যে কেবল একখানি পরণের ধুতি ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার আবরণ গরমে বাধ্য হয়ে শরীর থেকে খুলে ফেলে দিয়েছিলাম। যা' হোক, কাঁথি পৌঁছতে যখন চার মাইল বাকী আছে, এবং ভোর হতে যখন আর বেশী বিলম্ব ছিল না, তখন কাঁথির দিক থেকে দু'জন পথিক আমাদের দিকে আসছে দেখতে পাই। দূর থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শুনা মাত্রই কে যেন আমার কানে কানে বলে দিয়েছিল, এদের ভিতর আমাদের ফতেপুরের সাত জন আসামী থাকলেও থাকতে পারে, এদের নাম ধাম জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গিগণকে সে কাজ করতে অনুরোধ করেছিলাম এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলাম হয়তো আমাদের শোভাযাত্রা ও সভার কথা জানতে পেরে রাজকর্ম্মচারিগণ রাত্রি থাকতেই তাদিগকে ছেড়ে দিয়ে থাকবে। বলা বাহুল্য এইরূপ সন্দেহ কেন যে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে উদয় হ'য়েছিল, তা' এক সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ বলতে পারবেন না।

প্রথম দলে কেবল দু'জন লোক ছিল। তারা আমাদের আবশ্যকীয় সাত জনের কেউ হতে পারে না বলে, তাদিগকে কোনও কথা আমরা জিজ্ঞাসা করি নি। দ্বিতীয় দলেও সাত জন ছিলনা অধিকন্তু একজন

স্ত্রীলোক ছিল ব'লে তাহাদিগকেও বিনা প্রশ্নে ছেড়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় দলে সাত জন পুরুষ একসঙ্গে আসছে দেখে, তাদের এক একজনকে তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সে এবং পরে পরে তার অন্য সহযাত্রিগণ আমাদের কাছে তাদের পরিচয় দিতে দ্বিধা করছে দেখে শেষে তাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। তখন তারা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় ফতেপুরের আসামী ব'লেই কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে স্বীকার করেছিল এবং ব'লেছিল যে রাত্রি আন্দাজ দুটোর সময় জেলের একজন জমাদার তাদের ঘুম ভাঙ্গিযে পথে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে এবং ব'লে দিয়েছে, তারা যেন পথে কারো সঙ্গে কোনও কথাবার্ত্তা না বলে ভোর হবার পূর্বেই পিছাবণীর খাল পার হয়ে যায়।

এই আবিষ্কার ও সংবাদে বলব কি, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমার দুটি সংযুক্তকর আমার অবনত মস্তকের দিকে আপনা হতেই উত্থিত হয়েছিল। গোপন প্রাণের নিভৃত কন্দরে আমার সত্যকার লোকটি চীৎকার করে বলে উঠেছিল—

বুঝেছি হে দয়াময়! তোমার লীলা এতক্ষণে বুঝেছি! পাল্কীতে এলে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না বলে, বারিবর্ষণে আমার পাল্কীতে আসা অসম্ভব করেছ। গরুর গাড়ীতে এলেও এদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বলে, তোমার পথের ভয়ে গরুর গাড়ীও খুজে পাওয়া যায়নি। পদব্রজে ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে এলে এদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না বলে, পদব্রজেই আজ তুমি আমাকে তোমারই এক লীলাভূমির দিকে এইরূপে টেনে নিয়ে চলেছ।

কিন্তু বলছিলাম কি যে—পরম কৌশলীর অব্যর্থ কৌশলে স্ফীত মস্তিষ্ক মানবমণ্ডলীর সমূহ গর্ব ও ধৃষ্টতা খর্ব হয়ে গিয়েছিল এবং ফতেপুরের সাত জন কয়েদ খালাসীকে সঙ্গে করে যখন স্থানীয় জেলের ঘড়িতে ছ'টা বেজেছিল, তখন আমি কাঁথি সহরের পোষ্ট অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম।

কাঁথিতে শোভাযাত্রা ও সভা

বলা নিষ্প্রয়োজন যে তাহাদিগকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি নাতি-ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা গঠন এবং বিকেলে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়েছিল এবং সেই সভায় মানুষের সকল বুদ্ধি ও বিদ্যাকে ভগবান কিরূপে অতি সহজ উপায়ে ব্যর্থ করেছিলেন, তা আমি সমবেত অন্যূন দশ হাজার লোককে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

কাঁথি সরস্বতী তলাতে বিকালে উল্লিখিত জনসভা হল লোকে লোকারণ্য। প্রাঙ্গণে লোক ধরে না, গাছে, ঘরের ছাদে, যেখানে যতটুকু স্থান পাওয়া যায় লোকে তাই ভরে ফেললো। মুক্তি প্রাপ্ত ৭ জন ব্যক্তিকে নূতন ধুতি চাদর পরিয়ে গলায় ফুলের মালা দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ ও প্রসিদ্ধ বক্তা ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় পরিচালিত এক শোভাযাত্রার পুরোভাগে কংগ্রেস অফিস থেকে বিপুল 'বন্দেমাতরম' মহাত্মাগান্ধী কি জয়' ধ্বনির মধ্যে সভাস্থলে আনা হল। সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত হতে লাগল। স্বেচ্ছাসেবক দল গান গাইতে লাগলেন—"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" এবং "একবার তোর মা বলিয়া ডাক হিমাদ্রী পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক"। কাঁথির কংগ্রেস নেতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সভার পক্ষ থেকে ৭ জন কারামুক্ত ব্যক্তিকে মাল্য ভূষিত করে সভাপতি এবং নেতা বীরেন্দ্রনাথ ও প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় বিপুল জয় ধ্বনির মধ্যে তাদেরকে কোল দিলেন। বীরেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন দুঃখ বরণে প্রস্তুত থাকবার জন্য। যতই উৎপীড়ন আসুক তাতে বিচলিত বা ভীত না হয়ে নব প্রবর্ত্তিত ইউনিয়নবোর্ড ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

বীরেন্দ্রনাথের ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতি ঘোষণা

বীরেন্দ্রনাথ জানালেন তিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন—তিনি নিজে ট্যাক্স দেবেন না। তিনি বললেন—এই সরস্বতী তলার পাশে আমার যে দোতলা বাড়ী আছে তার ট্যাক্স আছে। আমার বাড়ীতে

ট্যাক্স নিতে এলে ট্যাক্স দিব না মাল ছেড়ে দিব, ঘরের দরজা খুলে রাখবো তারা যদৃচ্ছা মাল নিয়ে যাবে। আমার চণ্ডীভেটি বা ফুল বাড়ীর বাড়ীতে গেলেও অনুরূপ আচরণ করবো এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে খোল করতাল বাজাতে বাজাতে শঙ্খধ্বনি ও সংকীর্ত্তন করতে করতে গ্রাম্য দেব মন্দিরে সমবেত হয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব। মাল নিলাম হলে সামান্য টাকায় বহু মূল্যের জিনিষও নিলাম ধরব না। যদি কেউ মাল বয় তাঁকে বিনীতভাবে নিষেধ করব, না শুনলে তাঁর সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করবো।' তিনি নিজের আচরণের উদাহরণ দিয়ে দেশবাসীদের একটি আচরণ বিধির ইঙ্গিত স্থাপন করলেন যা তাঁরা সততার সঙ্গে পালন করেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী আবেদন শুনে তাঁরা বলে উঠলেন তাঁরা অবশ্যই তাঁর কথা মতন চলবেন, সকল অত্যাচার সহ্য করবেন কিন্তু ট্যাক্স দিবেন না। অম্লান বদনে ক্রোকী মাল ছেড়ে দিবেন এবং কেউ কোন ক্রোকী মাল বহনে সরকারী কর্মচারীদিগকে কোন প্রকারে সাহায্য করবেন না।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন যদি গুলি চলে প্রথম গুলি তাঁরই বুকে লাগবে তিনি সেইজন্য প্রস্তুত। সমগ্র জনমণ্ডলী বিপুল আবেগে উদ্দীপ্ত, তাঁরা বারংবার শপথ জানাতে লাগলেন—তাঁরা নির্ভয় নিঃশঙ্ক থাকবেন কিছুতেই এক পয়সা ট্যাক্স দেবেন না। শত অত্যাচারেও অচল অটল থাকবেন। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় যখন আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বিলাতী বস্ত্র ত্যাগের আবেদন জানালেন তখন সভাতে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। জনমণ্ডলী পরণের কাপড় ব্যতীত সমস্ত বস্ত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বিরাট বস্ত্রযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেল ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা সহস্র সহস্র হৃদয়কে মথিত করে জয় ঘোষণা করলো তাঁদের অটল সঙ্কল্পের।

বীরেন্দ্রনাথ নিজে ট্যাক্স দেবেন না এবং সর্বপ্রকার নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত আছেন একথা তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে সর্বজনসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন।

মহকুমা শাসকের নিকট পত্র

তাঁর এই সংকল্পের কারণগুলি তিনি তাঁর কলিকাতাস্থ বাস-ভবন থেকে আগষ্ট মাসে (১৯২১) কাঁথি মহকুমা শাসককে লিখিত একখানি পত্রে বিবৃত করেছিলেন। তাতে লিখেন যে—তিনি বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইন অনুসারে কোন ট্যাক্স দিবেন না স্থির করেছেন। তার কারণগুলি নিম্নরূপঃ—প্রথমত আইনটি পাঠ করলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে এদেশে যা চলে তার কিঞ্চিৎ মাত্র দিয়ে বাংলার পল্লীজীবনকে আধুনিক ভাবাপন্ন করে তোলা—ইহাই আইনটির উদ্দেশ্য। বিদেশী আদর্শ ঠিকভাবে হজম করার শিক্ষা না পেয়ে কেবলমাত্র আইনের দায়ে সেই আদর্শের দিকে নত মস্তকে ছুটতে বাধ্য হওয়া তাঁর মতে সম্পূর্ণ অলৌকিক ও অসম্ভব। আইন এমন হওয়া উচিত যাতে এদের প্রাচীন সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধ্যাত্মিকতার বিনাশ সাধন না হয়।

দ্বিতীয়--আইনটিতে বলা হয়েছে যে "বাংলার পল্লী অঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই আইনের সৃষ্টি।" নিয়ম এই যে, যে স্থানে স্বায়ত্ত শাসন আইন প্রচলিত আছে সেই স্থানের প্রতিনিধিগণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় প্রাপ্যের সবটা নিজেদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ব্যয় করতে পাবে কিন্তু আলোচ্য আইনটিতে স্বায়ত্ত শাসনের এই নিয়মটি সরাসরি অস্বীকৃত করা হয়েছে। ইউ-নিয়ন বোর্ডকে এর এলাকার অন্তর্গত বর্তমান সরকারী আয়কে স্পর্শ করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এদেশের সরকার ভূমি রাজস্ব, পথ কর, পূর্ত কর কোর্ট ফী প্রভৃতি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বৎসরে একটি স্থায়ী আয় বাংলার প্রতি ইউনিয়ন থেকে পান। যদি উহার একটা মোটা রকম অংশ ইউনিয়ন বোর্ডকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে বিনা বাধায় ব্যয় করার ক্ষমতা দেওয়া হত তা হলে সম্ভবত বলা যেতে পারতো যে আইনটি স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের উদ্দেশ্যে রচিত কিন্তু ঐ আইনে তেমন কোন ব্যবস্থাই নাই।

তৃতীয়তঃ—তাঁর বিশ্বাস এই যে ঐ তথাকথিত স্বায়ত্ত শাসন আইনের দ্বারা এই প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহু পরিমাণে ব্যাহত হবে। কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ডে বিঘা প্রতি আট টাকা হিসাবে আয় ধরে বোর্ডের কর নির্ধারণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিতে পরোক্ষভাবে নূতন কর ধার্য্য করা হচ্ছে। অথচ বিধান এই যে ঐ জমি ১৭৯৩ সালে ১নং রেগুলেশন অনুসারে নূতন কর ধার্য্য থেকে বরাবর মুক্ত থাকবে। ইহা বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক না রাখার অন্যতম কাবণ।

চতুর্থতঃ—প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য্য কতকগুলি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। এখন তাদেরকে নূতন কর দিতে বলায় প্রকৃত পক্ষে অশান্তি ডেকে আনা হচ্ছে। প্রাদেশিক সরকার ইতি মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজে খরচা করেছেন। এতেই বুঝা যায় যে তাঁরা এই ব্যাপারেও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে দৃঢ় সংকল্প। এই অবস্থায় যখন (বাজেটে) তাঁদের দুই কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছে তখন তাঁরা নূতন কর স্থাপন করতে বাধ্য। কাঁথি মহকুমার দিক দিয়ে সর্বোপরি একটি কথা বলা যায় যে আগামী ১লা অক্টোবর থেকে পূর্ববৎ লবণের উপর কর ধার্য্যের জন্য মহকুমা শাসক বিজ্ঞাপন প্রচার কবেছেন। তাহলে কি তথাকথিত 'সভ্য' হওয়ার জন্য বা শুধু স্বায়ত্ত শাসনের কৌশল শিখাব জন্যেই জনগণকে নূতন কর দিতে বলার ইহা উপযুক্ত সময়? যাদের মাসে দু'পয়সা ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা নাই কেবল মাত্র সেই সকল ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য হবে না কিন্তু বাকি সকলে এই আইনের যাঁতাকলে পড়বেন। এখন ধনী ব্যক্তিরা দেশের সর্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করছেন। এঁরা কি নিজের উপর নতুন কর স্থাপন করে গরীব লোকদিগকে শাসন করার জন্য আহূত হচ্ছেন? তাঁরা অবশ্যই ধান ও টাকার উপর সুদের হার বৃদ্ধি করবেন। দেখা যাচ্ছে জনগণকে অহিংস রাখার আন্তরিক চেষ্টা

সত্বেও কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের কয়েকজন সদস্যের গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে এবং তমলুক ও ঘাটাল মহকুমাতে ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেক ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ দলে দলে সদস্যপদ ত্যাগ করছেন। দেখা যাচ্ছে এই জেলায় বলপূর্ব্বক ইউনিয়ন বোর্ড চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চমতঃ—তাঁর বিশ্বাস আইন অনুসারে যে পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব হয়েছে তার সবটাই সম্পূর্ণ বৃথা ব্যয়িত হবে। যদি ধরা যায় কুড়িটি গ্রাম বিশিষ্ট একটি ইউনিয়নে এই আইন অনুসারে ৬০০ টাকা সংগৃহীত হয় (বর্ত্তমানে কোন ইউনিয়নে ইহার বেশি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব নাই), তা হলে প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য ৩০টাকা হিসাবে বরাদ্দ করতে হবে। ইহার অর্থ প্রতি গ্রামের ভাগে মাসে ২.৫০ টাকা হিসাবে অর্থ পাওয়া যাবে। এই অর্থে বিদ্যালয় স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পল্লীপথ নির্ম্মাণের ব্যয় কিরূপে সম্পন্ন হবে? যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ কর নির্দ্ধারণের লক্ষ্য সরকারের থাকে তা হলে এখন তা না করার উদ্দেশ্য বোধ হয় ইউনিয়ন বোর্ডের টোপ গেলানো।

যদি কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের উপর সর্বোচ্চ ট্যাক্স বসান হয় তাহলে অনাদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ অত্যন্ত কম হবে। দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর ট্যাক্স বসানো হলে সরকার তাদের উপর নির্দয় নিপীড়ক রূপে গণ্য হবে। কাজেই মধ্যবিত্ত লোকেরাই ট্যাক্সের ভারে দরিদ্র হতে থাকবে এবং সমাজের মেরুদণ্ডের স্বরূপ এই শ্রেণীর লোকের ধ্বংস সাধন করা হবে।

এই কারণগুলিই ছিল বীরেন্দ্রনাথের ইউনিয়ন বোর্ড প্রচলন ব্যবস্থার বিরোধী আন্দোলনের মূল। তিনি মহকুমা শাসকের নিকট লিখিত পত্রের অনুলিপি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল থেকে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন অনুসারে নির্ধারিত কোন ট্যাক্স না দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

মহকুমা শাসক নাকি এক সময়ে বলেছিলেন—ইউনিয়ন বোর্ড নিয়ে কাঁথিতে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি হবে। বীরেন্দ্রনাথ জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, সরকার যদি কোনদিন গুলি চালান তিনি প্রথম বুক পেতে দিয়ে সেই গুলি গ্রহণ করবেন।

সরকারের ট্যাক্স আদায়ের প্রচেষ্টা। দারুয়া গ্রাম

সরকার তাঁর দমন নীতির বিভীষিকা নিয়ে ট্যাক্স আদায়ে প্রবৃত্ত হলেন। সর্ব্ব প্রথম আক্রমণ হল কাঁথি থানার দারুয়া গ্রামে। বন্দুক ধারী সিপাই, সার্কেল অফিসার এবং নাজিরবাবু সর্বাগ্রে উপস্থিত হলেন ঐ গ্রামের কৃষ্ণপ্রসাদ ভুঁইয়ার বাড়ী। কৃষ্ণবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁর ট্যাক্স ছিল তিন টাকা, ট্যাক্স চাওয়ায় তিনি দিতে অস্বীকার করলেন। আরম্ভ হল মাল ক্রোক। তিনি সব জিনিষ খোলাই রেখেছিলেন এবং সদরে মজুত রেখেছিলেন অন্ততঃ ২০ টাকা মুল্যের জিনিষ। কিন্তু ক্রোক হল কৃষ্ণবাবুর ছয়টি জাল, কয়েকটি ছিপ এবং আরো কিছু জিনিষপত্র—মূল্য আনুমানিক ৫০-৬০ টাকা। কৃষ্ণবাবুর মাছ ধরাব খুব সখ ছিল। আদায়কারীগণের বোধ হয় একথা জানা ছিল তাই জাল ও ছিপগুলি অপহরণ করে তাঁকে তাঁরা নাজেহাল করতে চাইলেন।

চতুর্দিকে উঠল শঙ্খধ্বনি—উঠল হরি ধ্বনি। কারুর মুখে ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। ক্রোকী মাল চৌকিদাররা বইতে চাইলো না এবং কোনলোকও মাল বইবার জন্য পাওয়া গেল না। তখন একজন সিপাহীর হেফাজতে মাল রেখে আদায়কারী বাহিনী অগ্রসর হয়ে গেল। চেষ্টা রইল পরে যদি কোন লোক জোগাড় হয়।

আদায়কারীদল যে যে স্থানে যেত, সেই সেই স্থানে একদল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকও উপস্থিত থাকতেন। শান্তি ভঙ্গ না হয় সেই দিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখতেন। পুলিশ বাহিনীর আচরণও কিরূপ হয় তাও তাঁরা লক্ষ্য রাখতেন। প্রতিদিনের একটি কার্য্য বিবরণী বীরেন্দ্রনাথের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হত। তিনি বিচার করে দেখ-তেন তাঁর নির্দেশ ঠিক মতন কার্য্যে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না।

দারুয়া গ্রামে কৃষ্ণপ্রসাদ ভূঁঞ্যা কুঙর নারায়ণ দাস, কেনারাম দাস প্রভৃতির মাল ক্রোক করা হয়। এই গ্রামে মহেন্দ্র দাস তাঁর সুন্দর বনের জমিতে গিয়েছিল। পুলিশ তাঁর বাড়ীর তালা ভাঙ্গে। বীরেন্দ্রনাথ জনসভায় দারুয়া বাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—"এই সংগ্রামে দারুয়া বাসীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে; সকলকে থাকতে হবে শান্ত, সংযত উপদ্রবহীন। ত্যাগ স্বীকার করে কাঁথি ও রামনগরকে জাগিয়ে তুলুন।" বীরেন্দ্রনাথের সভাগুলি বিশাল দারুয়া ময়দানকে কাঁপিয়ে তুলতো। জনসমাগম হতো হাজারে হাজারে। বাড়িয়ে তুলতো তাদের মনোবল ও সাহস। সরকারের দমননীতি তাদের কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারতো না। তারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় অসম্ভব করে তুলতেন।

ক্রোকী মাল স্থানান্তরিত করার অক্ষমতা

গ্রামের পর গ্রাম ট্যাক্স আদায়ের অভিযান চলতে লাগলো। বহু বিশিষ্ট সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য টাকা ট্যাক্স না দিয়ে অকাতরে ট্যাক্সের অনেকগুণ বেশি মূল্যের মাল ক্রোক হতে দিলেন। মাল ক্রোক হলো দেউল পোতা গ্রামের শরৎ চন্দ্র গুড়্যার—যিনি ঐ অঞ্চলের একজন সম্পন্ন জোতদার ছিলেন। নিকটবর্ত্তী মীর্জ্জাপুর গ্রামের অন্য-তম সম্পন্ন জোতদার উমাচরণ পাণ্ডা মহাশয়দের দরজা ভাঙ্গা হলো, মাল ক্রোকও হলো। সব জায়গাতেই মাল পড়ে রইলো। বইবার লোকের অভাব।

সার্কেল অফিসার নাজেহাল

মির্জাপুরের পাশের গ্রাম চকহজরৎপুরে জমিদার চন্দ্রমোহন অগস্তির বাড়ীতে আদায়কারীদল প্রবেশ করলেন। ঐ দলের পরিচালক ছিলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্কেল অফিসার। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ট্যাক্সের দায়ে চন্দ্রমোহনবাবুর ঘোড়াটি ক্রোক করা। এই ব্যাপারে যা ঘটেছিল প্রত্যক্ষদর্শী কংগ্রেসকর্ম্মী ভূতেশ্বর পড়্যা মহাশয়ের বিবরণে পাওয়া যাবে। তিনি তাঁর প্রদত্ত ২।৮।২১ তারিখের বিবরণে

লিখেছেন—"যখন গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় ও মাল ক্রোক করতে সার্কেল অফিসার, অন্যান্য অফিসার, চৌকিদার, সিপাহী প্রভৃতি দলবল নিয়ে মফঃস্বলে যেতেন তখন তাদের কার্য্য দেখা এবং শান্তি রক্ষার জন্য কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবকগণও যেতেন। এইভাবে মহকুমা বিশেষতঃ কাঁথি থানার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ছড়িয়ে থাকতেন। আগষ্টের শেষাশেষি (যখন চাষ প্রায় শেষ) তখন একদিন এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্কেল অফিসার বাহিনীসহ পূর্ব দিকে (কাঁথি থানাব) রওনা হলেন। এই সংবাদ কংগ্রেস অফিসে আসায় আমি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ দ্রুত গতিতে গেলাম। চকহজরৎপুরে (রসুলপুর রাস্তা) গিয়ে সার্কেল অফিসার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রমোহন অগস্তির বাড়ীতে তাঁর ঘোড়া চাইলেন। "আপনার ঘোড়া সহিসকে বলুন—ঘোড়া বের করতে। সে আমার সঙ্গে যাবে"। শাসমল মহাশয়ের নির্দ্দেশ কংগ্রেস কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী প্রচার করিতেছিল। ঘোড়ার সহিস শুনিতে পেয়ে বলিল—"আমি পায়খানা সেরে আসি"। এই বলে ঘরের পেছনের দিকে গিয়ে চুপি চুপি উত্তর দিকে অন্য গ্রামে চলে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় তাকে ডাকবার জন্য চন্দ্রবাবুকে বললেন। তিনি ও তাঁর কর্মচারীরা তাকে খুঁজে পেলেন না এই কথা শুনে 'সার্কেল অফিসাব' বিরক্ত হয়ে নিজে আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়া বের করে দক্ষিণ দিকেব রাস্তা দিয়ে (মির্জাপুর) ঘোষপুর গ্রামে ঢুকলেন। সঙ্গে দু চারজন চৌকিদারও ছিল। আমি দু তিন জন স্বেচ্ছাসেবকসহ অগস্তিদের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ে সব দেখছিলাম। আর কয়েক জন কর্ম্মী আগে গাঁয়ে ঢুকে সংবাদ দিল। শঙ্খ ধ্বনি হল। মেয়েরা ও পুরুষেরা দরজা খুলে রেখে ৺শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে সমবেত হতে লাগলেন। কতক পুরুষ মাঠে চাষের কাজে গেছিল, শাসমলের কথা গ্রামবাসীদের মনে পড়তে তাড়াতাড়ি খোল করতাল নিয়ে এসে গ্রামে ঘুবতে লাগলেন। আনন্দে হরিনাম করতে লাগলেন। হরিধ্বনিতেও গ্রাম মুখরিত হল। ঘরের আসবাবপত্র ও

বাসনাদি, অলঙ্কারাদি, টাকা পয়সার কি হবে, সেদিকের কোন চিন্তা মনে উদয় হয় নাই। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে বলতে লাগলো "কত মাল নিবে নিক"। মর্ত্তধাম স্বর্গ হয়ে দাঁড়াল। আমরা সার্কেল অফিসার (অশ্বারোহী) এর পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলাম। উদ্দেশ্য উহারা কি করে দেখা যাক্। এই হরিবোল শব্দ শুনে (সার্কেল অফিসার যাহার অর্থ কিছু বুঝে না) বিরক্ত হল। তাঁর ধারণা হল লোকে তাদের বিদ্রূপ ও অপমানিত করছে। তখন তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন—সামনে কীর্ত্তনের দল যাচ্ছে,দুপাশে লোকের বাড়ী, পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাদের দেখতে পেলেন। আমি সামনে ছিলাম, তিনি আমাকে অতি দুঃখ ও বিরক্তি সহকারে বললেন—"You volunteer, you see, they are howling and laughing at me. Please stop them." "দেখ স্বেচ্ছাসেবক, এইসব লোকেরা আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে তাদের শান্ত কর" তখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম—"না তাবা আপনাকে ঠাট্টা করেনি তাবা তাদের প্রথামত ভগবানের নাম করছে"। তখন সার্কেল অফিসাব দুজন চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে এক বাড়ীতে ঢুকলেন। দেখলেন বাড়ীতে কেউ নাই। দরজা খোলা। পাশের বাড়ীতেও তাই। অন্য চৌকিদারকে বাড়ী বাড়ী দেখতে পাঠিয়েছিলেন, তারা এসে খবর দিল কোন বাড়ীতে কেউ নাই দরজা সব খোলা আছে। তখন তিনি চৌকিদারদের ঘরে ঢুকে মাল বেব করতে বললেন। কোন চৌকিদার রাজী হল না। তারা বলল—"ওদের বাড়ীতে কেউ নাই। জোর করে আনতে গেলে তারা পাছে আমাদের নামে অভিযোগ করে সেজন্য আমরা পারবো না"। তখন সার্কেল অফিসাব খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, রুদ্রমূর্ত্তি হলেন, তাতেও কোন ফল হল না। শেষে তিনি চাবুক ধরলেন। দু চার ঘা করে চৌকিদারদের উপর পড়ল। তাদের জোর করে ঘরে ঢুকাতে চাইলেন। তখন চৌকিদাররা হুদ্দা খুলে তার সামনে ফেলে দিয়ে চলে যেতে আবম্ভ কবলো। শেষে তিনি নিরুপায় হয়ে আবার তাদের ডাকালেন। বললেন "আচ্ছা নাই তো

নাই আমার সঙ্গে চলো"। এইরূপ দু গ্রাম ঘুরে অনেক বেলায় বিফল মনোরথ হয়ে অগস্তির বাড়ীর দিকে ফিরলেন। মাল বয়ে নিয়ে যাবাব প্রশ্নই ওঠে না। গ্রামবাসী মেয়ে পুরুষ শীতলা মন্দিরে ছিলেন, আনন্দে কীর্ত্তন চলছিল, ঘরের দিকে কি হচ্ছে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমরা গ্রামবাসীদের অহিংসা, সত্য ও নৈতিক বলের শক্তি কত তা বুঝিয়ে দিলাম। কবির কথায় বললাম "সত্যের নাহি পরাজয় সত্যের নাহি পরাজয়"—চারিদিকে উঠল হরিধ্বনি।

গ্রামবাসীগণের এরূপ ত্যাগের মনোভাব, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, দেখে নব গঠিত অনেক ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও প্রেসিডেন্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেন্টগণ পদত্যাগ করতে লাগলেন—অতি অল্প সংখ্যক অত্যুৎসাহী ব্যক্তি ব্যতীত অধিকাংশই ইউনিয়ন বোর্ড চালনায় বিমুখ হলেন। সরকারকে সাহায্য করার লোক হয়ে পড়লো বিরল।

সবং সুতাহাটা প্রভৃতি থানাতে প্রবল প্রতিরোধ

একই অবস্থা ঘটলো সুতাহাটা, রামনগর, সবং (সদর মহকুমা) প্রভৃতি থানাতে। সুতাহাটা থানার আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করলেন কুমারচন্দ্র জানা ও বৈষ্ণবচকের সতীশচন্দ্র মাইতি প্রভৃতি। কোথাও নতি স্বীকারের কোন ভাব দেখা গেল না।

আদায় অভিযানের হিড়িক থামল না। সশস্ত্র পুলিশসহ সার্কেল অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীগণ গ্রামের পর গ্রাম ট্যাক্স দাতাদের বাড়ী হাজির হয়ে বিফল হতে লাগলেন এবং মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ক্রোক করতে লাগলেন। তারা গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র শঙ্খ ধ্বনি হতো। গ্রামবাসী নরনারী ঘর খুলে দিয়ে চলে যেতেন গ্রাম্য দেবতার মন্দিরে এবং খোল করতাল সহযোগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে থাকতেন। কৃষিকার্যেরত ব্যক্তিদের দিয়ে ক্রোকী মাল বহন করবার চেষ্টা হলে তাঁরা অস্বীকার করে বলতেন তাঁরা চাষের কাজ ছেড়ে যেতে পারবেন না। ভীতি প্রদর্শনেও তাঁরা অটল থাকতেন।

গরীব গ্রামবাসীরা তাঁদের সামান্য সম্বল ঘটি, বাটি ছেড়ে দিয়ে

অনেক দুঃখ বরণ করে নিলেন। তাঁরা রইলেন সম্পূর্ণ অহিংস ও নিরুপদ্রব। কংগ্রেস কর্মীর দল মাল ক্রোক কবলিত গ্রামে প্রায় পুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করতেন। গৃহস্থের যে সব মাল ক্রোক করা হত তাঁদের নাম ও গ্রাম ইত্যাদি নোট করা হত এবং প্রত্যেকের ক্রোকী মালের তালিকা করা হত। ঐ সব তালিকা এস. ডি. ও. এর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হত। এতে ক্রোকী মাল সম্বন্ধে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সকল সম্ভাবনাই দূরে থাকতো।

ঐ সব কর্মীর প্রতি এবং নেতা বীরেন্দ্রনাথের প্রতি গরীব দুখী সকল শ্রেণীর গ্রামবাসীর গভীর আস্থা ছিল। কর্মীদের উপস্থিতিতে গ্রাম বাসীদের মনে প্রভূত সাহসের সঞ্চার হত। তাঁরা দুখ কষ্ট অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতেন। তাঁরা দেখতে পেতেন সরকারের এত বড় শক্তি কীভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। কেউ ট্যাক্স দেয় না—কেউ ক্রোকী মাল বয় না—কেউ নীলাম ডাকে সাড়া দেয় না—সকলের একটি অনমনীয় মনোভাব—"হবে জয় নাহি ভয় নাহি ভয়।"

সরকার চেষ্টা করছিলেন অবস্থাটি ভাল করে বুঝে দেখার জন্য বীরেন্দ্রনাথের ও তাঁর দলের কর্মীগণের প্ররোচনা কি সাধারণ লোককে মাতিয়ে রেখেছে? বীরেন্দ্রনাথ নিজেও বুঝতে চাইলেন—তিনি একটু বেশীদিন অনুপস্থিত থাকলে লোকে দুর্বল হয়ে পড়ে কি না। তাই তিনি কিছুদিন আসা বন্ধ করলেন। ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা পূর্ববৎ চলতে লাগলো; লোকেও পূর্ববৎ ট্যাক্স না দিয়ে মাল ছেড়ে দিতে লাগলো।

কর্মীরা বীরেন্দ্রনাথকে আহ্বান জানালেন একটি জনসভা করার জন্য। তাদের সন্দেহ হচ্ছিল হয়তো বীরেন্দ্রনাথকে আর বেশিদিন মুক্ত রাখা হবে না। কথায় কথায় রটেছিল, মহকুমা শাসক বলেছেন কাঁথিতে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি হবে। বীরেন্দ্রনাথের কানে একথা পৌঁছেছিল তিনি জনসভায় একথা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি কিন্তু মহকুমা শাসক এরূপ কথা বলেননি বলে অস্বীকার করেছিলেন—তথাপি অবস্থা যেরূপ কঠিন হয়ে উঠেছিল

তাতে সরকার পক্ষ থেকে প্রচণ্ড হুমকি আসা বিচিত্র ছিল না। কাজেই বীরেন্দ্রনাথ শীঘ্র কাঁথি আসার সিদ্ধান্ত ক'রে কর্মীদের জানিয়ে দিলেন। তাঁদের কাজ কর্ম যেরূপ সুশৃংখল ভাবে চলছিল তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কর্মীগণের অবিরাম জন সংযোগের ফলে লোকের মনোবল অটুট রাখার চেষ্টার ফল দেখে তিনি বুঝেছিলেন. ক্ষেত্রে দুর্বলতার প্রবেশেব কোন সুযোগ ঘটেনি।

বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি আসার জন্য প্রস্তুত হলেন—যদি তাঁব শেষবারেব জন্যও হয়, তাতে কোন ক্ষতি নাই।

দারুয়াতে বিরাট জনসভা

দাকয়া ময়দানে সভা ডাকা হল। সরস্বতীতলা কাঁথি শহবের কেন্দ্রস্থল হলেও সেখানে আহ্বানের চেষ্টা হল না। কারণ যে বিপুল জনসমাগম আশা কবা যাচ্ছিল তাতে কাঁথি থেকে দুই মাইল দূব হলেও দাকয়া ময়দান ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি এসে যখন কাঁথি থেকে সভার দিকে পদ-ব্রজে রওনা হলেন তখন শত শত লোক তাঁর অনুগমন করতে লাগলো—শত শত লোক সহস্র সহস্র লোকে পরিণত হল। "বন্দেমাতরম্"—"ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন করতে হবে" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো বারবাব "জয় বীরেন্দ্রনাথেব জয়" "বন্দেমাতরম্" ইত্যাদি ধ্বনি কাঁপিয়ে তুললো সমগ্র সমাবেশকে।

সভা আরম্ভ হওয়া মাত্রই চাবিদিকে গভীব নিস্তব্ধতা দেখা গেল। কংগ্রেস নেতা প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন :—

নীতির বন্ধন করোনা লঙ্ঘন
রাজশক্তি সার প্রজার রঞ্জন
হইয়া রক্ষক হয়ো না ভক্ষক
অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন ॥
পাপ কংসাসুর যদুবংশ দল।
চন্দ্র সূর্য্য বংশ গেছে রসাতল ॥

কালজলধিতে জলবিম্ব প্রায়।
ওঠে কত শক্তি কত মিশে যায়
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়।
আবার পতনে লাগে কতক্ষণ
নীতির বন্ধন...............

সকলের হৃদয় অপূর্ব আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। অবাঞ্ছিত একটি ট্যাক্স আদায়ের জন্য গ্রামে গ্রামে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করা হচ্ছে মানুষ তাতে এই সঙ্গীতের প্রতিটি বাক্যকে অমোঘ বলে বিশ্বাস করেছিল। বীরেন্দ্রনাথ গ্রামবাসীগণকে অটল থেকে নির্ভয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানালেন। চতুর্দিক থেকে সাড়া এল কোন প্রকার ভীতিই তাদের প্রতিজ্ঞা থেকে নড়াতে পাববে না। তারা শেষ পর্য্যন্ত এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এই আইন তুলে নিতেই হবে। বাড়তি করের অত্যাচার তারা কিছুতেই সহ্য করবেন না। সেদিনকার সভার একমাত্র বক্তা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তৃতার পর এবং জনমণ্ডলীর দৃঢ়তা ব্যঞ্জক মনোভাব প্রকাশ ও জয় ধ্বনির পব রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় সভা ভঙ্গ হল। "সত্যের নাহি পরাজয় সত্যের নাহি পরাজয়" গান গাহিতে গাহিতে জনমণ্ডলী সভা স্থান ত্যাগ করলেন।

ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপকতর ব্যবস্থা

লোকের উপব অধিকতর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আদায়কারী দলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের সাতটি দল গ্রামে গ্রামে অভিযান চালাতে লাগলো। সাব ডেপুটি, সার্কেল অফিসার, কানুনগো, ভেটারিনারী সার্জেন্ট, দারোগা, নাজির, বন্দুকধারী সিপাহী, তহশীলদার, চাপরাশী, আদালী ইত্যাদিদের ভাগ করে দল গঠন করা হল। এক এক দিকের গ্রামগুলি এক একটি অভিযানের শিকার হয়ে দাঁড়ালো। সরকারের শক্তি যেন এমন ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে যে লোকেরা তাতে ভয়ে বশীভূত হয়ে যায়। কাঁথি থানার পূর্ব

দক্ষিণ উত্তর ইত্যাদি সব অঞ্চলেরই গ্রামগুলিতে অভিযান চললো। দেউলপোতা, মহম্মদপুর, গোপীনাথপুর, সুবর্ণনগর, গামারতলিয়া, বিচুনিয়া, খাগড়াবনি, আদাবেড়্যা, মহিষামুণ্ডা, ভগবানপুর, গোপালপুর, হিঞ্চি, সরদা, ফুলেশ্বর, হুরমুট, হুগলী, পাথরঘাটা, ডাউকী, চুনফলি, জগন্নাথপুর, আলাদারপুট, দুর্গাপুর, বাঁকাবেড়্যা, জানুবসান, তেখরি, গহিরাবাড়, মুকুন্দপুর, ঘোষপুর, মানিকপুর, অযোধ্যাপুর, সটিকেশ্বর, বালুবাড়, মহিষাগোট, রামচক, শঙ্করকুণ্ডী, গোপালপুর, বেলতলিয়া প্রভৃতি গ্রামে ট্যাক্স আদায়ের অভিযান খুব জোরের সাথে চালানো হয়েছিল। গরীব মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান নির্বিশেষে মাল ক্রোক এবং মাল সংগ্রহ ব্যপদেশে দরজা ভাঙ্গা বা অন্য উপ দ্রব্যের অভাব ছিল না। দরিয়াপুর ইউনিয়নে গোপীনাথপুর গ্রামে শশী নায়েকের ভাতের হাঁড়ির ঢাকাখানি ক্রোক করা হয়। দৌলতপুর গ্রামের ব্রহ্মময়ী দাসীর ঘরের তালা ভেঙ্গে মাল বার করে নেওয়া হয়।

মাল বহনের বিফল প্রয়াস

দারিয়াপুর থেকে একখানি গরুর গাড়ীতে মাল কাঁথি আনা হচ্ছিল, চালতি গ্রামের একজন পাঠশালার গুরু-মশায় কার গাড়ী জিজ্ঞাসা করায় তাকে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। বহু কষ্টে সংগৃহীত গাড়ীটা হয়ত হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে এই ছিল আদায়কারীদের আশঙ্কা। কাঁথিতে জমা করা মাল স্তূপীকৃত হতে থাকল। যানবাহন জোগাড় হওয়া অসম্ভব দেখে কিছু মাল জেলা সদরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হল—সে চেষ্টার ফল একই হল। মেদিনীপুরে মাল পাঠান গেল না। এখন চেষ্টা হল অন্য রূপ, মেদিনীপুরে ১৩ খানি গরুর গাড়ী জোগাড় করা হল। তাদের বলা হল কাঁথি থেকে সরকারী খাতা পত্র মেদিনীপুরে বয়ে আনার জন্য গাড়ীর প্রয়োজন। কংগ্রেস কর্মীদের এ খবর অজানা থাকল না। তারা গরুর গাড়ীওয়ালাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিলেন। তারা

রাত্রির অন্ধকারে কে কোথায় গা ঢাকা দিল—সরকারী লোক তার পাত্তাই পেল না।

গভর্ণমেণ্টের নাজেহাল অবস্থা দেখে লোকের আত্মবিশ্বাস বাড়তে লাগল। কাঁথির এস. ডি. ওকে কোর্ট পর্যন্ত মাল আনার জন্য অনেক কৌশল প্রয়োগ করতে হল। চৌকিদার দফাদাররা বাধ্য হয়ে কিছু কিছু সাহায্য করল। দুষ্ট-চরিত্রের লোক খুঁজে বের করে তাদের সাহায্য নেওয়া হল। অতি কষ্টে ফৌজদারি কাছারি বাড়ীর সর্ব নিম্ন তলায় মাল এনে জমা করা হল কিন্তু ৪০/৫০ টাকা দামের মালের সরকারী ডাক ১ টাকা করেও কোন সাড়া আসে না। শেষ ডাক ডাকা হয়, একটার পর একটা মাল তেমনি অবস্থায় সেখানেই থাকে। সরকার অচল অবস্থা কাটাবার কোন উপায় পেলেন না।

কাঁথিতে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালা বাগ সৃষ্টি হবে কি ?

এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে বীরেন্দ্রনাথ তাঁর "স্রোতের তৃণ" পুস্তকে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১৯-২০)—"শুনেছি কারো কারো রক্তচক্ষু তাতে অধিকতর প্রসারিত হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে কোন এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে শুনেছিলাম কাঁথিতে শীঘ্রই জালিয়ানওয়ালা বাগ সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং সেই সংস্করণের প্রথম অধ্যায়েই হয়তো আমার মতন নগণ্য ব্যক্তিরও কোন গুরুতর বিপদ হতে পারে। একথা অবগত হবার পরে পাঁচ দিনের মধ্যে কাঁথিতে একটি সভা করে প্রকাশ্যভাবে এই কথার আলোচনা করেছিলাম এবং আমার উদ্যোগ পর্বের শেষ অভিনয় কতদূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে তাহাও পনেরো হাজার কাঁথি বাসীকে সে সভায় ভালো করে সমঝে দিয়েছিলাম। পরদিন সমূহ অস্বীকার এবং সেই কারণে ভদ্রোচিত দুঃখ ও ক্ষমা প্রকাশের পালা পড়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দুঃখ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপিত হওয়ায় বিশেষ-ভাবে অনুসন্ধান ক'রে জ্ঞাত হয়েছিলাম যে পূর্ব্বে যাহা শুনেছিলাম তাহা মিথ্যা নয় এবং সেজন্য প্রকাশ্যভাবে দুঃখ প্রকাশ করা অসম্ভব বলে লিখে জানানো হয়েছিল।"

ইত্যবসরে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়ের জন্য রাজকর্মচারীগণ কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ আমদানি করেছিলেন এবং কাঁথির প্রায় চার হাজার করদাতা নগদ টাকার পরিবর্তে তার তিন চার গুণ মূল্যের অস্থাবর মাল সানন্দ চিত্তে গভর্ণমেণ্টকে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই মাল বয়ে আনবার জন্য সমগ্র কাঁথি মহকুমায় কুলি মজুর ও গরুর গাড়ী ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায়নি।

মাল নীলামের ব্যর্থ চেষ্টা

সে মালের কিয়দংশ প্রথমে দশ টাকা, পরে চার টাকা এবং শেষে এক টাকায় নিলাম খরিদ করতে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় একজনও খদ্দের মেলেনি। অবশ্য একথা সত্য যে এই মালক্রোক ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের লোকেব হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে অনেক গরীব লোককে বহুতর কষ্টভোগ করতে হয়েছিল—এমন কি, সে কথা মেদিনীপুরের কোন উর্দ্ধতন রাজকর্মচারী আমাকে স্পষ্ট করে খুলে লিখেছিলেন : কিন্তু প্রত্যুত্তরে আমি তখন তাঁকে যা জানিয়েছিলাম তা এখানে বলবো যে, আত্মার পরিত্রাণেব জন্য যারা দুঃখকে সুখ বলে বরণ করে নিয়েছে, তাহাদিগকে কারো দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কি হবে? তবে কাঁথির এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত কিন্তু বীরহৃদয় দরিদ্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে কথঞ্চিৎ সহানুভূতি দেখাবার জন্যে, কাঁথিতে যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকবে ততদিন পাদুকা ব্যবহার করবো না বলে প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা করে পাদুকা পরিত্যাগ করেছিলাম। আজ সেই পাদুকাবিহীন অবস্থায় পাদুকাহীন প্রায় দু'হাজার কয়েদীর মধ্যে এই কারাগারে বসে বুঝছি—ভগবান যা করেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।"

বীরেন্দ্রনাথ হাজার হাজার লোকের সভায় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করতেন—কেবল ফাঁকা কথায় নয় তিনি সর্বদাই ইউনিয়ন বোর্ডের অপকারিতা সম্বন্ধে যুক্তি দেখাতেন। তিনি লিখিতভাবেও এই এই সকল যুক্তি তাঁর কাঁথি মহকুমা শাসককে লিখিত পত্রে এবং অমৃত

বাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত (২০শে ও ২১শে অক্টোবর) প্রবন্ধে অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন।

প্রতিবাদ সভাগুলির প্রস্তাব সরকারের নিকট নিয়মিতভাবে টেলিগ্রাম দ্বারা পাঠিয়ে দেওয়া হত। তাছাড়া হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ মূলক আবেদন পত্রও কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হত। শতকরা ৬০ ভাগ করদাতা যে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরোধী ছিলেন একথা জাজ্জ্বল্যমান রূপে প্রমাণিত হয়েছিল। কাজেই আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ড প্রচলিত হতে পারে না—সরকার অবশ্যই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজের কাঁথি পরিদর্শন ও রিপোর্ট

তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুক, সেশন জজ সত্যেন রায় সহ কাঁথি পরিদর্শনে এলেন। তাঁরা দেখলেন লোকে পুরাতন চৌকিদারী আইন বজায় রাখার পক্ষপাতি—তাঁরা মনে করেন না নূতন ইউনিয়ান বোর্ড চালু করার সময় হয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত কাঁথি মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলনের প্রতি সরকারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ভাবে নিবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সদর মহকুমার সবং দাঁতন প্রভৃতি এবং ঘাটালের দাসপুর থানাতে এই বর্জন আন্দোলনের তীব্রতাও নিতান্ত অল্প ছিল না। এই সকল থানার অধিবাসীগণ বোর্ডের ট্যাক্স না দিয়ে মাল ক্রোক ও অন্য প্রকার উপদ্রবের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ও জনমণ্ডলীর এইরূপ জাগরণ ও একপ্রাণতা, নেতা বীরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রতি অবিচল আনুগত্য এবং গ্রামে গ্রামে গণশক্তির অপূর্ব জাগরণ কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করল।

মেদিনীপুরের অন্যতম নেতা বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির

সাতকড়িপতি রায় তাঁর "দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বৎসর" প্রবন্ধে লিখেছেন :—

"ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দোব না—প্রেসিডেণ্ট সার্কেল অফিসারের কাছে রিপোর্ট করলেন যে তিনি ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন না। সার্কেল অফিসার চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কত ট্যাক্স? ১৷০ বৎসরে দেয়। আমার এই বড় ঘটিটি নিয়ে যান। সকলেই দরজার সামনে একটা বাসন নিয়ে বসে আছে। বাসন সব একটা গাছতলায় জড় হল। আগলাবে কে? চৌকিদার বলল —সে পারবে না। সার্কেল অফিসার নীলাম করলেন। কে কিনবে? তিনি S. D. O. এর কাছে রিপোর্ট করলেন। S. D. O. বললেন সদরে নিয়ে এস। গরুর গাড়ী পাওয়া গেল না। চৌকিদারগণ বললেন—আমাদের গাঁয়ে বাস করতে হয়। আমরা পারব না। S. D. O. চাপরাশি পাঠালেন, তারা বললে—মাল বইবার জন্য চাকরী করি না। উর্দ্দি খুলে দিয়ে চলে গেল। S. D. O. কালেক্টারের কাছে রিপোর্ট করলেন। ট্যাক্স আদায় অসম্ভব একটি গ্রামেই এই ব্যাপার। দশ হাজার গ্রামের ট্যাক্স আদায় করা অসম্ভব। ম্যাজিষ্ট্রেট গভর্নমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করলেন।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইউনিয়ন বোর্ডের প্রতিটি সদস্যকে (নির্বাচিত ও মনোনীত) একটি চিঠি দিয়ে বলেন যে যাঁরা ইউনিয়ন বোর্ড রাখার অনুকূলে তাঁরা যেন ১৯২১ সালে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যেই তাঁকে তাদের মত জানান। যে মতামত পাওয়া গিয়েছিল তার ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ১৩ই ডিসেম্বর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাংলা সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠালেন। তিনি জানালেন মাত্র ১০টি ইউনিয়ন বোর্ডের ১৬ জন সদস্য ইউনিয়ন বোর্ড রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। তার মধ্যে দুটি ইউনিয়ন বোর্ডের ৬ জন সদস্যের মধ্যে তিনজন করে সদস্য ইউনিয়ন বোর্ড রাখার পক্ষে মত দেওয়ায় তাও অনুকূল মত বলে বিবেচিত হল না। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আর একটি রিপোর্টে

স্বায়ত্ত শাসন বিভাগে জানালেন—পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ডের ৪ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৩ জন এবং ২ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে দুই জনই ইউনিয়ন বোর্ড রাখার পক্ষে মত দেওয়ায় এই ইউনিয়ন বোর্ড রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।

বোর্ড সংক্রান্ত আদেশ বাতিল ও মাল ফেরৎ

এর পরেই বাংলা সরকারের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ ১৯২১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ৫০২৫ নং বিজ্ঞপ্তি জারী করে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ডটি ছাড়া ২২৬টি ইউনিয়ন বোর্ড বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং সমগ্র ক্রোকী মাল ফেরত দেওয়া হয়।

গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ডটি বাতিল না হওয়ার কারণ এই যে স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট নিম্নরূপ একখানি দরখাস্ত গিয়েছিল। এইরূপে দরখাস্ত আর গিয়েছিল কিনা তার কোন সরকারী রিপোর্ট নাই। ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের জন্য জনমত কিরূপ ব্যাপকতা লাভ করেছিল এই উদাহরণটি হতে তা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। দরখাস্তটির ফাইল নম্বর ইত্যাদি নিম্নরূপ ঃ—

Government of Bengal local Self Geyernment Department (Local Branch) July 1922, proceeding numbers—36 to 39, File No L to N—S, Scrial No 1-7,

To the Honorable Minister in Charge local Self Government, Government of Bengal.

মহাশয়,

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন ৩৭ নং গোপাল নগর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী নিম্ন স্বাক্ষরকারী অধীনগণের কাতর প্রার্থনা এই যে কতকগুলি অসহযোগ আন্দোলনকারী ও মতলববাজ মহাজনগণের দ্বারা প্রচারিত নানারূপ মিথ্যা গুজবে উত্তেজিত হইয়া আমরা ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ

আমাদের ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলাম তজ্জন্য আমাদের বোর্ড মেম্বারগণ সম্প্রতি বোর্ডটী উঠাইয়া দিবার জন্য মহামহিম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা প্রথমে আবেদনকারীদের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে ছিলাম কিন্তু এক্ষণে আবেদনকারীদের অন্য উদ্দেশ্য এবং বোর্ডের অশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব হুজুর বাহাদুরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে আমাদের ইউনিয়ন বোর্ড যেন উঠাইয়া লওয়া না হয়।

নিবেদন

ইতি

তারিখ ১. ১. ২২

কিন্তু দেখা গেল যে শেষ ইউনিয়ন বোর্ডটি বাতিল না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন সমানভাবে চলছে। ১৯২২-এর ৩১শে জানুয়ারী এই গোপাল নগর ইউনিয়ন বোর্ডটিও বাতিল হল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সুপারিশ করলেন এবং ১৯২২এর ১লা মার্চ ১১৬০ নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা সরকার এই বোর্ডটিও তুলে দিলেন। এইরূপে মেদিনীপুর জেলাতে ইউনিয়ন বোর্ডের শেষ চিহ্নটিও লোপ পেল।

সাতকড়ি পতি রায় মহাশয় লিখেছেন "দশমাস এইভাবে চলে নভেম্বর মাসে ইউনিয়ন বোর্ড উঠে গেল। মেদিনীপুরের এই অসহযোগ আন্দোলনের কথা ইতিহাসে স্থান পাবে কিনা জানিনা। কিন্তু বীরেন আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর কথা কিভাবে কার্য্যকরী কত্তে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছিল।

ঘাটাল দাসপুর থানার এক ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেয়নি। অধিকন্তু সার্কেল অফিসার এলে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, তার হল তিন মাস জেল। ঘাটাল সাব জেলে সার্কেল অফিসার নিজে গিয়ে তাকে দিয়ে ঘানি টানিয়ে ছিল। একদিন এক সভা হচ্ছে এক গাঁয়ের মাঠে। আমি বক্তৃতা কচ্ছি। এই প্রৌঢ় লোকটি খালাস পেয়ে এসে হাজির, দিলাম তার গলায় মালা পরিয়ে।

সে নাচতে নাচতে বল্লে ইংরেজের জেল দেখে এসেছি। আমরা থাকি মাটীর ঘরে। সে পাকা ঘর। খেতে পাওয়া যায়। আমরা চাষী কাজকে ডরাইনা। আজ জুজুর ভয় ভেঙ্গে গেল।"

ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন এবং তার অদ্ভুত সাফল্য মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গৌরবময় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলনের নেতা ও পরিচালক বীরেন্দ্র নাথ শাসমল এটিকে কংগ্রেস প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন থেকে সর্বপ্রযত্নে পৃথক করে রেখেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র দেশে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত একটি বিরাট আন্দোলনের অংশ এবং প্রথম ধাপ ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন যদি অপূর্ব সাফল্য মণ্ডিত একটি অসহযোগ কর্মধারা, তথাপি উহার লক্ষ্য ছিল সীমিত। ইহা সত্য যে তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও নৈতিক আদর্শকে পুনর্জীবিত করার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা এবং দেশের জন্য ত্যাগ ও দুঃখ বরণে ও সেবাব্রত গ্রহণে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা দেশকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। সেই জন্যেই ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন এ সব ঘটনা থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছিল। তথাপি ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের নেতা দেশপ্রাণ শাসমল জনগণের মধ্যে সর্বশক্তির জাগরণে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সরকারের সহিত সংঘর্ষে পূর্ণ অহিংসনীতি প্রয়োগ এবং ত্যাগ ও দুঃখ বরণের শক্তির দ্বারা অদ্ভুত শক্তির সম্মুখীন হওয়ার সাহস প্রকাশের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেশব্যাপী জনসাধারণ এই শিক্ষা ও জয়ের গৌরব কোন সময়ই বিস্মৃত হন নাই। তাঁরা যখন পরাধীনতার মুক্তির জন্য বৃটিশ শক্তির সহিত সংগ্রাম রত হয়েছেন তখন এই আন্দোলনের ভিত্তির উপরই সেই সংগ্রামের সৌধ রচিত হয়েছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের অবসান—নেতাজীর উক্তি

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle পুস্তকে লিখেছেন:—

"The success of the No-Tax campaign gained considerable strength and self confidence to the people of Midnapur and popularity to their leader Mr. B. N. Sasmal" ট্যাক্স প্রদানের অস্বীকৃতির ব্যাপক আন্দোলন সাফল্য মণ্ডিত হওয়ায় মেদিনীপুরের জনগণের মনে প্রভূত শক্তি ও আত্ম বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই আন্দোলনের নেতা শ্রীবীরেন্দ্র নাথ শাসমল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার গণ আন্দোলনের মর্মানুসরণের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের অধ্যায়টি অবশ্যই স্মরণীয়। আমাদের দুঃখ এই যে মেদিনীপুর জেলার ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের মধ্যে যে গণ-সংগ্রামের ভিত্তি রচিত হয়েছিল এবং জনগণের ত্যাগ, একতা, সহিষ্ণুতা ও নেতার প্রতি আনুগত্য সরকারের প্রবল প্রতাপকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল তাই মেদিনীপুরের পরবর্তী কঠিনতর সংগ্রামের সময় জনগণের প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত করেছিল তার উল্লেখমাত্র 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস' পুস্তকে নাই। যাঁরা মেদিনীপুর বাসীর শক্তির উৎস ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করবেন, তাঁদের ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন হবে।

নবম অধ্যায়

অসহযোগ কর্ম্মসূচী

নাগপুর প্রস্তাবের নির্দেশ

নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ :—

"যেহেতু ভারত ও বৃটিশ সরকার খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি কর্তব্য পালন করেননি ও প্রধান মন্ত্রী স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন ; এবং প্রত্যেক অমুসলমান ভারতবাসীরই কর্তব্য মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম্ম সঙ্কটে সাহায্য করা, যেহেতু ১৯১৯ সালের ব্যাপার সমূহে......উক্ত উভয় সরকার পাঞ্জাবের নিরপরাধ অধিবাসীদের রক্ষা করতে মারাত্মকভাবে অবহেলা করেছেন, বর্বর ও কাপুরুষ ব্যবহার সত্বেও দোষী কর্ম্মচারীদের দণ্ডদানে অক্ষম হয়েছেন এবং যে স্যার মাইকেল ও ডায়ার.......রাজকর্মচারীদের অনাচারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ও যাকে নিজ শাসনাধীন অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সম্পুর্ণ উদাসীন থাকা সত্বেও সকল দোষ ত্রুটি থেকে মুক্তিদান করা হয়েছে, এবং যেহেতু হাউস্ অফ কমন্স্ (House of Commons) ও বিশেষ করে হাউস অব্ লর্ডস্‌এর বিতর্কে ভারতবাসীর প্রতি অনুকম্পার পুর্ণ অভাব ও পাঞ্জাবে যে নিয়মিত ভাবে ভীতিপ্রদর্শন ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন প্রকটিত হয়েছে এবং খিলাফৎ ও পাঞ্জাব সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণায় মোটেই অনুশোচনার ভাব পরিলক্ষিত হয়নি, যেহেতু এই কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, এদুটী অন্যায়ের প্রতিকার না হলে ভারতবর্ষে শান্তি ফিরে আসবেনা এবং জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ও ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব করার একমাত্র কার্য্যকর উপায় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।

কংগ্রেসের অভিমত এই যে যতদিন উক্ত অন্যায় দুটীর প্রতিকার

ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হয়, ততদিন ভারতবাসীর পক্ষে ক্রমবর্ধমান অসহযোগ নীতি গ্রহণ ও পালন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

যারা এতদিন জনমত গঠনে ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করায় ব্রতী রয়েছেন, সে সব শিক্ষিত শ্রেণীর এদিকে কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। সরকার লোককে উপাধি ও সম্মান বিতরণ করে এবং বিদ্যালয়, আইন আদালত ও ব্যবস্থা পরিষদের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতার পরিপুষ্টি সাধন করেন। আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্বাপেক্ষা কম দায়-গ্রহণ ও ত্যাগস্বীকার বাঞ্ছনীয় বলে কংগ্রেস সাগ্রহে শিক্ষিত শ্রেণীদের কেবলমাত্র নিম্ন-বর্ণিত কয়েকটী কার্য্য করতে পরামর্শ দিচ্ছেন :—

(ক) উপাধি বর্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির মনোনীত সদস্যগণের সদস্যপদ ত্যাগ,

(খ) গভর্ণমেন্ট দরবার, লেভী এবং সরকারী বা আধা সরকারী সর্ববিধ অনুষ্ঠান বর্জন,

(গ) সরকারী বা সরকার অনুমোদিত স্কুল কলেজ ক্রমিক বর্জন ও বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা,

(ঘ) উকীল ও মক্কেলগণ কর্তৃক সরকারী আদালত বর্জন এবং পক্ষও প্রতিপক্ষগণের মধ্যে মামলা মিটাইবার জন্য সালিশী আদালত গঠন,

(ঙ) সৈন্য, কেরানী ও জন মজুরদের মেসোপোটেসিয়ায় কর্মগ্রহণে অস্বীকৃতি,

(চ) ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য পদ প্রার্থীদের নির্বাচন পত্র প্রত্যাহার এবং যাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করে প্রার্থী হবেন—এমন সব প্রার্থীকে ভোটদাতাদের ভোট না দেওয়া,

(ছ) বিদেশী দ্রব্য বয়কট।

নিয়ম শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করে অসহযোগ নীতি পরিকল্পিত কারণ এ দুটী ছাড়া কোন জাতি সত্যকার উন্নতি লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক নর নারী ও শিশুকে অসহযোগ নীতির প্রথম ধাপ অনুসরণের সুযোগ দেওয়া উচিত। এই কারণে কংগ্রেস

বস্ত্র সম্পর্কে সর্বসাধারণকে স্বদেশী ব্রতগ্রহণে পরামর্শ দেন, ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীয় পর্যবেক্ষণে পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি জাতির প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট সূতা উৎপন্ন করতে বর্তমানে অসমর্থ ও সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল অসমর্থ থাকবে ঃ এজন্য কংগ্রেস এই পরামর্শ দিচ্ছেন যে প্রত্যেক গৃহে চরকায় সূতাকাটা প্রবর্ত্তন করে যে সব লক্ষ লক্ষ তাঁতি উৎসাহের অভাবে জাত ব্যবসা পরিত্যাগ করেছেন, তাঁদের বস্ত্রবয়নে উদ্‌বুদ্ধ করে বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করা প্রয়োজন।"

বেজওয়াদা কর্ম্মসূচী রূপায়ণ

এই প্রস্তাব অনুসরণ ক'রে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তার বেজওয়াদা অধিবেশনে (৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল, ১৯২১) নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী দিলেন—(১) তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে ১ কোটি টাকা সংগ্রহ, (২) জনসাধারণের মধ্য থেকে ৩০ লক্ষ কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ এবং (৩ ২০ লক্ষ চরকা প্রবর্ত্তন। এক বৎসরের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

ভারতের শীর্ষ স্থানীয় নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের ঠিক পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতিকে অবলম্বন করে 'তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার' খোলা হয়েছিল। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২০) গান্ধীজীর নেতৃত্বে রচিত কংগ্রেসের নূতন নিয়মতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল। সেই অনুসারে ১৮ বৎসর বয়সের যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বীকার করে নিলে এবং চারি আনা চাঁদা দিলে কংগ্রেসের সদস্যরূপে গৃহীত হবে। বেজওয়াদা প্রোগ্রামে এইরূপ ৩০ লক্ষ সদস্য সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলাতে গঠিত জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং অন্যান্য কংগ্রেস কমিটিগুলি এই বেজওয়াদা কর্ম্মসূচী পালনের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হল। কংগ্রেসের আহ্বানে যাঁরা আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

কলিকাতা হাইকোর্ট থেকে অসহযোগী হলেন—বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (ব্যারিষ্টার) এবং সাতকড়ি পতি রায় (এড্‌ভোকেট্‌, হাইকোর্ট)।

কাঁথি কোর্টের অসহযোগী হলেন—বিপিনবিহারী অধিকারী (উকীল,) সুরেন্দ্রনাথ দাস (মোক্তার), উদয়নারায়ণ মণ্ডল (উকীলের মুহুরী)।

তমলুকের অসহযোগী উকীল ও মোক্তারগণ ছিলেন—মহেন্দ্রনাথ মাইতি, চণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীনাথচন্দ্র দাস, রজনীকান্ত প্রামাণিক, বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক, ক্ষীরোদচন্দ্র মণ্ডল, বিধুভূষণ হাইৎ, পঞ্চানন মণ্ডল ও চুনীলাল রায় ও মোক্তার রাধানাথ পণ্ডা।

মেদিনীপুর জজ কোর্ট থেকে অসহযোগে যোগ দিয়েছিলেন উকীল কিশোরীপতি রায়, অতুলচন্দ্র বসু, মন্মথনাথ দাস ও জহরলাল অধিকারী এবং মোক্তার রামমোহন সিংহ ও উমেশচন্দ্র বেরা।

ঘাটালের অসহযোগী উকীল ছিলেন মোহিনীমোহন দাস ও মনতোষণ রায়।

বিভিন্ন মহকুমার অসহযোগী শিক্ষকগণ :—নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, পরেশনাথ মাইতি, গিরিশচন্দ্র মাইতি, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর চন্দ্র মাল, অঘোরচন্দ্র দাস, পাঁচুলাল ঘোষ, পদ্মলোচলন সাহু প্রভৃতি।

বিশিষ্ট অসহযোগী ছাত্র—তমলুক মহকুমার কলেজ ত্যাগী বিপ্রচরণ মাইতি, রাজেন্দ্রনাথ গুড়্যা, কুমারচন্দ্র জানা, অজয়কুমার মুখার্জ্জী, সতীশচন্দ্র সামন্ত, হেমচন্দ্র রাউত, জ্যোতি পট্টনায়ক, হংসধ্বজ মাইতি, রমেশচন্দ্র কর, অনঙ্গমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীধরচন্দ্র সামন্ত, অবিনাশচন্দ্র দাস, সচ্চিদানন্দ ভৌমিক প্রভৃতি; কাঁথি মহকুমার জীবনকৃষ্ণ মাইতি, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি, বসন্তকুমার দাস, ভীমাচরণ পাত্র, শশিশেখর মণ্ডল, ভূতেশ্বর পড়্যা, অনিলকুমার মুখার্জ্জী, বিভূতিভূষণ মাইতি, সতীশচন্দ্র জানা, কাঙ্গালচাঁদ গিরি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মান্না, এবং রঘুনাথ মাইতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

সদর মহকুমার সরকারী বৃত্তিভোগী কলেজ ছাত্র নগেন্দ্রনাথ সেনের অসহযোগ অবলম্বন বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কাঁথি মহকুমার নিম্নলিখিত অসহযোগী, স্কুলত্যাগী ছাত্রগণের অধিকাংশ সমসাময়িক কংগ্রেস কর্মী হয়ে উঠেছিলেন—সুন্দরনারায়ণ মণ্ডল, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি (ছোট) জ্ঞানদাচরণ মাইতি, শ্রীপতিচরণ পণ্ডা, হরিপদ বাগুলি, দ্বিজেন্দ্রনাথ গিরি, সুধীরচন্দ্র দাস, বনবিহারী গুড়্যা, সন্তোষকুমার জানা, খগেন্দ্রনাথ শাসমল, সন্তোষকুমার সিংহ, প্রসন্নকুমার দাস, বসন্তকুমার দাস (বিদ্যালঙ্কার), অমরেন্দ্র দাস, শরচ্চন্দ্র দাস, অঘোরচন্দ্র পড়্যা, দিগম্বর পণ্ডা, নীলমণি দাস, পঞ্চানন গিরি, রাখালচন্দ্র মাইতি, নরেন্দ্রনাথ মাইতি, প্রসন্নকুমার গিরি, বঙ্কিম চন্দ্র নন্দ, সতীশ চন্দ্র দাস, শতদল কান্তি মণ্ডল, প্রভাত চন্দ্র মাইতি, নবীন চন্দ্র মহাপাত্র, গোপাল মাইতি, বলাই লাল দাস মহাপাত্র, বঙ্কিম চন্দ্র বারিক ও মনীন্দ্রনাথ প্রধান প্রভৃতি।

অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার ছাত্র সমাজে যে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জেগেছিল তাতে দেখা যায় বাংলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করেছিল—এই অনুমান স্বয়ং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (স্রোতের তৃণ—বীরেন্দ্রনাথ পৃঃ ২৬)।

যা হোক অধিকাংশ ছাত্র তাদের শেষ পরীক্ষার প্রাক্‌কালে স্কুল কলেজ ত্যাগ করায় তারা চেয়েছিল যেন বেসরকারী ভাবে তাদের শেষ পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের জন্যে যথেষ্ট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। কলিকাতাতে ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (ফর্বেস ম্যানসন) বিরাট বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যালয়েই কয়েকটি পর্য্যায়ের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় স্থাপিত গৌড়ীয় সর্ব্ব বিদ্যায়তন (National University) থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিভিন্ন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। স্বনামখ্যাত কিরণ শঙ্কর রায় ছিলেন গৌড়ীয় সর্ব্ব বিদ্যায়তনের সম্পাদক এবং অন্যতম কার্য পরিচালক ছিলেন সুখ্যাত মাখন লাল সেন মহাশয়।

ফরবেস্ ম্যানসনেই খোলা হয়—"কলকাতা জাতীয় মহাবিদ্যালয় (ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল কলেজ) এবং ইণ্ডিয়ান সিভিল

সার্ভিস ত্যাগী সুভাষ. চন্দ্র বসু হন ইহার অধ্যক্ষ। কয়েকজন অসহযোগী অধ্যাপক এখানকার অধ্যাপকরূপে কার্য্যে যোগ দেন। কিছু সময়ের মধ্যে খ্যাতনামা স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সুন্দরী মোহন দাসের অধ্যক্ষতায় "জাতীয় মেডিকেল কলেজ" (National Medical College) এবং ভিষকশ্রেষ্ঠ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় আয়ুর্বেদিক কলেজ "বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকাতেও অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরিচালনায় একটি জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। যে সকল অসহযোগী ছাত্র সাধারণ উচ্চ শিক্ষা বা বৃত্তিগত উচ্চ শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁরা এই কলেজগুলির সুযোগ গ্রহণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক দেশপ্রাণ শাসমল এবং সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক সাতকড়ি পতি রায় মহাশয়গণ করবেস্ ম্যানসনের সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" (National council of Eduction) এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বিভাগটি যাদবপুরে বরাবরই চলে আসছিল। অসহযোগী ছাত্রগণ এই কলেজটিরও সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

মেদিনীপুরের অধিকাংশ অসহযোগী ছাত্র নিজ নিজ এলাকার জাতীয় বিদ্যালয়গুলির (স্কুল) সহিত যুক্ত হয়েছিলেন এবং স- সাময়িক কংগ্রেস কর্মীরূপে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২-৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ মূলক স্বাধীনতার আন্দোলনে এঁরা জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

কংগ্রেস আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়নে মেদিনীপুর জেলাতে বহু ব্যাপক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব ঘটেছিল নিম্নে তার কিছু পরিচয় দেওয়া হল।

জাতীয় শিক্ষা

বিদেশী সরকারের আওতায় যে শিক্ষা প্রচলিত আছে তা দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক করেছে এবং জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন ব্যতীত জাতি গঠন সম্ভবপর নহে এই চিন্তা বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবাহে সরকারী স্কুল কলেজ ত্যাগী শিক্ষক ও ছাত্রগণ সর্বাগ্রে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হলেন। বঙ্গ দেশের অন্যান্য জেলাব ন্যায় মেদিনীপুর জেলাতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অত্যন্ত বলবতী হয়ে উঠল। এই সময় গড়ে উঠল কাঁথি মহকুমাতে দশ শ্রেণী বিশিষ্ট কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়। তমলুক মহকুমাতে অনন্তপুর, কাঁকুড়দা (মহিষাদল) জাতীয় বিদ্যালয়এ এই দুইটি মহকুমা ও সদর মহকুমাতে মধ্য ও প্রাইমারী মানের অনেক গুলি বিদ্যালয়। এক একটি বিদ্যালয় হয়ে উঠল জাতীয়তা উন্মেষের ও জাতীয়তা প্রচারের এক একটি সুদৃঢ় দুর্গ। সরকাবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে তখন 'গোলামখানা' আখ্যা দেওয়া হল। চাকুরী মনোবৃত্তি ও ইংরেজেব অনুকবণে জীবন গঠনের দাস মনোভাব ত্যাগ করে স্বাবলম্বী মানুষ সৃষ্টিব একটি সুস্থ আবহাওয়া তৈরী হল জাতীয় বিদ্যালয় গুলিতে। শিক্ষকগণ এলেন সরকারী অনুমোদিত বিদ্যালয় গুলির উপযুক্ত পরিমাণ বেতন ভাতা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে। গ্রহণ করলেন ত্যাগব্রতী জীবন। ছাত্ররাও হলেন মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্য জাতীয় শিক্ষালাভে সঙ্কল্পবদ্ধ। যে অবস্থার মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট কংগ্রেসের আহ্বান এসেছিল সরকার পরিচালিত বা অনুমোদিত বিদ্যালয় ত্যাগের সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনেব সাধনায় জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ হয়ে উঠলেন এক এক জন জাতীয় সৈনিক।

মেদিনীপুর জেলার জাতীয় বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায়—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথের সক্রিয় যোগছিল। বঙ্গীয়

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত (১৯২১) হওয়ার পর তিনি এই বিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। তিনি তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে লিখেছেন—"আমি সর্ব প্রথমে জাতীয় বিদ্যালয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম। কেননা আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষে, আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা ধর্মনীতি চরিত্র স্বার্থত্যাগ ও দেশভক্তিতে তাঁদের যে প্রকার উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল সেরূপ উন্নতি লাভ করতে পারছেন না। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যাক্তিগণ যেমন একদিকে আপনাদিগকে জাতীয় বা নিজস্ব মঙ্গলজনক যা কিছু তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হারিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে বিজাতীয় বা পরস্ব মঙ্গলজনক বস্তু সমূহকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগের কথঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে বটে কিন্তু সে জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে কার্য্যে পরিণত করার ক্ষমতা বা আন্তরিকতা আমরা আমাদের শিক্ষার ভিতরে পাই নাই। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান বৃদ্ধিও হয় নাই, কেবল অশিক্ষিত-দের তুলনায় কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে তাদের বিদ্যাবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র, কারণ জ্ঞানবৃদ্ধি হয়ে থাকলে বিদ্যাকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতাও তাদের বৃদ্ধি হতো। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করবো যে, বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা প্রদান করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদিগের হাতে নাই কিন্তু ক্ষমতা লাভ করতে হলে কেবল বক্তৃতা দ্বারা তা লাভ হতে পারে না বলেই সংস্থাপিত বিদ্যালয়-গুলির সংরক্ষণের দিকে সর্বাগ্রে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল।'

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষ্যে তাঁর লিখিত ভাষণে বলেছিলেন—"জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাথা উঁচু করিয়া থাকে ইহাদের মধ্যে দেশ মাতৃকার প্রতি ভালবাসা জাগ্রত। ইহারা নরনারায়ণের সেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত।"

কলাগাছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়

কলাগাছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ১লা মার্চ—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেছিলেন। খেজুরী থানার কলাগাছিয়া গ্রামেব সন্তান নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে কলাগাছিয়া চলে আসেন। কলাগাছিয়ার দেশকর্মী জগদীশ চন্দ্র মাইতি এদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বিদ্যালয়ের উপযোগী স্থান, জলজমি দান করলেন এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন। নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি হলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ও পরেশনাথ মাইতি হলেন সহঃ প্রধান শিক্ষক। পরেশবাবু পরে প্রধান শিক্ষকও হন। অসহযোগী গ্রাজুয়েট শিক্ষক গিরিশ চন্দ্র মাইতি এই বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সাংখ্য-তীর্থ ছিলেন হেড পণ্ডিত। অসহযোগী কলেজ ছাত্র—বিভূতি ভূষণ মাইতি, হেমচন্দ্র বাউত প্রভৃতি এবং প্রবীণ শিক্ষক বরেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ কলাগাছিয়া মাইনর স্কুলের শিক্ষকবর্গ জাতীয় বিদ্যা-লয়ে যোগ দেন। বিদ্যালয়টি দশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়রূপে পরিচালিত হত। কলাবিভাগের সঙ্গে একটি ব্যবহারিক বিভাগ ছিল তাতে চরকা, তাঁত ও সেলাই শেখানো হত। এই বিভাগের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শ্রীকেনারাম পাল। ক্রমে বিদ্যালয়টি খেজুরী থানার কংগ্রেসের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পরে মধ্য খেজুরির অজয়া গ্রামে খেজুরী থানা কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। নিকুঞ্জবাবু প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ করে সর্ব্ব সাময়িক কংগ্রেস কর্মী হিসাবে থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদে বৃত হন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক জগদীশবাবু, শিক্ষকবর্গ সকলেই বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথ দীণ্ডা ও কৃতী ছাত্র রাসবিহারী পাল খেজুরী থানার কংগ্রেস সংগঠনে প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে নিকুঞ্জবাবু পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী হয়েছিলেন। রাসবিহারী বাবু হ'য়েছেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য। ইনি জেলা

পরিষদের এবং জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে এবং জেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ডাক্তার বিপিন বিহারী সাহু চিকিৎসক রূপে এবং মতিলাল সাহু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পড়্যা প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ার রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক হেমচন্দ্র রাউৎ মহাশয় বিদেশে জাহাজ নির্মাণ বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা লাভ ক'রে কতকগুলি জাহাজ নির্মাতা কোম্পানীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ভারত সরকারের অধীনে ভাইজাগ বন্দরে হিন্দুস্থান সিপইয়ার্ড লিমিটেডের সর্বোচ্চ পদ লাভ করেছিলেন।

এই বিদ্যালয়টির সরকারী অনুমোদন গ্রহণ সম্পর্কে কমিটির মধ্যে গুরুতর মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২৪ সালে বিদ্যালয়টির সরকারী অনুমোদন লাভের পর এখান হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষকতা ও অন্যান্য প্রকার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী পদ লাভ ক'রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। বিদ্যালয়টি এখন কলাগাছিয়া 'জগদীশ বিদ্যাপীঠ' নামে পরিচিত

কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়

কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কাঁথি সহরে ৭ই মার্চ্চ (১৯২১) তারিখে। কাঁথি মডেল ইনষ্টিটিউশন কাঁথি হাইস্কুল এবং নিকটবর্ত্তী কয়েকটি হাইস্কুলের অসহযোগী ছাত্রগণ বিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে তারা আর 'গোলাম খানায়' পড়বে না। দিগম্বর পড়্যা প্রমুখ ছাত্রগণ এই শপথ গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে কাঁথিতে আহ্বান করা হয় এদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯২১) কাঁথি সরস্বতী তলায় একটি জনসভা হয়। সেই সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি তাঁর কাঁথি সহরের বসতবাড়ী জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন।

বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের অসহযোগী ছাত্রগণকে নিয়ে এবং অতুল চন্দ্র শাসমল, ভূতেশ্বর পড়্যা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মান্না, অনিল কুমার মুখার্জী প্রমুখ অসহযোগী কলেজ ছাত্রগণকে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত ক'রে কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। অসহযোগী ছাত্র সতীশ চন্দ্র জানা বিদ্যালয়ের সম্পাদক নির্বাচিত হন। অল্প দিনের মধ্যে কাঁথি মডেল ইনষ্টিটিউশন ও কাঁথি হাইস্কুলের প্রমথ বাবু, ঈশ্বর বাবু, পাঁচু বাবু, অঘোর বাবু, পদ্মলোচন বাবু প্রভৃতি কয়েকজন শিক্ষক নিজ নিজ পদে ইস্তফা দিয়ে কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেন। অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক আইন কলেজের অসহযোগী ছাত্র জীবন কৃষ্ণ মাইতির স্থলে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে বিজয়কৃষ্ণ মাইতি প্রধান শিক্ষক হন। অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে ঈশ্বর চন্দ্র মাল, পদ্মলোচন সাহু, দেবেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, বসন্ত কুমার দাস, পাঁচুলাল ঘোষ, ময়তার আলি মিঞা, ঝাড়েশ্বর দাস, অঘোর চন্দ্র দাস, রঘুনাথ মাইতি কাব্যতীর্থ, ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান, সুরেন্দ্রনাথ দাস, প্রফুল্লকুমার মাইতি, পুলিনবিহারী পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে কাজ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জেলা বোর্ড, বঙ্গীয় বিধান পরিষদ, বিধান সভা, গণ পরিষদ ও পার্লামেন্টের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ইত্যাদি হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের কলা বিভাগটির সঙ্গে যে ব্যবহারিক বিভাগ ছিল তাতে শিক্ষক ছিলেন—অনিলকুমার মুখার্জী (চারকা আবশ্যিক) বিহারীলাল মাইতি (তাঁত), রমেশচন্দ্র রাণা (লোহার কাজ)। ব্যবহারিক বিভাগগুলির অন্যতম পরিচালক এবং বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা হরিপদ পাহাড়ী তাঁর চন্দ্র বাগান ভুক্ত জমি থেকে দুই বিঘা জমি দান করেন এবং দেশ-বাসীর অর্থানুকুল্যে ঐ জমির উপর বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা হয়। এই গৃহ নির্মাণের সময় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ অদ্ভুত স্বাবলম্বন ও কায়িক পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত দেখান। এই গৃহ মহাত্মাগান্ধী,

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ (পরে রাষ্ট্রপতি) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শেঠ যমুনালাল বাজাজ প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের পদার্পণে ধন্য। এই বিদ্যালয়ে এমন একটি নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে পরীক্ষার সময় কোন গার্ড (পর্যবেক্ষক) নিয়োগের প্রয়োজন হত না। একবার একটি ছাত্র পরীক্ষা কক্ষের বাইরে গিয়ে কোন পুস্তক দেখে নেওয়ার জন্য সকলের নিকট কঠোর ধিক্কারের ভাগী হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিষ্কৃতি পায়।

জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সালিশ মীমাংসা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, হিন্দি প্রচার, চরকা ও খদ্দর প্রচলন ইত্যাদি গঠনমূলক কার্য্যে উদ্‌যোগ ও প্রেরণার স্থল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এইসব কার্য্যের সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা কম ছিল না। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় গৃহটি ছিল প্রধান সংগ্রাম শিবির। এক কথায় এটিকে মহকুমা, এমনকি জেলার জাতীয় সংগ্রামের পীঠস্থান বলা যায়।

অন্যান্য দশ শ্রেণী যুক্ত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির ন্যায় কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয় প্রথমে গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনের (দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ছিল। পরে ইহা যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষাপর্ষদের (National Council of Education) অনুমোদন লাভ করে। এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলির শেষ পরীক্ষা (আদ্য) প্রবেশিকা পরীক্ষার সমান বলে গণ্য হত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে স্বাধীনতার পর শিক্ষকতা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের সহিত সমান স্থান দেওয়া হয়েছিল।

কাঁথি, কলাগাছিয়া প্রভৃতি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা বিদ্যাপীঠ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজ) ঢাকা জাতীয় কলেজ, বিহার বিদ্যাপীঠ গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি জাতীয় কলেজে পড়াশুনা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিছু ছাত্র যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (তখন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি) এবং বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি আয়ুর্বেদ ও এ্যালো-প্যাথিক কলেজে পড়াশুনা করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ কোর্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোর্সে পড়াশুনার জন্যে যাননি তাঁরা কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, সেলাই, বই বাঁধা, রং ও ছাপানো প্রভৃতি ক্ষুদ্র-শিল্পের কাজ অবলম্বন ক'রে উপার্জ্জনশীল হয়েছিলেন।

এই বিদ্যালয়ের কয়েকটি কৃতী ছাত্রের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কাঁথি থানার মির্জ্জাপুর গ্রামে বনবিহারী গুড্যা, ধনবান পিতার একমাত্র সন্তান হয়েও ব্রহ্মচারীর কঠোর জীবন যাপন করত এবং নিজ পরিবার ও গ্রামের মধ্যে এবং থানার অন্যান্য স্থানে তার আদর্শ অনুকরণীয় ছিল। আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিহার বিদ্যাপীঠে উচ্চতম শিক্ষালাভের জন্য গিয়ে স্নানের সময় গঙ্গার অল্প জলে তার দেহ চিরতরে নিমজ্জিত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রাপ্ত সুশান্ত কুমার মাইতি ডেটিনিউ হিসাবে বন্দী থাকার পর বিড়লা জুট মিলে উচ্চ চাকুরিতে অধিষ্ঠিত থাকলেও তাঁর দেশ সেবার কার্য্যে বিরাম ছিলনা। আমেরিকা প্রত্যাগত ইঞ্জিনিয়ার সন্তোষ কুমার জানা বিড়লা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত একটি কারখানার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও পরে অন্যতম পরিচালক ছিলেন, তিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। নিত্যানন্দ নায়ক ছিলেন বাটা সু কোম্পানীর একজন অফিসার। তিনিও এখন পরলোকগত। বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র উচ্চতর জাতীয় শিক্ষালয়ে শিক্ষিত চঞ্চল কুমার জানা এখন উত্তর প্রদেশ সরকারের অধীনে ইনটারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র সুধীর চন্দ্র দাস একসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। প্রাক্তন ছাত্র বলাই লাল দাস মহাপাত্র এখন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অন্যতম সদস্য। এঁরা উভয়েই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ

সুপরিচিত এবং নিজ নিজ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ বসন্ত কুমার সাউ, ডাঃ জীবন কৃষ্ণ দাস মহাপাত্র, ডাঃ সতীশ চন্দ্র দাস প্রভৃতি কয়েকজন এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক রূপে সুপরিচিত ছিলেন। প্রাক্তন ছাত্র প্রসন্ন কুমার গিরি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র জাতীয় মেডিকাল ও আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজে শিক্ষা লাভ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। (উল্লেখযোগ্য যে কাঁথির অন্যতম কংগ্রেস নেতা ও বর্ত্তমান 'জনতা' নেতা) ডাঃ রাসবিহারী পাল এম, এল, এ ডাঃ বিপিন বিহারী সাউ, ডাঃ জনার্দ্দন হাজরা, কবিরাজ ভূপেন্দ্র নাথ মাইতি ও ফণীভূষণ মাইতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঞ্জিনিয়ার মতিলাল সাউ ও জ্যোতিরিন্দ্র পড়্যা বিশেষ সুপরিচিত। স্বর্গত কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি কাব্যতীর্থ বৈদ্যশাস্ত্রী সরকারী বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে কলিকাতা বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কবিরাজী ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং কাঁথিতে বৈদ্যক পাঠশালা নামক একটি আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উহা এখন 'রঘুনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়' নামে পরিচিত। ইনি এক সময়ে কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ইনি ছিলেন কাঁথি সেবাসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কংগ্রেসের একং নিষ্ঠাবান কর্ম্মী হিসাবে ইনি কারাদণ্ড প্রভৃতি বহু নির্য্যাতন ভোগ করেছিলেন। থ্রোম্বোশিষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এর অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেলেও চিরকুমার রঘুনাথ বাবু দেশ সেবায় সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মী জীবন যাপন করে গিয়েছেন। এঁর লিখিত স্বদেশী ভাব-উদ্দীপক গীত ও কবিতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইঁহার রচিত কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত পুস্তক বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে জেলার অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর জাতীয় বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব না থাকলেও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়টি এখন একটি রেজেষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান রূপে বিদ্যমান আছে এবং এটি শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ

অবলম্বন ক'রে পরিচালিত হচ্ছে।—কেন্দ্রীয় সমজকল্যাণ পর্ষদের অধীনে বয়স্কা নারী শিক্ষার একটি কেন্দ্রের তিনটি পর্য্যায় এখানে পরিচালিত হয়েছিল।

অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয়

তমলুক মহকুমার 'সুতাহাটা' থানাতে বি, এস, সি, অনার্স ক্লাসের অসহযোগী ছাত্র কুমার চন্দ্র জানার প্রচেষ্টায় অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুমার বাবুরা প্রথমে গ্রামের বৃন্দাবন জীউর মন্দির প্রাঙ্গনে হোগলার চালায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেন।

পরে শ্রীমতী সুররমা দেবী তাঁর বাড়ীর সামনে পুষ্করিণী সহ পাড়ের জমি দান করেন। কুমার বাবু ছাত্রদের নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাঠ, খড়, বাঁশ, ধান, চাল ভিক্ষে ক'রে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ ও ছাত্রাবাস নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা' পুস্তক থেকে এ বিষয়ে কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করা হল—"১৯২১ সাল। কুমার চন্দ্র অনন্তপুর গ্রামে বছরের শুরুতেই একটী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে ছিলেন সতীর্থ ও বন্ধু সূর্য্য কুমার চক্রবর্ত্তী। সূর্য্য কুমার হলেন প্রধান শিক্ষক। কুমার চন্দ্র হলেন সম্পাদক, শিক্ষক ও প্রধান সংগঠক। বিদ্যালয়ের সহকারিতায় এগিয়ে এলেন জামাল চকের জীবেশচন্দ্র দেব পট্টনায়ক, আমলাটের বিধু মিশ্র, দেভোগের শশাঙ্ক প্রধান, ডালিমচকের শ্রীনিবাস জানা, আকুবপুরের প্রমথ নাথ মাইতি, ডায়মণ্ডহারবারের শশীভূষণ দাস, নন্দরামপুরের জ্ঞানেন্দ্র নাথ বেরা, জুলেটার হরিপদ সিং, হোড়খালির হরিশ ভৌমিক, আমলাটের প্রমথ অধিকারী ও হেমন্ত চক্রবর্তী, সেখ রেফায়েত উল্লা, নিতাই সামন্ত প্রভৃতি। প্রায় তিনশো ছাত্র দেখতে দেখতে হয়ে গেল। অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষা ছিল কারপেন্টারী, উইভিং, চরকায় সুতাকাটা তূলাধোনা প্রভৃতি। কুমার বাবুর নেতৃত্বে ছাত্রগণ অনাড়াম্বর জীবন-যাত্রা পরিচালন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, মামলা প্রভৃতির আপোষ মীমাংসা, কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ, বিদেশী বর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন।

এই বিদ্যালয়টি "গৌড়ীয় সর্ব্ব বিদ্যায়তনে"র মঞ্জুরী লাভ করে ছিল। এখান থেকে শেষ পরীক্ষায় (আদ্য) উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ছিলেন—রজনী প্রামাণিক (বাজিৎপুর), চারু দাস (বাবুপুর), শরৎচন্দ্র কর (বাসুদেবপুর), অনন্ত খাটুয়া (অনন্তপুর). জনার্দন হাজরা (সিজাবেড়িয়া পরবর্তী কালে একজন জনপ্রিয় ডাক্তার), ত্রিলোকেশ সামন্ত (গাজিপুর), বিভূতি ভূষণ বেরা (নন্দরামপুর) গুণাকর জানা (বাসুদেবপুর), ধীরেন্দ্রনাথ জানা (যাদবপুর), বঙ্কিম চন্দ্র ভৌমিক (অনন্তপুর), জ্যোতি প্রসাদ মাইতি (দোর-রাজারামপুর), নিত্যগোপাল দাস (বড়বাড়ী), যুগল হালদার— পরে স্বামী সর্বানন্দ (ডায়মণ্ড হারবার) প্রভৃতি।

বিদ্যালয়টি সমগ্র থানার জনসাধারণের অত্যন্তপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁরা এর জন্য সাহায্য দানে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা' পুস্তকে লেখক নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখ করেছেন— বামাচরণ দাস (হরিবল্লভপুর), জনার্দন দেবদাস ও গোষ্ঠ পণ্ডা (তাজপুর), ভূতনাথ প্রামানিক পার্বতীপুর), বাহার ডাবের বেরা পরিবার, চৈতন্যপুরের মাইতি পরিবার, আকুবপুরের মাইতি পরিবার, হাদিয়ার মাঝি ও দাস পরিবার, শোভারামপুরের বক্সী ও চৌধুরা পরিবার, চাউল খোলার মান্না পরিবার. বাসুদেবপুরের দণ্ডপাট পরিবার, অনন্তপুরের খাটুয়া ও ঘাঁটি পরিবার, বাজিৎপুরের বেরা পরিবার, ভীমাচরণ সামন্ত, ইন্দ্রনারায়ণ পাড়ুই, ভবতারণ ভৌমিক (তালিচক) অবিনাশ চন্দ্র ভৌমিক (সুতাহাটা)।

দেশের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিদ্যালয়টি দীর্ঘ জীবন লাভ করে নি কিন্তু এর ছাত্র ও শিক্ষকবর্গের মধ্যে অনেকে দীর্ঘকাল সমাজসেবা করে সুপরিচিত হয়েছিলেন।

কাঁকুড়দহ জাতীয় বিদ্যালয়

তমলুক মহকুমার অন্যতম উচ্চ শ্রেণীর জাতীয় বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছিল—মহিষাদল থানার কাঁকুড়দহ গ্রামে। মহিষাদল বাজার থেকে

২ মাইল দক্ষিণে হিজলী টাইডাল কেনেলের তীরে অবস্থিত বিদ্যালয়টির পরিবেশ খুবই মনোরম ছিল। মহকুমার অন্যতম ত্যাগব্রতী অসহযোগী শিক্ষক গুণধর হাজরা বি. এস. সি একটি হাইস্কুলের সহঃ প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন। পূর্ণচন্দ্র মাইতি, যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি, ভবতোষ দাস, শ্রীপতি চরণ বয়াল, সতীশ চন্দ্র সামন্ত, রমনী মোহন মাইতি, গোঁরা চাঁদ গিরি, ধীরেন্দ্রনাথ দাস (কাঁথি ভগবানপুর থানা) প্রমুখ কর্মীগণ এই বিদ্যালয়ের কর্মী ও প্রধান উদ্যোক্তা হলেন। স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে রুদ্র নারায়ণ মাইতি, প্রফুল্ল কুমার মাইতি, ঈশান চন্দ্র মাইতি, বিধুভূষণ মণ্ডল প্রভৃতি ছিলেন অন্যতম। প্রধান শিক্ষক গুণধরবাবু কংগ্রেস কার্যের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময় ১৯২২ সালের মে মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁর সম্বন্ধে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে লিখেছেন---"আমার স্মরণ হয় তাঁর সৌম্য শান্ত মূর্তি এবং দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে, তাঁর সেই ঐকান্তিক কামনা ও আগ্রহ।" গুণধরবাবুর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টির 'কাঁকুড়দহ গুণধর জাতীয় বিদ্যালয়' নামকরণ করা হয়। গুণধরবাবুর পরে গোরাচাঁদ গিরি ও শ্রীপতি চরণ বয়াল প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করেন। কাঁকুড়দহের পূর্ণচন্দ্র মাইতি প্রমুখ মাইতি পরিবারের স্বদেশ সেবক ব্যক্তিগণ বিদ্যালয়টির নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য প্রায় তিন বিঘা উঁচু জমি ও পুষ্করিণী দান করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বাঁশ, খড়, ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। যাতে স্বাবলম্বনের শিক্ষা লাভ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত সাধারণ বিষয়গুলির সঙ্গে চরকায় সূতা কাটা, খদ্দর বোনা, লেখার কালি, জুতার কালি ও সাবান তৈরী শিক্ষা দেওয়া হত।

বিদ্যালয়টি মহিষাদল থানার কংগ্রেস কার্য্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রধান শিক্ষক গুণধরবাবু এবং শিক্ষক শ্রীপতিবাবু ও ভবতোষ

বাবু, পৃষ্ঠপোষক পূর্ণচন্দ্র মাইতি কংগ্রেসের কার্য্যের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।—১৯২৬ সালে আর্থিক কারণে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি – মির্জ্জাপুর বনমালী চট্টা বায়েন্দা মাণিক জোড়

উচ্চ বিদ্যালয়গুলি ব্যতীত কয়েকটি ছয় শ্রেণীযুক্ত মধ্য এবং চার শ্রেণীযুক্ত প্রাইমারী বিদ্যালয়ও অসহযোগ আন্দোলনকে অবলম্বন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাঁথি মহকুমার কাঁথি থানাতে মির্জাপুর জাতীয় বিদ্যালয় ও বনমালী চট্টা জাতীয় বিদ্যালয় এবং ভগবানপুর থানাতে বায়েন্দা জাতীয় বিদ্যালয় যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। মির্জাপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অসহযোগী ছাত্র শশিশেখর মণ্ডল এবং তাঁর সহকারী রূপে কার্য্য করতেন জ্ঞানদা চরণ মাইতি। বায়েন্দা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—ভীমা চরণপাত্র ও অন্যতম শিক্ষক ছিলেন—অমরেন্দ্রনাথ মাইতি।

বনমালী চট্টা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থানীয় জমিদার জানা ও বারিক পরিবারের অর্থানুকূল্যে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় রূপে পরিচালিত হত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাস। বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির সভাপতি শিবপ্রসাদ জানা, গোবিন্দ প্রসাদ বারিক, শ্রীনাথ চন্দ্র জানা প্রভৃতি পরিচালকবর্গ ঐ অঞ্চলটিকে একটি প্রধান স্বদেশী কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। কাজেই ওখানকার বাতাবরণ দেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল। বিদ্যালয় পরিচালক কমিটির সভাপতি শিব প্রসাদ জানা মহাশয়ের পুত্র সতীশ চন্দ্র জানা অসহযোগী ছাত্র রূপে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রথম থেকেই কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় বনমালী চাট্টা বিদ্যালয়ে তার প্রতিক্রিয়া খুব গভীর হয়েছিল। তাঁর কারামুক্তিতে ওখানে যে অভিনন্দন সভা হয় তাতে ঐ বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয় রূপে ঘোষণা

ক'রে সরকারী অনুমোদনের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বেকার প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তখন একজন অসহযোগী আইনজীবী হিসাবে তাঁর লাভজনক আইন ব্যবসা পরিত্যাগ ক'রে পূর্ণ সময় দেশ সেবায় নিয়োগ করেছেন। তাঁকে বনমালী চাট্টা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করায় তিনি তাঁর পূর্ব কর্মস্থলে ফিরে এসে তাঁর সহকর্মীগণের সাহায্যে বিদ্যালয়কে একটি কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেন। বিহারীলাল পড়্যা বঙ্কিম চন্দ্র প্রধান প্রমুখ এই কেন্দ্রের কর্মীগণই প্রধানতঃ বাহিরী থানা কংগ্রেস কমিটি গঠন ও পরিচালনা করেন। উল্লিখিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির কলা বিভাগে ইংরাজী, সাহিত্য, বাংলা, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যবহারিক শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। ঐ বিষয়গুলির মধ্যে চরকা ও তকলী ছিল প্রধান। বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও ছাত্রগণ ছিলেন মূলতঃ স্বাধীনতার কর্মী। বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কংগ্রেসের কর্মধারা অবলম্বন ক'রে গ্রামে সেবার কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করতেন। তাঁদের অবকাশগুলি বিশেষভাবে ব্যয়িত হত গ্রামাঞ্চলের কাজ অবলম্বন ক'রে। এই বিদ্যালয়গুলি তাদের ছাত্র সম্পদের গৌরব করতে সক্ষম। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এঁদের খ্যাতি ও প্রভাব প্রভূত হিত কর্মের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে এঁরা বিশিষ্ট সংগঠক রূপে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এঁদের সৎ কর্মের আগ্রহের জন্য এঁরা জনসাধারণের নিকট প্রভূত সম্মান ও আদর পেতেন।

সদর মহকুমার নাড়মাতে দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতির উদ্যোগে একটি মধ্য ইংরাজী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা কারণে ইহা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

কাঁথি মহকুমাতে এগরা থানার ভবানীচক্ বাজারে একটি জাতীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার নাম দেওয়া হয় 'প্রথম পাঠাগার।' রাধাশ্যাম দাস, বঙ্কিম চন্দ্র দাস, প্রাণকৃষ্ণ সাহু প্রভৃতি

স্থানীয় কংগ্রেস পরিচালকগণ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টিও স্বল্পায়ু হয়েছিল।

নানকার বামুনিয়া গ্রামে ধরণী ধর জানা ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উৎসাহে একটি জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বামুনিয়া প্রাইমারী জাতীয় বিদ্যালয় (কাঁথি থানা), পদ্মতামলি জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয় (ভগবানপুর থানা) ইত্যাদি থেকে সুপরিচালনার রিপোর্ট আসত।

বামুনিয়া গ্রামের একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী বসন্ত কুমার দাস খুবই উৎসাহের সঙ্গে বামুনিয়া জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়টি পরিচালনা করতেন। এটি অন্ততঃ দু'বছর চলেছিল।

প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে গতানুগতিক মনোভাব উচ্চ আদর্শের অভাব, চরিত্র গঠনের বিষয়ে অবহেলা ইত্যাদি কারণে ঐগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি দেশের জনসাধারণের মনে কোন আগ্রহ বা ভালবাসার ভাব ছিল না। ঐরূপ শিক্ষার প্রতি অসহযোগ কর্মসূচী একটি ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করেছিল। সরকারী স্কুল কলেজ ত্যাগ অসহযোগ কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ ছিল—এর রাজনৈতিক দিক যত না প্রবল ছিল তাহা অপেক্ষা বহুগুণ প্রবল ছিল নূতন ভাব ও চিন্তার মানুষ সৃষ্টি করা—যারা হবে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান যাদের প্রাণ আকুল হবে নিজেদেরকে দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সৈনিক রূপে গড়ে তোলার জন্য।

এগরাতে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণের চেষ্টায় এবং কংগ্রেস অনুরাগী মাইতি পরিবারের সাহায্যে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অসহযোগ ব্রতী রঘুনাথ মাইতি ছিলেন প্রধান শিক্ষক। এটি বেশি দিন চলেনি।

ভগবানপুর থানার মাণিকজোড় গ্রামে ১৯২৬ সালে মাণিক জোড় কামিনী কুমারী হাইস্কুল (প্রথমে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রধান দাতা ছিলেন—রাধাকৃষ্ণ মাইতি মহাশয়। তিনি তাঁর বিমাতার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ ও

অন্যান্য কার্য্যোপযোগী ২০ বিঘা জমি দান করেন। ভীমা চরণ পাত্র, রঘুনাথ মাইতি, ঈশ্বর চন্দ্র কর প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীগণ ইহার পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। চরকায় সুতা কাটা ছিল বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছিল এই বিদ্যালয়টি একটি পূর্ণ জাতীয় বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও সেই ভাব ও আবহাওয়ার মধ্যে যাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণের শিক্ষা দান ও গ্রহণে কার্য্য পরিচালিত হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা এবং অসহযোগ কর্মধারা দেশব্যাপী একটি স্বাবলম্বনের ও পরবশ্যতা থেকে মুক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পী যারা সর্বদাই অবহেলিত হত তারা মর্য্যাদা পেতে লাগল। শ্রমের মর্য্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। চারণ কবি মুকুন্দ দাস ১৯২৩ সালে কাঁথি এসে এবং তারপর জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ক'রে উদাত্ত সুরে গাইতে লাগলেন—'ধন্য দেশের চাষা তাদের চরণ ধুলি মাথায় নিলে প্রাণ হয়ে যায় খাসা'; 'করমেরই যুগ এসেছে- সবাই কাজে লেগে গেছে আমরা কি রইব শয়ান'—এইসব সঙ্গীতের মাধ্যমে যে কর্মের আহ্বান এবং শ্রমকে শ্রদ্ধার সম্মানে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল তাতে কৃষকের দেশ মেদিনীপুর জেলার মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এক নূতন ভাবে ও উদ্যমে।

এই সময়ের একটি ঘটনা সাতকড়ি পতি রায় মহাশয়ের সরস ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে। (প্রণব পত্রিকা ১৩৭২ 'দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর' প্রবন্ধে)--"শাসমল গেল তমলুকে। মহেন্দ্র মাইতিবাবু প্রধান উকীল। ওকালতি ছেড়ে কংগ্রেস গঠনে লেগে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আরও উকীলগণ প্র্যাক্‌টিস ছাড়লেন। শাসমল গেল কাঁথিতে তার দেশ। উকীলবাবুরা বললেন—তুমি মাহিষ্যের ছেলে যদি লাঙ্গল কর আমরা ওকালতী ছাড়ব! বীরেন কি ছাড়বার পাত্র! পরের দিন সকালে লাঙ্গল ঘাড়ে করে গরু নিয়ে মাঠে

নামল। সকলে অবাক।......সমস্ত মাহিষ্য সম্প্রদায় বীরেনের এই কীর্ত্তি দেখে তাঁর পেছনে দাঁড়াল।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই হলকর্ষণ উৎসবে কাঁথির নামী উকীল বরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেছিলেন—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জাতীয় বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক তো ছিলেনই।

চরকা ও খদ্দর

চরকায় সুতা কাটা প্রবর্তন অসহযোগ কার্যধারার অন্যতম অঙ্গ ছিল। বেজওয়াদাতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি স্থির করেছিলেন যে প্রবর্তিত চরকার সংখ্যা অন্ততঃ ২০ লক্ষ হওয়া আবশ্যক। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ভারতীয় রাজনীতিতে নব যুগের শ্রষ্টা মহাত্মা গান্ধীর নিকট চরকা ছিল—বিকেন্দ্রীত শিল্প সমন্বিত অর্থনীতির ও শোষণ বর্জিত, আত্ম প্রত্যয় সম্পন্ন সমাজের প্রতীক। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য চরকা ও খদ্দর গ্রহণকে তিনি অপরিহার্য্য মনে করতেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে এই দৃঢ় সন্দেহাতীত প্রত্যয়কে স্থান দিয়েছিলেন অন্ততঃ আধঘণ্টা চরকায় সূতা না কেটে তিনি তাঁর দিনের কাজ শেষ করতেন না। এটি তাঁর নিকট ধর্মাচরণের ন্যায় পবিত্র ও অবশ্য করণীয় কার্য ছিল।

১৯২৫ সালে মেদিনীপুর পরিভ্রমণকালে তিনি যেদিন কাঁথি পৌঁছেন সেদিন প্রায় ১১টা রাত্রি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখন তাঁর চরকা কাটা কাজটি হয়ে উঠেনি। তখন দেখা গেল সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁর চরকাটি ঠিক করে দিলেন এবং তিনি আধ ঘণ্টা চরকা কাটার পর শয্যাগ্রহণ করলেন। তাঁর এই সময়ের ব্যবহারের চরকা ছিল খাদি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত আটপাখা যুক্ত হালকা চরকা। এই আদর্শ বেজওয়াদা কর্মসূচী নির্ধারিত চরকা প্রচলন কার্য্যে মেদিনীপুরের কর্মীগণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মেদিনীপুর জেলাতে পুরাতন চরকা কাটা প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কতকগুলি অঞ্চল ছিল যেখানে তূলার চাষ এবং চরকায় সূতাকাটা বরাবরই চলে আসছিল। এক সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পরিশ্রম জাত সূতার দ্বারা পরিবারের বস্ত্রের চাহিদা মিটিয়ে নিতেন—পরবর্তীকালে এই স্বর্ণযুগের অস্তিত্ব আর ছিল না কিন্তু কিছু কিছু বস্ত্র অবশ্যই তুলাতে ঘরের চরকাতে কাটা সূতাতে প্রস্তুত হ'ত। তাছাড়া ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি পৈতা তৈয়ারী ও অন্যান্য কাজের জন্য কিছুনা কিছু সূতা কেটে নিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আবার পুরাতন চরকাগুলিতে ভাল ভাবে কাজে লাগাবার প্রভূত আগ্রহের সৃষ্টি হল। গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতি জনসভাতে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হত :—

"ঘোর ঘোর ঘোরবে আমার সাধের চরকা ঘোর
স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চরকা শব্দে তোর॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুনতে যেন পাই,
ঐ খুলল স্বরাজ সিংহ দুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আসল ভারত-ভাগ্য রবি, কাটল দুখের রাত্রি মোর॥
ঘর ঘর তুই ঘোর রে জোর
ঘর্ঘর্ ঘর ঘূর্ণাতে তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুর চাকাতে বল দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর॥
হিন্দু মুসলিম দুই সোদর
তাদের মিলন সূত্র তোররে
রচলি চক্রে তোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
আবার তোর মহিমায় বুঝল দু ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়।
ভারত বস্ত্রহীন যখন

কেঁদে ডাকল নারায়ণ !
তুমি লজ্জা হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,
দেশ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরতে পারল না দুঃশাসন চোর ॥
হয়ে অন্ন বস্ত্র হীন
আর ধর্মে কর্ম্মে ক্ষীণ
দেশ ডুবছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন আনলে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুললে স্বর্গ মুক্তি দোর ॥"

—কাজী নজরুল ইসলাম

কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের 'চরকার গানটি' কাটুনিরা, জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও কংগ্রেস কর্মীগণ গাইতেন ঃ—

"ভোমরায় গান গায়, চরকায় শোন ভাই !
খেই নাও—পাঁজ দাও আমরাও গান গাই !
ঘরবার করবার দরকার নেই আর
মন দাও চরকায় আপনার আপনার !
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর !
ঘর ঘর ক্ষীর সর আপনায় নির্ভর !
পড়শীর কণ্ঠে জাগলো সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া ॥...
আর নয় আইঢাই ঢিমঢিম দিনভর
শোন বিশ্বকর্মার বিস্ময় মন্তর ॥
চরকার চর্যায় সন্তোষ মন টায়।
চরকার ঘর্ঘর বস্তির ঘর ঘর।
ঘর ঘর মঙ্গল—আপনায় নির্ভর।
ঘর ঘর মঙ্গল—আপনায় নির্ভর !
বন্দর পত্তন গঞ্জে সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

চরকায় সম্পদ চরকায় অন্ন
বাংলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ

বাংলার মসলিন বোগদাদ রোমচীন
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন,
চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর ঘর
ঘর ঘর সম্পদ আপনায় নির্ভর
স্বপ্নের রাজ্যে দেবে সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া ॥
চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি
সূর্য্যের কাটনায় কাঞ্চন বৃষ্টি,
ইন্দ্রের চরকায়, মেঘ জল থম থম
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান
ঘর ঘর দৌলৎ ইজ্জৎ ঘর ঘর,
ঘর ঘর হিম্মত আপনায় নির্ভর
গুজরাটে পাঞ্জাবে জাগলো সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া ॥

জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে চরকা ও তকলীতে সূতাকাটা অবশ্য-শিক্ষণীয় বলে গণ্য হওয়ায়, জাতীয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ও শিক্ষকগণ সর্বত্র সূতা কাটার প্রত্যক্ষ প্রচার প্রদর্শনী স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। চরকা প্রস্তুত ও মেরামত কার্য্যের ও অনেক সুবিধাজনক ব্যবস্থা কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস কর্মীগণের পক্ষ থেকে করা হত। তুলা চাষের প্রবর্তন ও প্রসার যাতে হয় এ জন্যও কর্মীগণ যথেষ্ট যত্ন নিতেন। একটি বিশেষ অসুবিধা ছিল চরকার সূতা বুনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে। গ্রামের তাঁতগুলিতে দেশী ও বিলাতী মিলে প্রস্তুত সূতা বুনবার মত সাজসরঞ্জাম ছিল। তন্তুবায়গণও ঐ সূতা বুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ঐ মসৃণ মিলের সূতার পরিবর্তে সমতাহীন সরু মোটা সূতায় কাপড় বোনার কাজ বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীজীর ১৯২৫ সালের মেদিনীপুর ভ্রমণের প্রসঙ্গ ইতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত তাঁতগুলিতে গান্ধীজীর কাঁথি পদার্পণের পূর্ব পর্য্যন্ত মিলের সূতার

টানা ও চরকার সূতার পোড়েন দিয়ে কাপড় তৈয়ারী করা হত। গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখেন যে ঐরূপ মিশ্রিত সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রকে খদ্দর নামে অভিহিত করা যায় না—(Half Khaddar is no Khaddar)। কাঁথিতে গান্ধীজীর নিকট কর্মীগণ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁরা অতঃপর আর অর্দ্ধ-খদ্দর প্রস্তুত করবেন না। তাঁদের পূর্ণ খাদি প্রস্তুতের চেষ্টা প্রভূত সাফল্য লাভ করেছিল। জেলার খাদি কেন্দ্রগুলিতে টানা ও পোড়েন উভয় দিকেই চরকার সূতা ব্যবহার করে খদ্দর বোনা রেওয়াজ হয়ে উঠল।

বিহার প্রদেশ থেকে যে খদ্দর বঙ্গদেশে আমদানি হত সেগুলি এতো মোটা ও সরু-মোটা সূতার সংমিশ্রণে তৈরী হত যে সেগুলিকে চটের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে মনে হোত। এক মাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মিহি খদ্দর আসত কিন্তু তার দাম ছিল এত বেশি যে বিত্তবান ব্যক্তি ছাড়া সে খদ্দর কেনার সামর্থ্য অন্যের ছিল না কিন্তু মোটা খদ্দর হয়ে উঠেছিল আদরের বস্তু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মাঝ দিয়ে সেলাই করা মোটা খদ্দর পরে সভা সমিতিতে এবং অন্যান্য স্থানে জনসমাজের মধ্যে ভ্রমণ করে দেশের মধ্যে একটি নূতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কংগ্রেসী মহিলারা পর্য্যন্ত সেই খদ্দরের ভার বহন ক'রে দেশের মধ্যে একটি নূতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

খদ্দরের সমস্ত পয়সাই গরীবের ঘরে পৌঁছতো এই ছিল তাঁদের সান্ত্বনা। গ্রামের চাষী, ছুতোরমিস্ত্রী, তাঁতি, রজক, প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের স্বার্থ খদ্দরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দীপনা ও গান্ধীজীর প্রেরণা এই অবহেলিত সত্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিকে নূতন করে আকর্ষণ করেছিল। মেদিনীপুরে কৃষিজীবীদের কার্য্যক্ষেত্র বলে খদ্দরের পুনরুজ্জীবন অচিরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করল। অনভ্যাসের অসুবিধা অতিক্রম করতে কিছু সময় অবশ্যই লেগেছিল কিন্তু জেলার গ্রাম-কর্মীগণ, জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ, কংগ্রেস কর্মী ও

াদস্যগণ তাঁদের খদ্দরপ্রীতির স্পর্শে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জেলার বহুস্থানে খদ্দর উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য খাদি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ঐগুলিব মধ্যে নন্দীগ্রাম থানার কুলাপাড়া ও দুর্গাচক ভগবানপুর থানার জুখিয়া, বামনগরের কাত্থুয়া, সবং থানার বিষ্ণুপুর এবং পটাশপুর থানার অমর্শি কেন্দ্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুর সহরে যে তাঁতশালাটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি ও কিছুকাল ভালভাবেই পরিচালিত হয়েছিল। মহাত্মাগান্ধী ১৯০৯ সাল থেকেই তাঁব হিন্দ-স্বরাজ রচনাবলীব মধ্যে দিয়ে চরকাব বাণী প্রচারের চেষ্টা করেন। তা দৃঢরূপ ধারণ করে অসহযোগ কর্ম-ধারার মধ্যে। অনেক দেশবরেণ্য ব্যক্তি প্রথমে গান্ধীজীর চরকা ও খদ্দরকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেননি। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়েব মত দেশপূজ্য ব্যক্তিও চরকা ও খদ্দরকে অবহেলা এমনকি উপহাসের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কিন্তু পরে তাঁবই প্রেরণা ও অর্থানুকূল্যে সংগঠক প্রবর দেশমান্য সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ত্যাগব্রতী বরেণ্য পুরুষগণ অভয় আশ্রম সৃষ্টি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র অন্নদাবাবু ছিলেন মেদিনীপুরের অধিবাসী। তিনি শেষ জীবনে তাঁর স্বগ্রাম ঘাটাল মহকুমার অন্তবর্তী ক্ষীরপাইতে বিভিন্নমুখী গ্রামীন শিল্প স্থাপন ক'রে দেশমধ্যে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লিখিত দু'টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেদিনীপুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং এগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, গোষ্ঠবিহারী পাল প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত খাদি মণ্ডল' ও ফরিদপুরের কর্মীগণের প্রতিষ্ঠিত 'শিল্পাশ্রমে'রও কর্মের আদান-প্রদান ছিল। কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানার নেতৃ স্থানীয় কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ দাস বহুদিন 'শিল্পাশ্রমে'র একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

১৯২৩ সালে 'খাদি মণ্ডল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তাঁরা কাঁথিতে উৎপন্ন খদ্দরের অন্যতম ক্রেতা ছিলেন। সূতার মসৃণতা ও অন্যান্য গুণের জন্য ঐ খাদিকে পরে ছাপিয়ে বিক্রয় করা হত। ঐ প্রকার শাড়ী বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বর্ত্তমানে নন্দীগ্রাম থানার ঈশ্বরপুর কেন্দ্র খাদি মণ্ডলের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র রূপে পরিচালিত হচ্ছে। মেদিনীপুরের কর্ম্মীগণ অসহযোগ কর্ম্মসূচী অথবা গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত আঠার দফা গঠন কর্মের রূপায়ণে মনোযোগী হয়ে জেলাতে যে বিশিষ্ট খাদি কেন্দ্রগুলি স্থাপন করেছিলেন সেগুলি ক্রমে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে পৃথক থাকার নীতি অনুসরণ করলেও দেশের জনসাধারণের মনে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করার পক্ষে যে প্রভূত শক্তি দান করতো তাতে সন্দেহ নাই। কাঁথি সেবা সঙ্ঘ, আলোক কেন্দ্র (ডেবরা থানা), বলরামপুর অভয় আশ্রম, বেলদা শ্রমবিদ্যাপীঠ, সবং খাদি সমিতি, রামনগর থানার কাহুয়া খাদি কেন্দ্র, ভগবানপুর থানার জুখিয়া, কলাবেড়া প্রভৃতি খাদি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি এবং পটাশপুর থানার কাটরঙ্কা, অমর্শি প্রভৃতি খাদি কেন্দ্রগুলির সূচনা অসহযোগ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে ১৫/২০ বৎসরের মধ্যে ঘটেছে এবং কোন কোনটির অস্তিত্বেরও অবসান হয়েছে কিন্তু ঐগুলির কর্মোদ্যমের দ্বারা নূতন জাগৃতির সৃষ্টি হয়েছে ও গ্রামবাসীগণের সহিত স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে রত কর্ম্মীগণের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে—ইহা অনস্বীকার্য্য। খাদি কর্ম্মীগণ স্বাধীনতা-সাধক কর্ম্মীমণ্ডলীর মধ্যে সম্মানের আসন গ্রহণের অধিকারী। মেদিনীপুর জেলাতে বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টাতে খাদি কর্ম্মীগণ সকল সময়েই উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন।

সালিশ বিচার

কংগ্রেসের আদালত বর্জন ও সালিশ কার্য্যধারা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল। ইংরেজের আদালতে না গিয়ে কংগ্রেস পরিচালিত সালিশ আদালতে গিয়ে নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। জেলার প্রতি থানাতে

একাধিক সালিশ আদালত গঠিত হয়েছিল। স্থানীয় গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগকে নিয়ে সালিশ আদালতগুলির এক একটি কার্য্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে বিবদমান পক্ষগুলি একটি নির্দিষ্ট ফী জমা দিয়ে তাদের বিবাদের বিবরণ বিবৃত করে দরখাস্ত দিলে সালিশ আদালতে হাজির হওয়ার জন্য একটি দিন তাদের জানান হত। স্থানীয় অভিজ্ঞ সালিশ বিচারকগণের তালিকা হতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাদের পছন্দমত ব্যক্তিদের উপর সালিশের ভার দেওয়া হত। পক্ষগণের সুবিধা ও অভিমত বিবেচনা ক'রে একটি নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সালিশ আদালত থেকে তাঁদের উপর নোটিশ দেওয়া হত। বিবাদ ও বিসম্বাদ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সালিশ আদালতে অতি সুন্দরভাবে বিচার হয়ে যেত। বিচারকগণ স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সুতরাং আপোষ মনোভাব সৃষ্টি করা তাঁদের পক্ষে খুবই সহজ হত। শালিস আদালতে বিচার পেতে বিফল হয়ে বা সুবিচার না পেয়ে সরকারী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এরূপ মামলার সংখ্যা অতীব বিরল ছিল। কংগ্রেস কর্মীগণ সর্বদাই লক্ষ্য রাখতেন কোন বিবাদ যেন সরকারী আদালতে না যায়, সালিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী আদালতে গিয়ে বিচারাধীন মোকদ্দমাগুলির খবর নিতেন এবং পক্ষগণকে বুঝিয়ে সালিশ মীমাংসার দ্বারা মামলা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিতেন। এই কার্যে কাঁথির জনপ্রিয় কর্মী কাঙ্গালচাঁদ গিরির নিরলস চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

আদালত বয়কট বিশেষভাবে সফল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। সালিশ কার্য্য পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কংগ্রেস কমিটিগুলির দ্বারা গঠিত সালিশ আদালতের বিচারকরূপে কাজ করতে একান্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন, যাতে একটি মামলাও সরকারী আদালতের শরণাপন্ন না হয় এজন্য কংগ্রেস কর্মিগণ প্রভুত পরিশ্রম করতেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাঁরা পক্ষগণের উপর তাঁদের নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সালিশের সংখ্যাও কম ছিলনা।

আন্দোলনের সময় এমন একটি প্রীতি ও সদ্ভাবের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল যে লোকে সাধারণতঃ কংগ্রেসের নিকট তাঁদের পারিবারিক ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ থাকতেন।

সদর মহকুমাতে কেশপুর থানার কালিপদ রায়, কেদার চন্দ্র রায়, মৃগাঙ্ক কুমার রায়, পাঁচকড়ি চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি চৌধুরী, ডেবরার কৃষ্ণ বিহারী রায়, বিপিন বিহারী দে, সবংএর সতীশচন্দ্র দাসঅধিকারী প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীগণ সালিশের কার্য্যে প্রভূত সময় ব্যয় করতেন।

কিশোরীপতি রায়, চারুচন্দ্র মহান্তি, অতুল চন্দ্র বসু প্রভৃতি আইনজ্ঞ সালিশ বিচারকগণ বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করে কংগ্রেসের প্রতি লোকের বিশ্বাস ও অনুরাগ অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে সালিশের ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেস কর্মীগণের নিরপেক্ষতা ও জনপ্রিয়তাই বিবদমান পক্ষগুলির অন্তরে সহজেই শান্তির অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'ত।

তমলুকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীনাথ চন্দ্র দাস ও প্রভাবশালী কংগ্রেসকর্মী বিপ্রচরণ মাইতি সালিশ বিচারকরূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তমলুক থানার বিশিষ্ট সালিশ বিচারকগণ ছিলেন—ভোলানাথ মহাপাত্র (যশোবন্তপুর), মহেন্দ্রনাথ আদক (পাইকপাড়ি), অবিনাশ চন্দ্র কর (সোনাপতিয়া), দেদার বক্‌স্ (জগন্নাথপুর) প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

কাঁথি মহকুমাতে কাঁথি থানার ঈশ্বরচন্দ্র মাল, শ্রীনাথ চন্দ্র জানা, তারকনাথ পাল, গিরিশ চন্দ্র রাণা প্রভৃতি জমি জমা সংক্রান্ত বহু জটিল মামলার মীমাংসক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই মহকুমার অন্যান্য থানাতে বয়স্ক কংগ্রেস কর্মীগণকে মামলা মোকদ্দমার মীমাংসার কাজে প্রভূত সময় ব্যয় করতে হ'ত।

অন্যান্য মহকুমাতেও সালিশ মীমাংসা কংগ্রেসের প্রাত্যহিক কর্ম্মসূচীর অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। অসহযোগ কর্মধারার এই প্রভাবশালী অস্ত্রটি আইন আদালতকে কিছুকালের জন্য একান্ত ক্ষমতাশূন্য করে তুলেছিল। কংগ্রেস মীমাংসকগণ তাঁদের নিরপেক্ষতা, প্রভাব

বিস্তারে শক্তি, বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ, বিশ্বাস সৃষ্টির যোগ্যতা ও কৌশল প্রভৃতি গুণে সুদক্ষ সালিশান রূপে পরিচিত ও সম্মানিত হতেন। যে সব কার্য্যক্রমের জন্য কংগ্রেসের আহ্বান সাধারণের নিকট এতদূর সম্মান লাভ করেছিল—সালিশ বিচার তার অন্যতম। কয়েক স্থানের সালিশ বিচারকদের নাম উল্লেখ করা হল। কংগ্রেসী সালিশ আদালতের কার্য্য পদ্ধতিও দেওয়া হল। এগুলি সবই উদাহরণ মূলক। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ও অন্য কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে গ্রামবাসীগণের যোগাযোগ এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে তাঁরা সর্বদাই স্থানীয় সকল পরিবারের সুখদুঃখের খবর রাখতেন। এজন্য গ্রামবাসীগণ নিয়মমাফিক দরখাস্ত সহ সালিশ আদালতের নিকট উপস্থিত না হয়েও তাঁদের নিকটবর্তী বিশ্বাসযোগ্য কংগ্রেস কর্মীগণকে তাঁদের বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাতেন এবং মীমাংসার দিনও স্থির করে নিতেন। কোন কোন সময় স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য পর্যান্ত এই সব বিচারের অঙ্গীভূত হতে দিতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের এইরূপ হৃদ্যতা ও বিশ্বাস পূর্ণ যোগই স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মূল্যবান উপাদানে পরিণত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রবাহে সমাজের বহু কালিমা বিধৌত হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের হৃদয় ও মনকে এক বিশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বিবাদ-বিসংবাদের উর্দ্ধে ওঠার জন্য মানুষের মনে এমন একটি আকুতি সৃষ্টি হ'য়েছিল যে কল্যাণকর সর্বপ্রকার কার্য্যই সহজে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারতো।

মেদিনীপুরের জনগণ অসহযোগ কর্মপন্থার মধ্যে তাঁদের সংগ্রামী মনের উপযোগী চিন্তা ও কর্মের খোরাক খুঁজে পেত এবং সেই সঙ্গে তাঁদের সহজ সরল কৃষিনির্ভর জীবন যাত্রার পথ ও দেখতে পেত।

জেলা ও অন্যান্য কংগ্রেস কমিটি গঠন

নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হওয়ার অল্প

সময়ের মধ্যে সদর মহকুমা এবং কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেস কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল। ১৯২২ সালে ঝাড়গ্রাম মহকুমা গঠনের পর ঝাড়গ্রাম মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। জেলার অধীন ৩৫টি থানার অধিকাংশ থানাতে ও থানা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হতে অধিক সময় লাগল না। বেজওয়াদাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে কর্মধারা প্রতিপালনের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, কংগ্রেস কর্ম্মীগণ অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়ে সেই কর্মধাবা পূরণের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রমে রত হলেন। নেতা বীরেন্দ্রনাথ জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে জনসভাদিতে কংগ্রেসের কার্যধারার পরিচয় দিয়ে জনসাধারণকে কংগ্রেসের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে তিনি লিখেছেন—"প্রথমে তমলুক মহকুমাব তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়না, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা পরিভ্রমণ করি, তৎপরে কাঁথি মহকুমার রামনগর থানা থেকে আবম্ভ করে ক্রমে ক্রমে কাঁথি, বাহিরি, খেজুরী, হেঁড়িয়া, ভগবানপুর, পটাশপুর, এগরা ও বাসুদেবপুর থানা শেষ কবেছিলাম। মধ্যে মধ্যে কয়েকবার মেদিনীপুর সদরে, একবার ঘাটাল মহকুমায় এবং একবার গড়বেতা চৌকীতে যেতে হয়েছিল।" তিনি কাঁথি মহকুমার কয়েকটি থানায় একাদিক্রমে প্রায় দুমাস ধরে নানাভাবে পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁকে একদিন অন্তর গড়ে প্রায় ৮ মাইল করে হাঁটতে হতো এবং মধ্যে মধ্যে যে এক একদিন হাঁটতে হত না সেই সেই দিনে দু' ঘণ্টা থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর্যান্ত বক্তৃতা দিতে হত। মেদিনীপুরের অন্যতম নেতা সাতকড়ি পতি রায় ঘাটাল মহকুমাতে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ ক'রে কংগ্রেসেব বার্ত্তা প্রচার করেন. সদর মহকুমার কতকগুলি জায়গাও তাঁর ভ্রমণ সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেক মহকুমার নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণ নিয়মিতভাবে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে সভা, আলোচনা, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে কংগ্রেসের বার্তা প্রচারে প্রভূত পরিশ্রম করতেন। সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজলাভ (Attainment of

Swaraj by all peaceful and legitimate means) কংগ্রেসের এই মূল উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে নিয়ে ২১ বৎসর বয়স্ক যে কোন পুরুষ ও স্ত্রী কংগ্রেসের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হতে পারতেন। এইভাবে সদস্য সংগ্রহ ক'রে সমগ্র জেলাতে সর্বস্তরের কংগ্রেস কমিটি গঠন জেলার মহকুমার ও থানার কংগ্রেস নেতাগণের এবং কংগ্রেস কর্মীগণের অন্যতম প্রধান কার্য্য হয়ে উঠল। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি প্রথমে যেভাবে গঠিত হয়েছিল তার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে এইভাবে জেলার প্রত্যেক মহকুমাতে মহকুমা থানা ইত্যাদি স্তরে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হতে থাকল। কয়েকটি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির গঠন ১৯২১ সালে নিম্নরূপ ছিল। জেলার প্রধান সহর মেদিনীপুর সদর মহকুমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকায় মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটিই মহকুমার কংগ্রেস কার্য্য পরিচালনা করত। পরে একটি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়।

ঘাটাল মহকুমা	সভাপতি	মোহিনীমোহন দাস
	সম্পাদক	যতীশচন্দ্র ঘোষ
তমলুক „	সভাপতি	মহেন্দ্রনাথ মাইতি
	সম্পাদক	চণ্ডীচরণ দত্ত
কাঁথি „	সভাপতি	বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
	সম্পাদক	সতীশচন্দ্র জানা

ঝাড়গ্রাম মহকুমা ঃ এই কমিটি কিছু পরে গঠিত হয়েছিল কারণ ঝাড়গ্রাম মহকুমার সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২২ সালে।

জেলা কংগ্রেস কমিটি ব্যতীত অন্যান্য স্তরের কংগ্রেস কমিটিগুলির গঠন প্রণালী মধ্যে মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল কিন্তু মেদিনীপুরের কর্ম্মীগণের ইচ্ছা ক্রমে মেদিনীপুর জেলাতে মহকুমা ও থানা কংগ্রেস কমিটিগুলির অস্তিত্ব বরাবরই বজায় রাখা হয়েছিল। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রী-করণের ফলে জেলার বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস কমিটিগুলি অধিকতর শক্তিশালী, জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ সাধনে সক্ষম এবং

কংগ্রেসের কর্মসূচীকে রূপায়ণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'য়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে জেলার, মহকুমার বা স্থানীয় কর্ম্মীগণের চেষ্টা ও অনুমোদনে যে কংগ্রেস কমিটিগুলি গঠিত হত সেগুলিকে সক্রিয় ক'রে তোলা কংগ্রেস সংগঠনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

কংগ্রেস কমিটিগুলির একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। জেলা, মহকুমা, থানা বা অন্য স্তরের কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে অবশ্যই গঠিত হত এবং প্রত্যেক কমিটির কয়েকজন পদাধিকারীও নির্বাচন করা হ'ত; কিন্তু এই কমিটিগুলির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতেন বেশ কিছু সংখ্যক সমসাময়িক কমিটি। তাঁরা কোন পদে অধিষ্ঠিত না থাকলেও কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচী সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন, কংগ্রেস কমিটির পদাধিকারীগণও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁদের মতামত বিবেচনা করতেন এবং এইরূপ কর্ম্মীগণ আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। পদের স্পৃহা ও ক্ষমতার লোভ প্রবল আকার ধারণ করে দলাদলির যে বিষয়টা সৃষ্টি করে তা জেলার বাতাবরণকে কখনও কলুষিত করে তোলেনি এটি কংগ্রেস সেবকদের ও জনসাধারণের একটি সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। ১৯২২ সালে স্বরাজ্য দল গঠনের সময় পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তন বিরোধীদের কলহের ফলে প্রতি জেলাতে নানা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু মেদিনীপুরে ১৯২৩ সালের জেলা বোর্ড নির্বাচন বা ১৯২৩ ও ১৯২৬ সালের আইন সভার নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেলার কর্ম্মীগণ কংগ্রেস সংস্থাকেই দৃঢ় ও শক্তিশালী রাখার জন্য এবং জনগণের সর্ব প্রকার হিত কর্মের উৎস স্বরূপ ঐগুলির অস্তিত্ব রাখার জন্য সর্বদাই যত্নবান থাকতেন। আইন অমান্য কর্মধারার অনুসরণে কর্ম্মীদের একপ্রাণ তাই সরকারী দমন নীতির নিষ্পেষণের সম্মুখে লৌহ কঠিনবৎ দণ্ডায়মান থাকার এবং জনগণকে পথ দেখাবার শক্তি জুগিয়েছিল।

মেদিনীপুরের জনসাধারণ নরনারীর অন্তরের সঙ্গে অসহযোগের

সময় থেকে কংগ্রেসের এমন নিবিড় যোগ সাধিত হয়েছিল যে পল্লী-বাসীগণ সুখে দুঃখে সর্বদাই কংগ্রেসকে স্মরণ করতেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপে কংগ্রেস অফিসে নিমন্ত্রণ প্রেরণ মৌখিকভাবে হউক বা পত্র দ্বারা হউক একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য ছিল। কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে নিমন্ত্রণকারীর আত্মীয় স্বজন থাকলে তাঁদের নিমন্ত্রণ পৃথকভাবে হোত কিন্তু সংস্থা হিসাবে কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ একটি অবশ্যকরণীয় কার্য্যরূপে প্রতিপালিত হোত। কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের সঙ্গে এরূপ নিবিড় প্রীতির বন্ধনের ফলেই মেদিনীপুর জেলাতে কংগ্রেসের আহ্বানে জনসাধারণ এত গভীরভাবে সাড়া দিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে সর্বশ্রেণীর নরনারীর এই সচেতনতার ও সক্রিয় কর্মোদ্যমের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশপ্রাণ শাসমল অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন এবং জনসভাতে ভাষণ দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে আহূত একটি জনসভায় কী অভূতপূর্ব্ব সাড়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত জনসভার বিবরণ থেকে।

কাঁথি সরস্বতী তলায় একটি জনসভা হয়। তাতে বিশেষভাবে মহিলাদের আমন্ত্রণ জানান হয়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন সভাপতি এবং প্রধান বক্তা ছিলেন বরিশালের শরচ্চন্দ্র ঘোষ (স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ) ও ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়। শরৎবাবু ও প্রতাপবাবু স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য দেশবাসী নরনারীর প্রতি যে ত্যাগের আহ্বান এসেছে তা প্রাণস্পর্শী এবং উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বর্ণনা করেন এবং দেশের নারীসমাজ অগ্রসর হয়ে না এলে এই ব্রত পূর্ণ হতে পারে না এই বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন। সম্পন্ন মহিলাগণ তাঁদের মূল্যবান অলঙ্কার দান ক'রে দেশ মায়ের শৃঙ্খল মোচনে সাহায্য করতে পারেন—এই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা অনেকে তিলক

স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য তাঁদের অলঙ্কার দিতে লাগলেন। শৈলবালা দীণ্ডা—৩৫ গিনি, পরমেশ্বরী লালা সোনার হার, মোক্ষদায়িণী (উকীল হরিদাস বাবুর কন্যা) সোনার চুড়ি দু'গাছি, ভবানী (ক্ষেত্রমোহন বেরার কন্যা) সোনার আংটী, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সোনার কাঁটা, প্রভাবতী বক্সী সোনার হার, শশী ভূষণ দাসের পুত্রবধ সোনার আংটী ইত্যাদি দান করেছিলেন।

কাঁথি মহকুমায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে ২৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষও ছিলেন।

মেদিনীপুরে মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমন

১৯২১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধীর শুভ পদার্পণ হয় মেদিনীপুর সহরে। কংগ্রেস নির্দিষ্ট কর্মধারা অনুসারে 'তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে' এক কোটী টাকা সংগ্রহের নির্দেশ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের তিরোধান ঘটেছিল ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের উদ্যোগে 'তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার' স্থাপন করা হয় এবং মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশ নেতাগণ এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাতে অর্থ সংগ্রহ কার্য্যের ভার নেন। তাঁরই চেষ্টায় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরে গান্ধীজীর শুভাগমন ঘটে।

২০শে সেপ্টেম্বর (১৯২১ খৃঃ অঃ) অপরাহ্নে প্রায় ২টার সময় মহাত্মাজী ট্রেন যোগে মেদিনীপুর ষ্টেশনে পৌছেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী উর্মিলা দেবী, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই প্রভৃতি। তাঁরা রেল ষ্টেশনে পৌছবার বহু পূর্ব থেকে কাতারে কাতারে লোক জমা হতে থাকে এবং এক বৃহৎ জনতার সমাবেশ হয়। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতা-গণের জয়ধ্বনির মধ্যে জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও কংগ্রেস

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাঁদের অভ্যর্থনা জানান ও মাল্য ভূষিত করেন। ষ্টেশনে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কিশোরীপতি রায়, অতুল চন্দ্র বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম সুন্দর সিংহ ও শৈলজানন্দ সেন প্রমুখ নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারপর একটি বিরাট শোভাযাত্রা মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে অতিথিবর্গকে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে জেলা কংগ্রেস কার্য্যলয়—মেদিনীপুরের অন্যতম কৃতী সন্তান কিশোরীপতি রায় মহাশয়ের বাস ভবন পর্য্যন্ত নিয়ে আসে। সেখানে পুরমহিলাগণ শঙ্খধ্বনি সহকারে গান্ধীজীকে ও অতিথিবর্গকে স্বাগত জানান এবং মহাত্মাজীকে বিশেষ অভ্যর্থনা করা হয়।

অপরাহ্ন প্রায় চারটের সময় কলেজ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে জনসভার অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেদিনীপুরের অন্যতম সুধীসন্তান সূর্য্য কুমার অগস্তি মহাশয়। জনসভার সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। বিপুল জনসমাগমে সমগ্র প্রাঙ্গণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাত্মাজীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "যাঁর নামে একদিন এক নূতন অব্দ প্রচলিত হবে সেই মহাপুরুষকে স্বাগত জানাবার সুযোগ লাভ ক'রে আমার জীবন ধন্য হল। তাঁর চরণরেণু স্পর্শে মেদিনীপুরের মাটি পবিত্র হল।"

জনসাধারণের পক্ষ থেকে সভাপতি মহাশয় মহাত্মাজীকে একখানা রৌপ্য থালিতে মানপত্র প্রদান করেন। শৈলজানন্দ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে দু'জন আদিবাসী মঞ্চে আরোহণ ক'রে মহাত্মাজীকে তাঁদের নিজেদের হাতেকাটা সুতার দ্বারা নিজেদের হাতে বোনা একখানি খদ্দরের কাপড় উপহার দেন। গান্ধীজী তাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানান। রৌপ্য-থালিটি সভাস্থলে নীলাম করা হয় এবং প্রাপ্য অর্থ তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হয়। গান্ধীজী তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে ভাণ্ডারের জন্য অর্থের আবেদন জানান। সমবেত জনমণ্ডলী যথাসাধ্য অর্থ দান ক'রে কৃতার্থ বোধ করেন। রাম চরণ দাস নামক সহরের একজন ঘোড়ার গাড়ী চালক তাঁর সমস্ত দিনের পারিশ্রমিক সহ ১০১

টাকা 'তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে' দান করেন। একটি বালক একটি 'কড়ি' দান করে। উহা একটি মহামূল্য দান হিসাবে গৃহীত হয় ও এটিকে নিলামে দেওয়া হয়। উহা বিক্রীত হয় ৫০০ মণ ধানের মূল্যে। গান্ধীজী প্রাণ স্পর্শী ভাষায় বিলাতী বস্ত্র বর্জনের আবেদন জানিয়ে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন করেন। জনসাধারণের মধ্যে এক অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। গান্ধীজীর ভাষণটি অধ্যাপক জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় অনুবাদ ক'রে বুঝিয়ে দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জনমণ্ডলীকে স্বরাজ্যের জন্য কাজ করার আহবান জানান। সভার শেষে অতিথি-গণ কিশোরীবাবুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেখানে কর্মীগণের একটি আলোচনা সভাতে গান্ধীজী ভাষণ দেন।

পরদিন সকালে মেদিনীপুর কলেজ প্রাঙ্গণে মহিলা সভার অধিবেশন হয়। উহাতে বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, ছায়ালতা দেবী প্রমুখ মহিলা নেত্রীগণ যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী বিদেশী বর্জন ও চরকায় সূতা কাটার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান। তাঁর আহ্বানে বহু মহিলা তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য নিজ নিজ অলঙ্কার দান করেন। জেলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা অতুল চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্মিণী সরযূ শোভনা বসু তাঁহার পরিহিত হার, বালা প্রভৃতি যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার সভাস্থলে একে একে দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবীর প্রসারিত বস্ত্রখণ্ডের উপর দিয়ে দেন। দেশবন্ধুর নিষেধে তাঁর শেষ অলঙ্কার সোণায় বাঁধান লৌহ বলয়টি মাত্র তাঁর হাতে থেকে যায়।

মহাত্মা গান্ধীকে নিজ নিজ বাস ভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েক-জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি সর্ত দেন যে যিনি 'তিলক স্বরাজ্য' ভাণ্ডারে অন্ততঃ১০১ টাকা দান করবেন তাঁর বাড়ীতে তিনি যেতে প্রস্তুত আছেন। কয়েকজন ঐ পরিমাণ অর্থ দান ক'রে মহাত্মাজীকে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এঁদের

মধ্যে ছিলেন মেদিনীপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত জমিদার যামিনী নাথ মল্লিক মহাশয়।

মহাত্মাজীর পদস্পর্শে মেদিনীপুরের কঙ্করময় মাটি স্বর্ণ ধূলি বলে গণ্য হল।

যুবরাজের (পঞ্চম জর্জের) ভারত আগমন বর্জন

বৃটিশ সরকার স্থির করেছিলেন যে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত পরিদর্শন করবেন। অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য কারণে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের ঘোষিত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। স্থির হয় ১৭ই নভেম্বর (১৯২১) যুবরাজ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করবেন। কংগ্রেস হ'তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে যুবরাজের ভারত পরিদর্শন বয়কট করতে হবে, তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত অসম্মান দেখান উদ্দেশ্য না হলেও অসহযোগ কার্য্যধারা অনুসরণ করা কালে ভারতবাসীর পক্ষে কখনও ব্রিটিশ সরকারের প্রতীক যুবরাজকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন সম্ভবপর নয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কলিকাতা সহরে ঐ তারিখে এক অভূতপূর্ব হরতাল প্রতিপালিত হয়। মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলার সহরগুলি এই হরতালে পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করে। মফঃস্বলের হাটবাজার, স্কুল কলেজ ও অন্যান্য কাজকর্ম প্রায়ই অচল হয়ে যায়। এইরূপ সর্বাত্মক হরতাল ক্বচিৎ দেখা যায়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তরে তীব্র ইংরাজ বিমুখতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সর্বব্যাপী হরতালে ছিল সেই গভীর অনুভূতির প্রকাশ।

২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজের কলিকাতা পদার্পণের দিন যেন এইরূপ জনশূন্য সহর ও গ্রামাঞ্চলের নীরবতার দৃশ্য পুনরায় অভিনীত না হয় এজন্যে ভারত সরকার সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু কোমল ও কঠোর মনোভাব, আলাপ আলোচনা ও দমননীতি সবই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। ভারতের দাবী পূরণ না হলে ভারতের জনগণ তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনায় বিরত হবে না এই দৃঢ়

সঙ্কল্প সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশমান হল—যুবরাজের ভারত পরিদর্শন বর্জনের দ্বারা।

সরকারী মহল এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক সংবাদপত্রগুলি ক্ষোভে ও রোষে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্ম সরকারকে উত্তেজিত করতে থাকেন। ১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে কলিকাতাতে প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিস ক্ষরবেস্ ম্যানসন (১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার) ও খেলাফৎ অফিস খানাতল্লাসী হয়। গুজব রটতে থাকে যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, প্রচার বোর্ডের সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু এবং খিলাফৎ কমিটির সম্পাদক মুজিবর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে অচিরে গ্রেপ্তার করা হবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং খিলাফৎ কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনী ঘোষিত হল। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তিন মাসের জন্য সমস্ত জনসভা, শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসল ২২শে ও ২৩শে নভেম্বর। ঐ অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে বঙ্গের আইন অমান্য পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে ২রা ডিসেম্বর থেকে পাঁচ জনের এক একটি দল কর্মী কলিকাতার রাজপথে বেরিয়ে খদ্দর ফেরী করবেন এবং যুবরাজের কলিকাতায় আসার দিন (২৪শে ডিসেম্বর) হরতাল পালনের ঘোষণাও করবেন।

১লা ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একটি আবেদন প্রচার করলেন —তাতে তিনি নিজেকে একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বলে ঘোষণা করলেন এবং বাংলাদেশে যেন লক্ষাধিক লোক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হন এজন্য আবেদন জানালেন।

মেদিনীপুর জেলাতে দেশবন্ধুর আবেদন বিপুল সাড়া জাগায়। প্রতি মহকুমা থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগদানকারী কর্মীগণের তালিকা আসতে থাকে। জেলা কংগ্রেস সম্পাদক কিশোরীপতি রায় মহাশয় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রায় ৩৭০০ স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা পাঠিয়ে দেন।

কলিকাতাতে আইন অমান্য আরম্ভ হয়ে যায়। পাঁচ জন ক'রে পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবক দল প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য্যালয় থেকে খদ্দর ফেরী ও হরতাল ঘোষণার জন্য কলিকাতার রাস্তায় বের হল ৩রা ডিসেম্বর। ৪ঠা ডিসেম্বর বের হল ১০টি দল কিন্তু এই দু'দিন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ৫ই ডিসেম্বর পাঁচ জনের একটি দলকে গ্রেপ্তার করা হল। দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন স্বেচ্ছাসেবক রূপে বাহির হওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অচিরে দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এই সম্ভাবনার জন্য দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তিগণ চিত্তরঞ্জনকে কারাবরণে বিরত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে চাওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। দেশবন্ধু পুত্রের সঙ্কল্পে আনন্দ বিহ্বল চিত্তে বললেন—'পরের ছেলেকে জেলে পাঠাবার পূর্বে আমার নিজের ছেলেকে জেলে পাঠান উচিত'। ঐদিন চিররঞ্জনসহ ২১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হলেন। ৭ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবী এবং অন্যতমা নারী কর্মী সুনীতি দেবী ২৪শে ডিসেম্বরের জন্য হরতাল ঘোষণা ও খাদি বিক্রয় ব্যপদেশে বাহির হওয়াতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল। সে সময় মহিলাগণের আইনভঙ্গ ও কারাবরণ অজানা ব্যাপার ছিল। এই অভূতপূর্ব ঘটনাতে সমগ্র কলিকাতা নগরী আবেগে বিচলিত হয়ে উঠল। মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জ্জীর দৌত্যের ফলে রাত্রি ১২ টার সময় এঁদের মুক্ত করে দেওয়া হলে দেশবন্ধু অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করলেন। এঁরা পরদিন পুনরায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে পথে গিয়ে হরতাল প্রচারে রত হলে এঁদের আর গ্রেপ্তার করা হল না। স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীর কাজ যাতে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে তার ব্যবস্থা করা হল। এখন থেকে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক দিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠি ও বেটনের আঘাতে তাঁদের রক্তাক্ত কলেবর ক'রে তুলতে লাগল। ক্রমে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। মফঃস্বল জেলাগুলি থেকে স্বেচ্ছাসেবক কলিকাতাতে এসে আইন অমান্য কার্য্যে যোগ দিতে লাগল।

মেদিনীপুরে কর্মীগণের কারাবরণ

মেদিনীপুর জেলার এক একদল কর্মী পর পর এইভাবে আইন অমান্য ক'রে কারা বরণ করেন। এঁরাই ছিলেন মেদিনীপুরের প্রথম আইন অমান্যকারী। এঁদেরকে গ্রেপ্তার করে যতশীঘ্র সম্ভব ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারের জন্য হাজির করা হত। প্রথম প্রথম ৬ মাস ক'রে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু খিদিরপুরে ডকের কয়লার গুদামে যে অস্থায়ী জেল খোলা হয়েছিল তা'ও ভর্তি হয়ে যেতে আবার দণ্ডের কাল যথেষ্ট কমাতে হল এবং পরে তা ১৫ দিনে এসে দাঁড়ায় এবং ক্রমেই প্রহার করে ছেড়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়।

অন্য জেলার ন্যায় মেদিনীপুর জেলা থেকেও স্বেচ্ছাসেবক দল হরতাল প্রচারের জন্য কলিকাতাতে আসতে থাকে। কাঁথি মহকুমা থেকে পুলিন বিহারী পালের নেতৃত্বে ১০ জনের যে স্বেচ্ছাসেবক দলটি আইন অমান্যের জন্য এসেছিল তাঁরা গুরুতর রূপে প্রহৃত হন—তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

৮ই ডিসেম্বর বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাক্ষাৎ হলো। চিত্তরঞ্জন খদ্দরের ধুতি, জামা টুপি ও চাদরে ভূষিত হয়ে লাট সমীপে উপস্থিত হলেন। কথাবার্তা হল প্রায় এক ঘণ্টা। যুবরাজের কলিকাতা পরিদর্শনের দিন (২৪শে ডিসেম্বর) যাতে হরতাল না হয় এজন্য গভর্নর চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ করেছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আদেশ লঙ্ঘন করা সম্ভবপর নয় একথা চিত্তরঞ্জন তাঁকে জানিয়ে দেন। শান্তি রক্ষার প্রশ্ন উঠলে তিনি গভর্ণরকে বলেন—আমাদের খদ্দর পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকগণ কতস্থানে প্রহৃত হয়েছে, তাদের ব্যাজ অপহৃত হয়েছে, অর্থ সংগ্রহকারী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে রিপোর্ট হচ্ছে। এই আন্দোলনকেই সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়, এই সব ভাবে আপনাদের পক্ষ হতেই যে আইন অমান্য হচ্ছে—এ সকল বিষয়ে আপনার কাছে খবর এসেছে কি? গভর্নর বলেন—না, এই সব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করার জন্য গভর্নর আন্তরিক

দুঃখ প্রকাশ করেন—যদিও তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তাঁদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে।

মেদিনীপুর জেলাতে এই সময় যে ব্যাপক সাড়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা দমন ক'রে কর্মীদের মনোবল ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মহকুমার প্রধান কর্মীদিগকে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে।

জেলার অন্যতম নেতা জেলা কংগ্রেস সম্পাদক কিশোরীপতি রায় মহাশয়কে ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লী রওনা হয়েছিলেন। তাঁর পথ রোধ করে পুলিশ তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে আনে এবং তাঁর বাড়ীতে অবস্থিত জেলা কংগ্রেস অফিসে তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর দেড় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়—এই সঙ্গে যে পাঁচ শত টাকা জরিমানার আদেশ হয়েছিল তা অনাদায়ে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁর কারাবাসের কথা, তাঁর কর্মশক্তি ও চরিত্র মাধুর্য্যের কথা দেশপ্রাণ শাসমল তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করেছেন। (স্রোতের তৃণ পৃঃ ১৩২-১৩৪)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রাণ শাসমল প্রভৃতির গ্রেপ্তার

১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ওইদিন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আবদুল রৌফ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, পদ্মরাজ জৈন প্রমুখ নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে আটক করা হল। এই সব কারাবরণ ছিল গৌরব, আত্মপ্রসাদ ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের অপসরণে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক পদে বৃত হলেন মেদিনীপুরের অন্যতম নেতা সাতকড়িপতি রায়। জেলার মধ্যে তখন ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। জেলা কংগ্রেস সম্পাদক কিশোরীপতি রায় মহাশয়ের কারাদণ্ডের কয়েক মাসের মধ্যে জেলার বিভিন্ন মহকুমার মুখ্য কর্মীগণ বিভিন্ন মেয়াদের

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সদর মহকুমার রাম সুন্দর সিং, শৈলজানন্দ সেন, নারায়ণ দাস সরকার, প্রভাকর চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র দাস অধিকারী, দাঁতনের আইন ব্যবসায়ী চারুচন্দ্র মহান্তি প্রভৃতি (কাঁথি পটাশপুর) কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। লক্ষ্মী শাসমলকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সাতকড়ি বাবুর প্রতি দেশবন্ধুর নির্দ্দেশ ছিল, সাতকড়ি বাবু যেন কোনক্রমে কারাবরণ না করেন, তিনি সেই নির্দ্দেশই অনুসরণ ক'রে চলতেন কিন্তু ২৪শে ডিসেম্বরের হরতালের দিন কলিকাতার কাজকর্ম পরিদর্শনের সময় তিনি হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁকে কয়েকদিন লালবাজারে ও জেল হাজতে আটক রেখে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

তমলুক মহকুমার শ্রীপতি চরণ বয়াল, গুণধর হাজরা (কাঁকুড়দহ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সতীশচন্দ্র সামন্ত, গৌরাঙ্গ চন্দ্র গিরি অবিনাশচন্দ্র দাস, মনু দাস, রমেন চন্দ্র কর, পরেশচন্দ্র দেব পট্টনায়ক প্রভৃতি, তমলুকের অন্যতম নেতা কুমার চন্দ্র জানা ১৯২১ সালের শেষ ভাগে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর শাস্তি হয় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা।

কাঁথি মহকুমার সতীশ চন্দ্র জানা (১ বৎসর কারাদণ্ড), প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র মাইতি, (১ বৎসর কারাদণ্ড), নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, পরেশনাথ মাইতি, শশীভূষণ পাল, শশিশেখর মণ্ডল, রজনী কান্ত চন্দ্র ও সজনি কান্ত চন্দ্র (গ্রেপ্তার), হন। ঘাটাল মহকুমার যতীশ চন্দ্র ঘোষ, রামচরণ দাস, অলৌকিক চন্দ্র মাইতি প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

নেতৃবৃন্দের বিচার ও কারাবাস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রাণ শাসমল, মৌলানা আবদুল রৌফ ও পণ্ডিত অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী প্রভৃতি নেতৃবর্গকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছিল

১৯০৮ সালের 'ক্রীমিন্যাল ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের' ১৭ (১) ও ১৭ (২) ধারার অপরাধের জন্য। এঁদের বিচারাধীন আসামী হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতে হল প্রায় দু'মাস। দেশপ্রাণ শাসমলের বিচারের শুনানি আরম্ভ হওয়ার দিন স্থির হয়েছিল ৯ই জানুয়ারী (১৯২২)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ২৭শে নভেম্বর তারিখে গৃহীত চারিটি প্রস্তাব তিনি ছাপাবার জন্য সংবাদপত্রে পাঠিয়েছিলেন এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। এই প্রস্তাবগুলির একটিতে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আহ্বান ছিল। বলাবাহুল্য দেশপ্রাণ শাসমল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে পাঠিয়েছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকাতে প্রেরিত বিজ্ঞাপনটিতে হাতের লেখা অংশে ছিল দু'টি দস্তখত ও প্রায় দেড়ছত্র হস্তাক্ষর। সেই অংশটি যে দেশপ্রাণ শাসমলের হাতের লেখা এই প্রমাণ করবার জন্য সরকার পক্ষ ৯ই তারিখের পরও একমাসের অধিক সময় নিয়েছিলেন, এবং মেদিনীপুর ও কাঁথি থেকে শাসমলের দাদা প্রভৃতিকে সাক্ষী আনিয়ে ছিলেন। কংগ্রেসের নিয়ম অনুসারে দেশপ্রাণ আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি। তিনি বিচারাসনে অধিষ্ঠিত কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহোকে বলেছিলেন—'দুটি কারণে আমি এই সাক্ষীর (মেদিনীপুরের একজন পুলিশ কর্মচারী) জবানবন্দীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক দেখাতে ইচ্ছা করিনা। প্রথমতঃ আমি অসহযোগী এবং সেইজন্য এ মোকদ্দমার কোন ব্যাপারের সঙ্গে আমি সহযোগ করতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ আমি দেখছি এই মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ আমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষীর মুখ দিয়ে মিথ্যা সৃষ্টি করতেও কুণ্ঠিত হননি এবং সে কারণে এ সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে কোন সংস্রব রাখাকে আমি ঘৃণার কাজ মনে করি। শাসমল তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে (পৃঃ ৮৭) লিখেছেন—'তবে একথা আমি আজ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করছি বিজ্ঞাপনখানার পাশে যে হাতের লেখা ও দস্তখত ছিল তা আমারই হাতের লেখা বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপনখানার শেষ ভাগে যে দস্তখতটি ছিল, সেটা আমার হাতের লেখা কিনা আমার

সন্দেহ হয়।' এই পুস্তকের লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে ঐ স্বাক্ষরটি ছিল প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যালয়ের অন্যতম কর্মী সুপরিচিত বিপ্লবী রবীন্দ্র নাথ সেনের।

এই বিচার প্রহসনের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হল এজন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামীগণের বিরুদ্ধে আনীত শত শত মোকদ্দমার কাহিনীই এইরূপ যে আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন না তাঁকে শাস্তি দেওয়ার সময় ন্যায় বিচারের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া কি ব্রিটিশের ন্যায় সঙ্গত নয়?

যা হ'ক দেশপ্রাণ শাসমল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতার বিচার পর্ব শেষ হল ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২ খৃঃ অঃ)। এঁদের ৬ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সরকারের মিটমাট চেষ্টা

এঁদের কারাবাস কালে যে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল তা বর্ণিত হল। দেশপ্রাণ শাসমল রচিত 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকের (পৃঃ ১০৩-০৪), বর্ণনা নিম্নরূপ 'বড়দিনের তখন বোধ হয় দিন কয়েক বাকী আছে (১৯শে ডিসেম্বর) একদিন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য মশায় জেলে এসে সংবাদ দিলেন—ভারতের বড়লাট সাহেব আমাদের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি আছেন। এখন কেবল আমরা তাঁর সঙ্গে মীমাংসা করতে সম্মত হলেই হয়। মীমাংসার সর্ত সম্বন্ধে তিনি এই বলেছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট সারা হিন্দুস্থান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিন্যাল ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্ট্ তুলে নেবেন এবং সে আইন অনুসারে যাঁরা ইতিমধ্যে দণ্ডিত কিম্বা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের সকলকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতের কোন না কোন একস্থানে একটি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসবে বলে, ভারত গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করবেন এবং সেই কনফারেন্সে কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যেমন উপস্থিত থাকতে পারবেন তেমনি সেখানে পাঞ্জাব খেলাফৎ ও স্বরাজ সম্বন্ধেও বিস্তারিত

আলোচনা হবে। অন্যপক্ষে গভর্ণমেণ্টের ঈদৃশ কার্য্যের পরিবর্ত্তে আমরা কেবল ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের হরতাল বন্ধ করব এবং যতদিন না রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের ফলাফল প্রকাশিত হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা 'পিকেটিং' করতে পারবো না।'

এই সর্ত সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত কি জানবার জন্যে দেশবন্ধু ম'শায় ও মৌলানা আজাদ সাহেব আমেদাবাদে অনতিবিলম্বে তার করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন—মীমাংসায় তাঁর কোন আপত্তি নাই তবে আলিভ্রাতৃদ্বয়কে এবং ফতোয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কয়েদীকে এখন ছেড়ে দিতে হবে এবং রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স কবে বসবে এবং সঙ্গে অন্য কেউ যোগ দিতে পারবেন কিনা এবং পারলে তাদের সংখ্যা ইত্যাদি কিরূপ হবে, এখন থেকে তা খুলে না বলে দিলে চলবে না। ভক্তিভাজন পণ্ডিত মদনমোহন এই নূতন সর্ত্ত নিয়ে বেলভিডিয়ারে বড়লাট সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন এবং মুখ ভার ক'রে ফিরে এসে বলেছিলেন লর্ড রেডিং ফতোয়া সংক্রান্ত কয়েদীগণকে এখন ছেড়ে দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নন; তবে আলি ভ্রাতৃদ্বয় যদি কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তা হ'লে তাঁদের রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগদান করতে দেওয়া হবে। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে এইমাত্র জানতে দিয়েছিলেন যে ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই কনফারেন্স বসবে বলে গভর্ণমেণ্ট প্রথম ঘোষণা করবেন এবং তাতে ভারতের সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হবেন। মহাত্মার কাছে আবার এই সকল কথা টেলিগ্রাম ক'রে পাঠান হয়েছিল, কারণ এখানকার কেউ তাঁর বিনানুমতিতে এতটুকু কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথমে পণ্ডিতজী এবং দেশবন্ধু মহাশয়কে এ ব্যাপারে মীমাংসা করতে অসম্মতি জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু শেষে বোধ হয় একদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির তদানীন্তন সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে সম্মতিসূচক একখানি তার এসেছিল।

এই তারখানির একখানি "টাইপ কপি" সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিতজী তার পরদিন সকালে জেলে এসে আমাদিগের অনেককে জেল অফিসে ডাকিয়েছিলেন। দেশবন্ধু মশায় মৌলানা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, পণ্ডিত বাজপেয়ী, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং আরও কয়েকজন এবং আমি তাঁর কাছে যথা সময়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। বাহিরের যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমাদের শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার চন্দ, মেদিনীপুরের ভাই সাতকড়িপতি, নোয়াখালির শ্রীযুক্ত সতেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ও দেশবন্ধু মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে। রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক কথাবার্তার পর একখানা কাগজে আমাদের সর্ত সমূহ লিখে তার নীচে আমরা উপস্থিত প্রায় সকলে দস্তখত ক'রে, সেখানি পণ্ডিতজীর হাতে দিয়েছিলাম। 'প্রায় সকলে' বললাম এই জন্য যে, খেলাফতের সম্পূর্ণ দাবী পরিপূর্ণ না হলে কোন মতে মীমাংসা হতে পারবে না বলে, মৌলানা আজাদ সাহেব ও তাঁর দু'জন মুসলমান বন্ধু সে কাগজে দস্তখত করতে সম্মত হয়েছিলেন না।

যা হোক পণ্ডিত মদন মোহন বেলা প্রায় ১২টার সময় কাগজখানি নিয়ে প্রথমে বাংলার গভর্নর এবং পরে বড়লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন বলে, আমাদের আশ্রম থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিধির বিধানে যা লেখা নেই তা ঘটবে কেন। যতদূর স্মরণ হয়, তার পরদিন পণ্ডিতজী এসে বলেছিলেন গতকাল তিনি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন বড়লাট সাহেব প্রায় দিল্লী বেরিয়ে বসেছেন। অধিকন্তু তাঁর কোন কার্য্যকরী সভার কোন সভ্য তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি আমাদের দস্তখত যুক্ত কাগজখানি হাতে নিয়ে পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন—তিনি ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কিছু করতে পারেন কিনা চেষ্টা করে দেখবেন। সেই থেকে এ কাল পর্য্যন্ত কাগজখানি বোধ হয় তাঁর কাছেই আছে এবং তিনি যে সে সম্বন্ধে এখনও কিছু করেননি, তার প্রমাণ জেলে বসেই ঘন ঘন পেয়েছি।

এই ব্যাপারের যে বিবরণ মেদিনীপুরের অন্যতম নেতা বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক সাতকড়িপতি রায় মহাশয় তাঁর 'দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর' প্রবন্ধে (প্রণব পত্রিকা—আষাঢ ১৩৭২) দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

"জেলে দেশবন্ধুর সঙ্গে মালবীয়জীর কথাবার্তা হোল—কী সর্ত্তে অসহযোগ তুলে নেওয়া হতে পারে এবং যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানানো যেতে পারে।"

দেশবন্ধু বললেন—'আমি তো দেশের আন্দোলনের কর্ত্তা নই—সারা ভারতের কর্ত্তা নই। সারা ভারতের আন্দোলনের কর্ত্তা মহাত্মা গান্ধী। সুতরাং এ সন্ধি তিনিই করতে পারেন— আমি পারি না।··· মালবীয়জী বললেন "তার কারণ ভাইসরয় বড় ব্যস্ত হয়েছেন।" দেশবন্ধু বললেন "সাতকড়ি, তুমি তো কলকাতার আন্দোলন চালাচ্ছ। তুমি তার কর।"

···দেশবন্ধু ও মালবীয়জী ড্রাফ্‌ট করলেন। সেটা আমার নাম দিয়ে সবরমতীতে পাঠান হোল: উত্তর এলো। তাতে আছে Viceroy এর প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁর দুটি সর্ত্ত যোগ করতে হবে। Prisoner আলি ভাইদের ছাড়তে হবে। Conferenceএর তারিখ এবং তাতে কে কে উপস্থিত থাকবেন সেটা এখনি বলতে হবে।···

এই সর্তে ভাইসরয় রাজি হতে পারলেন না। গান্ধীজী তাঁর পূর্বমত পরিবর্তন করলেন না।

মালব্যজী দেশবন্ধুকে বললেন—"যদি এইটাই আপনাদের শেষ কথা হয় তবে এইটি লিখে আপনি সই করে দিন। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।" দেশবন্ধু কিছুতেই রাজি নন। বললেন, 'আমি কয়েদী, আমি সই করবার কে ?' মালব্যজীর বিশেষ জেদে আমাকে তিনি বললেন, "আমি তো এখন আন্দোলন চালাচ্ছি না—তুমি সই করে দাও।" মালব্যজী বললেন "ওঁকে কে চেনে ? আপনি সই করুন।" তখন তাঁর অনুমতিতে আমি একটা সই করলাম, তখন

তার নীচে দেশবন্ধু একটা সই করলেন। আজও সেকথা মনে হ'লে কান্না পায়।"

গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ হল না। ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজের আগমন বয়কট ক'রে কলিকাতাতে যে হরতাল হোল তার তুলনা কদাচিৎ পাওয়া যায়। কলিকাতা একটি পরিত্যক্ত নগরীর আকার ধারণ করেছিল। গভর্নমেণ্ট এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

বীরেন্দ্রনাথের কারা মুক্তি ও বিপুল অভ্যর্থনা

১৯২২ সালের ৯ই আগষ্ট দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রাণ শাসমলকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। বীরেন্দ্রনাথকে যথাসম্ভব শীঘ্র নিজে-দের মধ্যে পাওয়ার জন্য মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠে। চারিদিকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা হতে থাকে। মেদিনীপুর সহরে একটি বিরাট সম্বর্দ্ধনা সভা হয়। তারপর কাঁথির জনসভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন সংগ্রামে জয়ী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সেনাপতি, বৃটিশের চক্ষে দেশ ভক্তির অপরাধে অপ-রাধী জননেতা বীরেন্দ্রনাথকে কাঁথিবাসী বীরের সম্মান প্রদর্শন করেছিল। বিরাট শোভাযাত্রার পর কাঁথির দারুয়া ময়দানে একটি সভা হয়, তাতে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার নরনারী যোগ দিয়েছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী খেজুরীর কংগ্রেস নেতা মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়। সভাতে মাতৃগত প্রাণ বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন তাঁর মাতৃদেবী। আনন্দের হিল্লোলে জনমণ্ডলী একান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কাঁথির বিশিষ্ট কবি গজেন্দ্রনাথ গুচ্ছাইৎ মহাশয় শোভাযাত্রার জন্য গেয়েছিলেন—

"উড়ুক নিশান তোরণে তোরণে ভাসুক ধরণী হরিতে হিরণে,
সাজ তরুলতা কুসুম শয়ানে—হাসেন প্রকৃতি রাণী,
ঐ আসে দেখ তব রথ চক্র মুখর করি পুরপথ

বাজরে শঙ্খ বাজ এসেছে মায়ের বিজয়ী কুমার
মায়ের কুটিরে আজ।”

....

এক মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রাতে সহস্র কণ্ঠে এই সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হল।

জনসভার প্রারম্ভে বীরেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী খ্যাতিমান লেখক জীবন কৃষ্ণ মাইতি মহাশয় রচিত কবিতাটি সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হল :—

“গুর্জর হতে রিক্ত তাপস প্রচার করিল মহান ধর্ম্ম।
ত্রিশ কোটি হৃদয় মুগ্ধ, ক্ষুব্ধ হইল আমলাতন্ত্র।
ভাবের বন্যা বহিল ভারতে, সহসা জাগিল সুপ্ত প্রাণ
সংসার সুখে করিল সেদিন স্বরাজ যজ্ঞে আহুতি দান॥
আশ্রমাগত ক্লিষ্ট সাধক স্বাগত আজি শতেকবার।
বঙ্গ মাতার অঞ্চল নিধি, মেদিনী মাতার কণ্ঠ হার॥”

আবেগে ও সম্ভ্রমে নিস্তব্ধ জনমণ্ডলীর নিকট এরপর দেশবাসীর পক্ষ হতে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন—সভাপতি মহাশয়। অভিনন্দনের উত্তরে বীরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শী ভাবগম্ভীর বাক্যগুলি জনমণ্ডলীকে অভিভূত করে তুলল তিনি বললেন দেশবাসীর অপরিসীম প্রেমের স্পর্শ লাভ ক’রে তিনি ধন্য হয়েছেন—তিনি চিরদিন তাদের সেবক থাকতে পারলে নিজেকে আরও সৌভাগ্য-বান বলে মনে করবেন।

জনসভার শেষে “মহাত্মা গান্ধী কী জয়” “বীরেন্দ্রনাথ কী জয়” ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হয়ে উঠল।

খেজুরী থানার অজ নগাড়ী বাজারে ও কলাগেছিয়া বাজারের জন-সভাগুলিতে হাজারে হাজারে সমবেত পল্লীবাসী নরনারীগণ তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছিলেন তাঁদের বীর নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের প্রতি।

কারাগারে নিক্ষিপ্ত মেদিনীপুরের কর্মীগণ

মেদিনীপুর জেলার ১৯২১ ও ১৯২২ সালের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্যে অনেক প্রধান কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

১৯২১ ও ১৯২২ সালে মেদিনীপুর জেলার কারাবরণকারী নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হ'ল ঃ—

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সাতকড়িপতি রায়, কিশোরীপতি রায়, রামসুন্দর সিংহ, শৈলজানন্দ সেন, নারায়ণ দাস সরকার, চারুচন্দ্র মহান্তি রাধানাথ কুণ্ডু, মৃত্যুঞ্জয় জানা, বিক্রমাদিত্য জানা, সূর্য্যকুমার জানা, কালাচাঁদ জানা, রঘুনাথ কর, ভীমাচরণ সামন্ত, দীনবন্ধু দাস, কালিপদ রায়, মৃগেন্দ্র নাথ রায়, ঈশ্বর চন্দ্র মাইতি, মনীন্দ্র নাথ মাইতি, সতীশচন্দ্র দাস অধিকারী, ফণীভূষণ দাস, নবকুমার শেঠ, ডাঃ গিরিশচন্দ্র দাস, ফকির চন্দ্র দাস, গুণধর হাজরা, শ্রীপতিচরণ বয়াল, পূর্ণ চন্দ্র মাইতি, সতীশচন্দ্র সামন্ত, পরেশ চন্দ্র দেব পট্টনায়ক, রমেশ চন্দ্র কর, কুঞ্জবিহারী দাস, অবিনাশ চন্দ্র দাস, সীতারাম মাইতি, চন্দ্র মোহন বেরা, সুরেন্দ্র নাথ ত্রিপাঠী, অনঙ্গমোহন দাস, কুমার চন্দ্র জানা গিরিধারী সাউ, সতীশ চন্দ্র জানা, প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র মাইতি, নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, পরেশ নাথ মাইতি, বসন্ত কুমার দাস, রমণীমোহন মাইতি, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রধান, হেমন্তকুমার মহাপাত্র, নরেন্দ্রনাথ মাইতি, রাখালচন্দ্র মাইতি, সুরেন্দ্রনাথ দাস, বিপিন বিহারী অধিকারী, ভবানী চরণ পাহাড়ী, শশীভূষণ পাল, শশিশেখর মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন রায়, সতীশ চন্দ্র ঘোষ, রামচরণ দাস, অলৌকিক চন্দ্র মাইতি।

দশম অধ্যায়

অসহযোগ কর্মধারার নূতন বিচার

চৌরীচৌরার দুর্ঘটনা

মহাত্মা গান্ধী প্রস্তুত হলেন গণ সত্যাগ্রহের জন্য। তিনি ১৯২০ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী ভাইসরয়কে একখানি খোলা চিঠি পাঠালেন। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন যে তিনি গুজরাটে বার্দ্দৌলি তালুকে নিজ তত্ত্বাবধানে একটি গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিন দিন পরে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরি-চৌরা গ্রামে একটী ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল। ঐ স্থানের থানার সামনে দিয়ে একটি শোভাযাত্রা যাওয়ার সময়ে থানার কনসটেবলগণ স্বেচ্ছাসেবকদের উপহাস করতে থাকে। পথচারী জনতা ওদেরকে তাড়া ক'রে গেলে সিপাহীরা গুলি চালায়। তাদের গুলি শেষ হয়ে গেলে জনতা থানাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সিপাহীরা দৌড়ে বেরিয়ে আসতে থাকলে তাঁদেরকে ওরা টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে। ২২ জন হতভাগ্য ব্যক্তি এইভাবে প্রাণ হারায়।

আক্রমণাত্মক কর্মসূচীর বিরতি

এই সংবাদে গান্ধীজী একান্ত মর্মাহত হন এবং গণসত্যাগ্রহ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই শোচনীয় ঘটনার জন্য গভীর পরিতাপ প্রকাশ করা হয় এবং গণসংগ্রাম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেসের আক্রমণাত্মক কার্য্যধারা স্থগিত রেখে গঠনমূলক কার্য্য পদ্ধতি গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। এইভাবে হঠাৎ ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেওয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তাঁদের অভিমত ছিল এরূপ কচিৎ সংঘটিত ঘটনার জন্য আন্দোলন বন্ধ করা

উচিত নয়। এরূপ কাজ দুস্কৃতকারীদের উস্‌কানীর ফলেও ঘটতে পারে কিন্তু গান্ধীজী অনুভব করলেন যে ন্যূনতম অহিংসা—যা অসহযোগ বা আইন অমান্যের জন্য প্রয়োজন তাও জনসাধারণ তা পালনেও প্রস্তুত হয়নি। যুবরাজের বোম্বাই পদার্পণের সময় নভেম্বর মাসে দাঙ্গা ও মারামারি দেখা গিয়েছিল। তথাপি তিনি গণ-সত্যাগ্রহের পরিকল্পনাকে কার্যাকরী করবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু চৌরীচৌরা ঘটনাকে তিনি হঠাৎ সংঘটিত বিরল ঘটনা বলে গ্রহণ করেননি। বরং ইহা জনসাধারণের মনোভাবের দ্যোতক বলে তাঁর অনুভূতি জেগেছিল। তিনি দেখেছিলেন মালীগাঁওতে সাধারণ লোক পুলিশকে আক্রমণ করেছিল এবং মালাবারে মোপলারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিল। এইরূপ হিংসামূলক কার্য্যে ও চৌরীচৌরার ঘটনাতে গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে এ সময়ে সাবধান না হয়ে ব্যাপক আইন অমান্য কর্মপদ্ধতি নিয়ে অগ্রসর হলে সমগ্র কার্য্যক্রম গুরুতর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে যাবে এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে অধিকতর ভয়ংকর হিংস্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। জহরলালজী চৌরাচৌরার ঘটনার জন্য আন্দোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে কারাগার থেকে তাঁর বিস্ময় ও বিহ্বলতার বিষয় গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজীর সহিত পত্র ব্যবহারের ফলে তাঁর অভিমত সম্যকরূপে অনুধাবন ক'রে তিনি বলেছিলেন গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয়েছিল।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

জনগণের হতাশা এবং নেতাগণের ক্ষুব্ধ মনোভাবের এই সুযোগ নিয়ে ১৯২২ সালে ১০ই মার্চ গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে প্রকাশিত "Tampering with Loyalty' 'The puzzle and its Solution' এবং 'Shaking the manes' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পৃথিবীর বিখ্যাত ও স্মরণীয় বিচার পর্বগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। গান্ধীজীর এই ঐতিহাসিক

বিচারের বিষয়টি অনুধাবন করলে অসহযোগ কর্মধারার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। কোন একটি সংগ্রামের ক্ষেত্রে সঙ্গত বা অসঙ্গত এই বিচার বর্জনীয় এবং বিপক্ষকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে তাঁকে সতদিক দিয়ে সম্ভব পর্যুদস্ত করার নীতিই অবলম্বনীয়—প্রচলিত সাধারণ ধারণা এইরূপ কিন্তু গান্ধীজীর মতে নীরবে ক্লেশ বরণই আইন অমান্যের প্রস্তুতি স্বরূপ। কারাবরণকে তিনি অসহযোগের অংশ বলেই মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতার সাধনার পথ অনুসরণ করতে হয় কারা প্রাচীরের মধ্যেই কখনো বা ফাঁসী-কাষ্ঠে জীবন দান ক'রে (Freedom is to be wooed only inside the prison walls and sometimes on gallows)। তাই তিনি নিঃশঙ্ক নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অসহযোগীদের হিংসাশ্রয়ী কার্যের সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে বিচারককে অনুরোধ করলেন তাঁকেই সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হোক্।

গান্ধীজী বলেন—অসহযোগীর আদর্শ হবে ন্যায় সঙ্গত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কারাবরণ করা। গভর্ণমেণ্টকে উত্তপ্ত করার জন্য নয়। স্বনস্ক দুঃখ সহ্য ক'রে গভর্ণমেন্টের মনের পরিবর্তন সাধন করা তার লক্ষ্য হবে। অসৌজন্য বা কর্কশ ব্যবহার ত্যাগ ক'রে লজ্জা কাতর না হয়ে এবং সর্বথা হিংসা পরিত্যাগ ক'রে শান্ত, নম্র, নিরহঙ্কার, ব্যবহার গ্রহণ ক'রে সাহসেরসহিত ভগবৎ বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ ক'রে কারাবরণে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারাজীবনের ক্লেশ আনন্দের সঙ্গে সহ্য করতে হবে। অত্যাচারীর অত্যাচার এবং অন্যায় ব্যর্থ হয়ে যায় স্বেচ্ছানুগ দুঃখবরণের দ্বারা।

আত্মিক বলের দুর্ব্বার শক্তি সমস্ত বাধা বিঘ্নকে পরাভূত ক'রে ন্যায় ধর্মের জয় ঘোষণা করবে এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ ক'রে ক্ষীণ তনু একটি মাত্র বস্ত্রাবৃত গান্ধীজী অপরিমিত বলশালী ইংরেজের আইনকে তুচ্ছ ক'রে হাসি মুখে লৌহ কপাটের অন্তরালে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন।

চৌরীচৌরার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, বার্দ্দৌলী সত্যাগ্রহের পরি-কল্পনা ও অসহযোগের আক্রমণাত্মক অংশ প্রত্যাহার এবং গান্ধীজীর

কারাবাসের ফলে দেশে রাজনৈতিক অবস্থা এক নূতন আকার ধারণ করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতাগণ প্রথম থেকেই কাউন্সিল্ বর্জ্জন কার্য্যসূচীর পক্ষে অনুকূল মত পোষণ করতেন না। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে নূতন উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য তাঁরা আইন সভায় প্রবেশ ক'রে গভর্নমেণ্টের বিরোধিতা চালানোই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

স্বরাজ্য দল গঠন

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া অধিবেশনের সভাপতি রূপে দেশবন্ধু কাউন্সিল প্রবেশ কর্মসূচী গ্রহণের অভিমত প্রকাশ করলেন কিন্তু রাজাগোপালাচারী প্রমুখ পরিবর্তন বিরোধী নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় পূর্ব্ব প্রবর্তিত অসহযোগ কার্যাক্রম পরিবর্ত্তন করে কাউন্সিলে প্রবেশ কার্য্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে 'নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন। দেশপ্রাণ শাসমল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন করলেন এবং স্বরাজ দলের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদকের পদে বৃত হলেন। মেদিনীপুরের অন্যতম নেতা সাতকড়ি পতি রায়ও দেশবন্ধুকে সমর্থন করলেন।

মেদিনীপুর জেলার কর্মীগণের উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তন-বিরোধী কর্মীগণের মধ্যে গুরুতর কোন বিতণ্ডার সৃষ্টি হল না। গঠন মূলক কর্মের বিস্তার সকলেরই কাম্য ছিল কাজেই এই কার্য্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রচেষ্টায় মনোযোগ দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত হলেন না। জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনা, চরকা ও খদ্দরের প্রচার ও প্রসার, সালিশ মীমাংসা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি, পল্লী সমিতি গঠন, কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ ও শক্তিশালী কংগ্রেস কমিটি গঠন স্থানীয় অভাব অভিযোগের প্রতিকার ইত্যাদি কার্য্য অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। দেশপ্রাণ শাসমল কাউন্সিল প্রবেশ কর্মধারা গ্রহণ করলেও জেলার কর্মীগণের গঠন মূলক কাজ-

কর্মে কোন বাধার সৃষ্টি করেননি। জেলাব কর্মীগণের মনোভাব সাধারণতঃ এইরূপ ছিল যে দেশপ্রাণ শাসমল বা অপর দু'চার জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আইন সভার সভ্যপদ গ্রহণ করলেও গঠন মূলক কার্য্য পরিচালকগণ এবং অন্যান্য কর্মীগণ তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত সাধারণের হিত-বিধান মূলক কার্য্যগুলি নিয়ে বিনা বাধায় কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন—সুতরাং তাঁরা পারস্পরিক বাগ্‌বিতণ্ডা বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

মেদিনীপুর জেলাবোর্ড

দেশপ্রাণ শাসমল জেল থেকে বাহিরে এসেই কলিকাতা নগরীতে রাজনীতির গতি প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে মেদিনীপুরে গিয়ে কাজকর্ম করাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করলেন। সে সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে যাতে খাঁটি গান্ধীবাদীদের প্রাধান্য থাকে এরূপ প্রচেষ্টা জোরের সঙ্গে চলছিল। দেশবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলার রাজনীতি পরিচালনা অসম্ভব এই কথা তাঁরা সহজেই বুঝেছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার ও বৃদ্ধি করার চেষ্টা কম ছিল না। কাজেই দেশবন্ধুকে দূরে রাখা সম্ভব না হলেও দেশপ্রাণ শাসমলকে তারা দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। এই অবস্থায় তিনি তাঁর অবারিত কর্ম্মক্ষেত্র মেদিনীপুরে চলে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে স্থির করেছিলেন। দেশপ্রাণ শাসমলের প্রথমে দৃষ্টি পড়ে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের দিকে। মেদিনীপুরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে পরিচালিত হ'চ্ছিল। জেলাবোর্ডে প্রবেশ ক'রে জনসাধারণের প্রভূত উপকার করা যায়—বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এটি বুঝতে দেরী হয়নি। তিনি জেলাবোর্ডে কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে প্রবেশের এবং চেয়ারম্যান পদ গ্রহণের সংকল্প করেন।

চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথ

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদপ্রাপ্তি তাঁর পক্ষে একটি সহজ ব্যাপার ছিল না। জেলাবোর্ডে সেই সময় সরকার মনোনীত যে সকল ব্যক্তি সদস্য পদে ছিলেন তাঁরা স্বভাবতঃই একজন সরকার বিরোধী কংগ্রেস নেতার জেলা বোর্ডের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিরোধী ছিলেন। বেসরকারী ও সরকারী শ্বেতাবধারী কয়েকজন সদস্য এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

চেয়ারম্যান নির্বাচন সভায় সভাপতি পদে বৃত হন তমলুকের উকীল শ্রীনাথ চন্দ্র দাস। তাঁর নির্বাচন প্রস্তাবের পক্ষে ১৬টি ও বিপক্ষে ১৬টি ভোট হওয়ায় লটারীর ফলে শ্রীনাথবাবু জয়ী হন। দেশপ্রাণ শাসমলের জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ১৬টি কবে ভোট হয়। এই অবস্থায় সভাপতির কাষ্টিং ভোটে শাসমলই চেয়ারম্যান হন। এই নির্বাচন ব্যাপারটি জেলা বোর্ডের তদানীন্তন প্রকৃত অবস্থার পরিচয় দেয়। প্রথম হতেই একটি সরকারের সমর্থক ও বীরেন্দ্রনাথের বিরোধী দলকে সামনে নিয়ে বীরেন্দ্রনাথকে কাজে নামতে হয়েছিল। বাধাদানই ছিল বিরোধী দলের নীতি ও কর্মপন্থা। স্বীয় কর্মশক্তি বলেই বীরেন্দ্রনাথ সদস্যগণের বাধা, আইন কানুনের সকল প্রকার অসুবিধা ইত্যাদিকে অতিক্রম ক'রে স্বীয় মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম অনুসরণ ক'রে সাধারণ্যে অপরিচিত জেলা বোর্ডকে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ পাল তাঁর 'দেশপ্রাণ শাসমল' পুস্তকে লিখেছেন পৃঃ ৯৭ "বীরেন্দ্রনাথের নিজমুখে শুনিয়াছি মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া তিনি প্রথম ছয় মাস কাল জেলাবোর্ড সংক্রান্ত যাবতীয় আইন ও নিয়ম অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং জেলা বোর্ডের কাগজ পত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন। পূর্ব্ববর্ত্তন জেলা বোর্ডের কর্মকর্ত্তাগণ কি কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, কত টাকাই বা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, ব্যয় করিতে না পারিয়া কত টাকাই বা

সরকারকে ফেরৎ দিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি জানিতে পারেন। তিনি পুরাতন কাগজপত্র হইতে এই তথ্য জানিয়া বিশেষভাবে বিস্মিত হন যে, বিদেশী ব্রিটিশ সরকার জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয়ের জন্য যে অর্থ জেলাবোর্ডের হাতে দিতেন, পূর্ব্বতন কর্মকর্তাগণ অনেক সময় তাহার সবটা জনকল্যাণে ব্যয় করিতে না পারিয়া অব্যয়িত অর্থ সরকারকে ফেরৎ দিতেন। অথচ জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। যথেষ্ট পানীয় জলের অভাবে লোকে কষ্ট পাইত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রয়োজনানুরূপ ছিল না। কাজেই জেলাবোর্ডের পূর্ব্বতন কর্মকর্তাগণ যে কিরূপ মন লইয়া কতটা জনকল্যাণ করিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা যে আত্মপোষণ ও সরকার তোষণে সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন তাহা বলাই বাহুল্য।

গভর্নরের অভ্যর্থনায় যোগদানে বীরেন্দ্রনাথের অসম্মতি

বীরেন্দ্রনাথের জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা কালীন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্থির হয় যে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর মেদিনীপুর পরিদর্শন করবেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হিউবার্ট গ্রেহাম বীরেন্দ্র-নাথকে অনুরোধ জানান যে তিনি যেন তাঁর (ম্যাজিস্ট্রেটের) সঙ্গে লাট সাহেবের মেদিনীপুর পরিদর্শন সম্পর্কে আলোচনার জন্য একবার দেখা করেন। এই পত্রের উত্তরে বীরেন্দ্রনাথ জানান যে তিনি এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব খোলাখুলি জানানই প্রয়োজন মনে করেন। তিনি লিখেন—"আমি দুঃখিত যে গভর্নর বাহাদুর-এর এখানে আগমনে আমি 'ব্যক্তিগতভাবে' যোগদান করিতে পারি না। কারণ যে গভর্ণমেণ্ট আমাকে বিনা প্রমাণে জেলে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা আমার নিকট হইতে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোন প্রকার সহযোগিতা আশা করিতে পারেন না। 'ব্যক্তিগতভাবে' এই কথা ব্যবহারের কারণ এই যে আমাকে আপনি চেয়ারম্যান হিসাবে পত্র লিখেন নাই। আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাই যে আপনি আমার ব্যক্তিগত মনোভাব বিবেচনা

করিবেন এবং আপনার নিকট এখন যাইতে না পারার জন্য ক্ষমা করিবেন।" এই পত্র পাবার পর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বীরেন্দ্রনাথকে জানান যে আপনি যে-প্রকার সৌজন্য সহকারে আপনার অসম্মতি জানাইয়াছেন আমি তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। এই অবস্থায় আমাদের সাক্ষাৎকারের দ্বারা কোন ফল হইবে না।"

জেলাবোর্ডের এক সভায় একটি ইংরাজী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে জেলাবোর্ডের অন্যতম সদস্য ঝাড়গ্রামের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জেলাবোর্ডের সরকার মনোনীত সদস্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী এই ঘটনা অবলম্বন ক'রে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন কবেন। জেলার মধ্যে এরূপ ক্ষোভের সঞ্চার হয় যে বিভিন্ন স্থানে আহূত ৭৮ টি সভায় বীরেন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনাস্থা প্রস্তাবটি আলোচনার তারিখে ভাদুড়ী মহাশয় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার ক'রতে চান। চেয়াবম্যান বলেন 'যে, তাহা ঐ সময়ে সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে অনেক আলোচনার পর ভাদুড়ী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি আর কখনো ঐরূপ প্রস্তাব আনবেন না। তখন তাঁকে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয়।

বীরেন্দ্রনাথ এরূপ তেজস্বী মনোভাব পোষণ করতেন যে তিনি কোন সময় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যেতেন না। তিনি বলতেন যে তিনি মেদিনীপুর জেলার ৪০ লক্ষ লোকের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দৌড়াদৌড়ি তাঁর পক্ষে সম্মানজনক কার্য্য নয়। একবার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে তাঁর বাংলোতে ডেকে পাঠালে তিনি জানিয়ে দেন যে চেয়ারম্যানের অফিস বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে ; তিনি (ম্যাজিষ্ট্রেট) ইচ্ছা করলে এই সময়ের মধ্যে চেয়ারম্যানের অফিসে এসে দেখা করতে পারেন। জেলাবোর্ডের পরিচালনায় জেলাবোর্ডের কংগ্রেস সদস্যগণ জেলার ৫টি মহকুমাতে গঠিত কংগ্রেস পরিচালিত লোক্যাল বোর্ডগুলি ছিল বীরেন্দ্রনাথের সহায়। জেলা বোর্ডকে একটি প্রাণবন্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কাজে

বীরেন্দ্রনাথ নিজে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁকে অকুণ্ঠ সাহায্য দিয়েছে লোক্যাল বোর্ডগুলি। সেই সময় জেলাবোর্ড ছিল জেলা কংগ্রেসের গঠন মূলক কার্যধারার প্রধান বাহন। সেখানে ছিল বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব, কর্মশক্তি, ও বিরোধী শক্তিকে দমিত করার ক্ষমতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্ম্মীগণেব সক্রিয় সহযোগিতা। জনসাধারণও অন্তরের সহিত বোর্ডের সকল কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। বিরোধী ব্যক্তিগণেব অপপ্রচারে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না।

জেলাবোর্ডের বিভাগগুলি পরিচালনা

জেলাবোর্ডের কয়েকটি প্রধান বিভাগ ছিল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ, পথঘাট ইত্যাদি।

জেলার কতকগুলি অংশ ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত ছিল। এই রোগের ব্যাপকতা নিবারণেব জন্য বীরেন্দ্রনাথ কয়েকটি স্কীম গ্রহণ কবেন। কাঁথি শহর থেকে দুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত দারুয়া গ্রামটি মারাত্মক সেরিব্রাল ম্যালেরিয়াব একটি ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। এইখানে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেব অধীনে (ডাক্তাব শরৎচন্দ্র দে) ব্যাপক ভাবে কুইনিন প্রয়োগ, ঝোপ, জঙ্গল, পানাপুকুর পরিষ্কার, অপরিশুদ্ধ কেরোসিন ছড়িয়ে মশা নিবারণ, ব্যাপক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রভৃতি প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই স্কীমটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সফল হয়েছিল। স্থানীয় কংগ্রেসকর্মী তারকনাথ পাল, ক্ষীরোদ নাথ পাল, অঘোরচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি 'দারুয়া ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তাঁরা জঙ্গল পরিষ্কার, গর্ত ভরাট, কেরোসিন ছড়ানো, কুইনিন বিতরণ প্রভৃতি কাজ ক'রে দারুয়া কেন্দ্রটিকে প্রভুত সাহায্য করেছিলেন। কেদারনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সর্বদা দৃষ্টি ছিল এই কেন্দ্রের কার্য্যের প্রতি। সহৃদয় ডাক্তার শরৎবাবু স্থানীয় যুবক কর্ম্মী সুধীরবাবু (পরে প. ব. মন্ত্রী) প্রভৃতির সঙ্গে মাটির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে থানা-

পুরণের কাজ করতেও কুণ্ঠিত হননি। দুই তিন বৎসরের নিবিড় কার্য্যের ফলে দারুয়া গ্রামে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট নরনারী কচিৎ দেখা যেত।

সবং থানার বুড়াল অঞ্চলে কালাজ্বর ইন্‌জেক্‌সন প্রচলন ক'রে ঐ স্কীমকে সাফল্যমণ্ডিত করা হয়। কোন স্থানে কলেরাদি রোগ মহামারী রূপে দেখা দিলে জেলাবোর্ডের নিকট সংবাদ আসা মাত্র তৎপরতার সহিত ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হত। বিলম্ব বা ঔদাসিন্য আদৌ বরদাস্ত করা হত না। এইরূপ সময়ে পল্লীবাসী নরনারীগণের মধ্যে কংগ্রেস কর্ম্মীগণের সেবাকার্য্য, পানীয় জল সংরক্ষণাদি, কংগ্রেস ও জেলাবোর্ড উভয় প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ক'রে তুলেছিল। বসন্ত রোগের প্রতিরোধ কার্য্যের জন্য টিকাদারের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছিল এবং ব্যাপক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বীরেন্দ্রনাথ জেলাবোর্ডের চেয়াম্যানের পদ গ্রহণ করেন। তার পূর্বে জেলাবোর্ডের ডাক্তারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি। তাঁর চেষ্টা ও উৎসাহে জেলাবোর্ডের অর্থ সাহায্য এবং বদান্যব্যক্তিগণের নিকট থেকে অর্থ ও গৃহাদি নির্মাণের স্থান সংগ্রহের ব্যবস্থার ফলে ২৪টি নূতন ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডাক্তারখানার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১টি। সেই সময় গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারখানার সংখ্যা খুবই কম ছিল—কাজেই সময়মত চিকিৎসা পাওয়া বড়ই কঠিন ছিল। বহু লোক সহরে যাওয়ার ক্ষমতার অভাবে সাধারণ চিকিৎসাও পেতে পারত না। জেলা বোর্ডের অধীন ডাক্তার খানার সংখ্যা বৃদ্ধিতে বহুলোক উপকার পেতে সক্ষম হল।

জেলাবোর্ড থেকে জেলার প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিকে নিয়মিত সাহায্য দেওয়া হত। কিন্তু সেগুলির তত্ত্বাবধান খুবই অল্প হত। সরকারী ইন্‌স্পেক্টার বিভাগ থেকে পরিদর্শনের ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল ছিল। বীরেন্দ্রনাথ চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করার পর নিজেই বিদ্যালয় গুলিতে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা জানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি প্রায়ই পুর্বে সংবাদ না দিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হতেন। দেখা

যেত কোন কোন বিদ্যালয়ের দরজা বেশ কয়েক দিন খোলা হয়নি—ধূলা জমে আছে। কোথাও বা একটী শিক্ষক উপস্থিত—দ্বিতীয় বা তৃতীয়টীর অনুপস্থিতিতেও হাজিরা খাতাতে যথারীতি স্বাক্ষর করা হয়েছে। কোন কোন বিদ্যালয় ছাত্র বিরল, যদিও খাতাতে নাম পুরণের অভাব নাই। বীরেন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি ও পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়-গুলির পরিচালনার প্রভূত উন্নতি হল। অভিভাবকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন—ছাত্রদের পড়াশুনারও অনেক উন্নতি হল। বীরেন্দ্র নাথ স্কুলগুলির সাহায্যের পরিমাণও বাড়িয়ে দিলেন। বোর্ড স্কুলরূপে গণ্য বিদ্যালয়গুলি বিশেষ সাহায্য লাভ করত এবং অনেক স্কুল-বিহীন গ্রামে নূতন স্কুল খোলার ব্যবস্থা করলেন। ১৯২৩-২৪ সালে জেলা-বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট ছিল ৫১ হাজার টাকা। কংগ্রেস দল জেলা বোর্ডে প্রবেশের পর ক্রমশঃ এই বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৫-২৬ সালে ১ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির গৃহনির্মাণের জন্য ৬৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ মান পর্যন্ত) গুলি পরিচালিত হত প্রধানতঃ জেলা বোর্ডের সাহায্যে। মাসিক সাহায্য নিতান্ত কম থাকায় বিদ্যালয়গুলির কাজ অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পরিচালিত হত। বীরেন্দ্র নাথের সময় এই সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো হয়। কয়েকটি বিদ্যালয় বোর্ড স্কুলরূপে বিশেষ সাহায্য লাভ ক'রে শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামাদি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

সংস্কৃত টোলগুলিতে পূর্বে জেলা বোর্ড থেকে কোন সাহায্য দেওয়া হত না কিন্তু কংগ্রেস দল টোলগুলির জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

শিল্পশিক্ষা এবং ইঞ্জিনীয়ারীং, ডাক্তারি প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ছাত্র-দিগকে প্রতিবৎসর মাসে ২০ টাকা হিসাবে ২০টী বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এতে গরীব ছাত্রদের অনেক উপকার হয়েছিল।

জেলাবোর্ডের আয়ের পরিমাণ অধিক না হলেও শিক্ষার প্রতি যথাসাধ্য দৃষ্টি দেওয়ার জন্য কংগ্রেস দল প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন।

পানীয় জলের উপযোগী করার জন্য জেলা বোর্ডের অধীন বহু পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত পুষ্করিণীর মালিকগণের সঙ্গে একটি রেজেস্টিকৃত চুক্তি হয় যে তাঁদের পুষ্করিণীগুলি সাধারণের পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে এবং মালিকগণ জল দূষিত বা কর্দমাক্ত হয় এরূপ ভাবে পুষ্করিণীগুলি ব্যবহার করতে পারবেন না। এই সর্তে জেলাবোর্ড থেকে ঐ সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা হয়েছিল। উত্তম পানীয় জল সরবরাহের জন্য কতকগুলি সংরক্ষিত পুষ্করিণীরও ব্যবস্থা হয়েছিল। যে সব জায়গাতে প্রায়ই কলেরা হত সেগুলিতে নলকুপ বসানর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমুদ্রের ধারে মাছধরার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ফেরীঘাটের নিকট এবং অন্যান্য যে সব প্রয়োজনীয় স্থান অবহেলিত ছিল যতদূর পারা যায় সেগুলিতে নলকুপ বসান হয়েছিল। সাগর সঙ্গমে পৌষ সংক্রান্তির স্নানের সময় রসুলপুর নদীর মুখে অবস্থিত পেটুয়া ঘাটে নৌকাযোগে অসংখ্য যাত্রী পারাপার করতো। নিকটবর্তী মসনদ-ই-আলার মসজিদে মেলার সময় মুসলমান তীর্থযাত্রীগণের বিপুল সমাবেশ ঘটত। এই দুই স্থানেই পানীয় জলের কূপ খননের ব্যবস্থা হওয়ায় সহস্র সহস্র লোক উপকৃত হয়।

জেলাতে পাকা রাস্তার সংখ্যা বেশী ছিল না। কংগ্রেস দল জেলা বোর্ডে প্রবেশ করাব পর প্রতিবৎসর কয়েক মাইল হিসাবে রাস্তা পাকা করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে কাঁকরমাটি থাকায় এই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল কিন্তু তমলুক ও কাঁথি মহকুমাতে এবং সদর মহকুমার কতকাংশে কাদামাটির জন্য পাকা রাস্তার কাজ ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ছিল। উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থাও অপেক্ষাকৃত অসুবিধাজনক হত। তথাপি রাস্তাঘাটের উন্নতির প্রতি জেলাবোর্ড থেকে প্রভূত চেষ্টা করা হয়েছিল। অনেকগুলি রাস্তা ক্ষয়ে গিয়ে অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং কোন কোন জায়গায় ঐগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। সেগুলিকে উপযুক্ত রূপে প্রশস্ত ও উচ্চ ক'রে তুলে বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে মোটর যানের উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে পাকা রাস্তায় পরিণত

করার উপযোগী অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রভূত চেষ্টা করা হয়েছিল। কংগ্রেসকর্মীগণ প্রভাব বিস্তার ক'রে প্রয়োজনীয় নূতন স্থান সংগ্রহ করতেন এবং যতদূর সম্ভব ঐ রাস্তাগুলির উন্নতি বিধান কার্য্যেরও সহায়তা করতেন। কাঁচা ও পাকা রাস্তার পুলগুলির সংস্কারের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। এগুলি ব্যতীত খাল, নালা প্রভৃতি পারাপারের জন্য কতকগুলি পুলের (Stray-bridge) ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

জেলাবোর্ডের অধীন খেয়াঘাটগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপযুক্ত নৌকা, যাত্রীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ, যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বিষয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়মকানুন না থাকায় যাত্রীরা গুরুতর অসুবিধা ভোগ করতেন ও মধ্যে মধ্যে বিপদাপন্ন হ'তেন।

১৯২৪ সালে আগস্ট মাসে কাঁথির নিকটবর্তী পেটুয়াঘাটে একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে। পেটুয়াঘাট হ'তে কিছু দূরে ১৩০ জন যাত্রী ও ৯টি গরু বোঝাই একটি নৌকা হঠাৎ কাৎ হ'য়ে ডুবে যায়। মাঝির প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকাটি রক্ষা পায় নাই—অধিকাংশ যাত্রী মারা যায়। এইরূপ দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে এ জন্য চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র নাথ যাত্রী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সুব্যবস্থার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। যে সব খেয়া জেলান্তরে যাতায়াত করত সেগুলিতে যাত্রীদের পারাপারের সুব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের যে অভাব ছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে জেলাবোর্ড থেকে উভয়কূলে তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) নিয়োগ ক'রে ঐ অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করা হয়

মেদিনীপুর জেলা থেকে এবং বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশ থেকে বহু সংখ্যক তীর্থযাত্রী প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় সাগরসঙ্গমে স্নানের জন্য যেত পেটুয়া, রসুলপুর, দক্ষিণ আড়িয়া, তালপাটি, তের-পাখিয়া, নরঘাট প্রভৃতি ঘাটের পথে যাতায়াত করতেন। পূর্বে এই সব যাত্রী ব্যাপকভাবে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হত। মেদিনীপুর জেলাবোর্ড থেকে কলেরার টিকা দেওয়া, পানীয়

জলের সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করায় তীর্থযাত্রীরা প্রভূতভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য এবিষয়ে খুবই সুফলপ্রদান করেছিল।

মেদিনীপুর জেলা বোর্ডকে একটি ঘুমন্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জেলার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর নিকট একটি সদাজাগ্রত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কংগ্রেসকর্মীগণের ও তাঁদের নেতা বীরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থা বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়েছিল এবং তার প্রভূত প্রতিফলন হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড নির্বাচন—১৯২৬

১৯২৫ সালের শেষভাগে পুনরায় জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডগুলির সদস্য নির্বাচন হল। লোকাল বোর্ডগুলির মোট ৭৮টি সদস্য পদের মধ্যে ৭৭টিতে কংগ্রেস দলের প্রার্থীগণ নির্বাচিত হলেন এবং জেলাবোর্ডের মোট ২২টি সদস্য পদ সমগ্রভাবে কংগ্রেস প্রার্থীদের দ্বারা অধিকৃত হল। কংগ্রেসের মুখপত্র 'সত্যবাদী' পত্রিকাতে সম্পাদক অতুল চন্দ্র বসু লিখলেন—

> "লক্ষ্মী গেল সরস্বতী গেল চিত্ত গেল—বিত্ত গেল
> ঈশান গেল নৈঋ‌র্ত গেল রইল কেবল শিবরাত্রির সলিতা
> শালবণির নীহার হাজরা।"

মেদিনীপুর জজ কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল মনীষী নাথ বসু সরস্বতী, চিত্তরঞ্জন রায় ও ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র কংগ্রেস প্রার্থীদের দ্বারা পরাজিত হন। উল্লিখিত সরস কবিতাটি তাঁদেরকে লক্ষ্য ক'রেই লেখা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রার্থীদেব এই অভূতপূর্ব সাফল্যে বুঝতে পারা যায় দেশের উপর জেলা বোর্ডের তিন বৎসরের কার্য্যের প্রভাব কতটা গভীর হয়েছিল। জেলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি এবং কংগ্রেস কর্মীগণ দেশপ্রাণ শাসমল বীরেন্দ্রনাথ পরিচালিত জেলা বোর্ডের কার্যে সাফল্য অর্জনের জন্য মনপ্রাণ দিয়ে কাজ ক'রেছিলেন। আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে বা বিপক্ষে যে মতই থাকুক না কেন জেলা বোর্ডের কার্য্যের সাফল্য কংগ্রেস কর্মীগণের একতাবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টার ফল স্বরূপই

প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছিল। মেদিনীপুরের 'মুকুটহীন রাজা' বীরেন্দ্র নাথের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনুগত্য সকল বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করেছিল। তিনি যখন ১৯২৩ সালে জেলা বোর্ডে নির্বাচিত হন তখন কোন কোন সময় ৯ জনের অধিক সদস্যকে তাঁর পক্ষে উপস্থিত পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত কিন্তু তাঁর কর্মকুশলতার গুণে তিনি সর্বপ্রকার সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের পুনর্নির্ব্বাচন নামঞ্জুর

বলাবাহুল্য জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে পুনরায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হলেন। কিন্তু বর্দ্ধমান বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ও এন. কুক এই নির্ব্বাচনে অনুমোদন না দিয়ে বীরেন্দ্রনাথকে ১০ দিনের মধ্যে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠালেন যাতে অনুমোদন না দেওয়া বিষয়ে সরকারের কারণ আলোচিত হতে পারে (কমিশনারের পত্র ২৬শে মে ১৯২৬)। বীরেন্দ্রনাথ জানালেন যে তিনি বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ১০ দিনের মধ্যে কমিশনার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। তিনি অনুরোধ করলেন যে কমিশনার মহাশয় লিখিতভাবে সরকারের অমতের কারণগুলি জানালে মৌখিক আলোচনা অপেক্ষা ইহা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে, কারণ তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকবে না। কমিশনার এই বিষয়টি নিয়ে আর অগ্রসর হলেন না। কলিকাতা গেজেটের একটি সংখ্যায় বীরেন্দ্রনাথের নির্বাচন নাকচ করার এবং নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁন মহাশয়কে এক বৎসরের জন্য চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার সংবাদ প্রকাশিত হল। এইরূপে একজন অক্লান্ত জনকল্যাণব্রতী সুদক্ষ কার্য্যপরিচালককে পুরস্কৃত করা হল! তিনি যদি স্বাধীনচেতা, আমলাতন্ত্রের ইঙ্গিতের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন, শক্তিশালী পুরুষ না হতেন, হয়ত তাঁর সঙ্গে দর কষাকষি চলত। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য যিনি আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে দ্বিধা করেননি এবং বিজয়ী বীর রূপে দেশবাসীর হৃদয় জয়

করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেইরূপ একজন ব্যক্তিকে পুনরায় একটি অপ্রতিহত বাহিনী সহ জেলাবোর্ড প্রবেশের সুযোগ দিতে তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই শঙ্কা বোধ করেছিলেন এবং সময়োপযোগী সাবধানতা, অবলম্বন ক'রে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কার্য্যকাল আরম্ভ হয়েছিল ১৯২৩ সালের ২১ এপ্রিল এবং সমাপ্ত হয়েছিল ১৯২৬ সালের ৬ই অগাষ্ট।

বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় কখনও জেলাবোর্ডে ফিরে আসেননি কিন্তু তিনি পথপ্রদর্শক রূপে যে কর্মসূচীকে কার্যকরী করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তাহাই হয়ে উঠেছিল তাঁর পরবর্তী পরিচালকগণের দিশারী স্বরূপ। বীরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে জেলা বোর্ডের যৎসামান্য আয়ের অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয়িত না হয়ে সরকারী দপ্তরে প্রত্যর্পিত হওয়া একটা নিয়ম হয়ে উঠেছিল কিন্তু সেই অযৌক্তিক কার্য্যের পুনরাবৃত্তি আর ঘটেনি বীরেন্দ্রনাথের সতর্ক ও সুদক্ষ পরিচালনার ফলে। তিনি জেলা বোর্ডের সঞ্চিত অর্থও ব্যয় করে ফেলেছিলেন এই দুর্নাম তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু কঙ্কালবৎ অসাড় জেলা বোর্ডে তাঁর কর্মশক্তির ফলে প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল তারই বেগবহনের জন্য তাঁকে বহুমুখী কর্মধারা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তিনি স্বতঃই জেলাবাসীকে হতাশার আক্ষেপের মধ্যে নিক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। কাজেই তাঁর সময়ে জেলা বোর্ডের ব্যয়ের অঙ্ক অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকলেও তিনি ফেরী ও খোঁয়াড় বিভাগ, পথপার্শ্ববর্তী জেলা বোর্ডের জমি বিলি বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিভাগ থেকে যাতে আয় বৃদ্ধি হয় তার চেষ্টা করেছিলেন।

সরকার নিযুক্ত চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র লাল খাঁনের কার্য্যকাল ছিল এক বৎসর—১৯২৬ সালের ৭ই আগষ্ট থেকে ১৯২৭ সালের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত। ইহার পর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মেদিনীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল কংগ্রেস নেতা কিশোরীপতি রায় এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন—মেদিনীপুরের অন্যতম কংগ্রেস নেতা 'সত্যবাদী'

পত্রিকার সম্পাদক অতুলচন্দ্র বসু। এঁরা বীরেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। কংগ্রেসকর্মীগণ পূর্বের ন্যায় জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগের সুযোগ গ্রহণ ক'রে গ্রামাঞ্চলে বহু জনহিতকর কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেলা বোর্ডের নির্বাচিত ২২ জন কংগ্রেস কর্মী সমবেত চেষ্টায় কর্মরত ছিলেন।

এই সময় মহকুমা লোক্যাল বোর্ডগুলিতে কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তিগণ চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান ও সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকায় সমস্ত জেলাতে নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্য শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। তখন কাঁথি লোক্যাল বোর্ডে সভাপতি ও সহ সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র মাল; তমলুকে ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক ও হংসধ্বজ মাইতি। সদরে চেয়ারম্যান ছিলেন অতুলচন্দ্র বসু ও ঘাটালে চেয়ারম্যান ছিলেন মোহিনী মোহন দাস।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে লোক্যাল বোর্ডগুলির মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল—৭৮ এবং একটি আসন ব্যতীত বাকী সব সদস্য পদেই কংগ্রেস প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৭৭ জন কংগ্রেস কর্মী লোক্যাল বোর্ডগুলির চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান এবং সদস্য রূপে নিষ্ঠার সহিত কাজ ক'রে জেলা বোর্ডের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে উচ্চমানের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা জন সংযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল কংগ্রেসী প্রভাব সম্পন্ন জেলা বোর্ডের কার্য্যে সরকার পক্ষের অযথা হস্তক্ষেপের উদাহরণ তেমন পাওয়া যায় না কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হলেই জেলা বোর্ডের ক্ষমতা লোপ ক'রে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসীগণকে স্বরাজ্য দলের নামে আইন সভাগুলিতে সদস্য

পদ প্রার্থী হওয়ার অনুমতি দেওয়ায় মনোনীত কর্মী ও কংগ্রেস নেতাগণ ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত আইন সভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুত হলেন। মেদিনীপুর জেলাতে বঙ্গীয় আইন সভায় (কাউন্সিল) বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি কেন্দ্র থেকে, মহেন্দ্রনাথ মাইতি তমলুক কেন্দ্র থেকে এবং কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁন মেদিনীপুব কেন্দ্র থেকে (মেদিনীপুর সহর, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা) নির্বাচিত হন।

বীরেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বরাজ্য দলের প্রার্থী, দেবেন্দ্র লাল ছিলেন বি. চক্রবর্তী পরিচালিত ন্যাশনলিষ্ট দলের প্রার্থী, কিন্তু উভয় দল এক যোগে কাজ করেছিলেন। অন্য দলের নাম নিয়ে কেউ প্রার্থী হননি—প্রত্যেক আসনে ব্যক্তিগত প্রার্থী অবশ্যই ছিলেন। কংগ্রেসের অপরাজেয় প্রভাবের ফলে মেদিনীপুর জেলার সকল আসনেই এই প্রকারের জয় সম্ভবপর হয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি ব্যতীত ডায়মণ্ড হারবার আসনেও প্রার্থী হয়েছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশে কংগ্রেসীগণ স্বরাজ দলের প্রার্থী রূপে অধিকাংশ আসনে জয়ী হওয়ায় দেশের মধ্যে একটি সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের অন্যতম অসহযোগী নেতা সাতকড়ি পতি রায় কলিকাতার বড়বাজার আসনে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এ্যাডভোকেট জেনারেল এস, আর, দাসকে পরাজিত ক'রে নির্বাচিত হন। সাতকড়ি বাবু পেয়েছিলেন ১৪০০ ভোট এবং মিঃ এস, আর, দাস পেয়েছিলেন ২০০ ভোট। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় (ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর ন্যাশনলিষ্ট দল) পরাজিত করেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই নির্বাচন অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন কিন্তু তিনি কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ কাঁথির আসনে পদত্যাগ করলে দেশবন্ধু ঐ আসনে নির্বাচিত হয়ে কাঁথি বাসীর প্রতিনিধি রূপে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রবেশ কয়েন: এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে ১৯২৩ এর কলিকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে কর্পোরেশনের অধিকাংশ আসন দখল করেন

এবং মেয়র নির্বাচিত হন। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (চীফ্ একসিকিউটিভ অফিসার) পদে দেশবন্ধু তাঁর প্রধানতম সহকর্মী বীরেন্দ্রনাথকে গ্রহণ করবেন কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেশবন্ধু তাঁর সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সে সময় বিপ্লবী দলের কর্মীগণ দেশবন্ধুর প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদেব অভিপ্রেত ব্যক্তি ছিলেন—সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরা দেশবন্ধুকে এমন একটি অবস্থার মধ্যে নিয়ে গেলেন যে বীরেন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তে সুভাষবাবুকে প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদে মনোনীত করা ছাড়া তাঁর উপায় রইল না। এর মধ্যে কলিকাতাব অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের (aristocracy) কলকাঠি নাড়ার চেষ্টা অবশ্যই ছিল কারণ তাঁরা মফঃস্বলবাসী কৃষকশ্রেণী থেকে আগত বীবেন্দ্র নাথকে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ্যেব পদে অভিষিক্ত করাটা—নিজেদের মর্য্যাদা (Prestige) হানিকর মনে করেছিলেন। এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং চিত্তরঞ্জন যে তাঁর কথা রক্ষা করতে সমর্থ হলেন না এজন্য তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠলেন। সে সময়কার অবস্থা বোঝাবার জন্য দেশবন্ধুব অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও একান্ত সচিব হেমন্তকুমার সবকারের "দেশবন্ধু স্মৃতি" পুস্তকের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ—"কলিকাতা হইতে আসিবার আগে বীরেন শাসমল আমায় বলিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনেব ঐ পদে দেশবন্ধু তাঁহাকে যদি মনোনীত কবেন তাহা হইলে তিনি পাঁচ শত টাকা মাত্র য়্যালাউন্স লইয়া কাজ করিতে রাজি আছেন। সুযোগ বুঝিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলের কথা (দেশবন্ধুকে) জানাইলাম। দেশবন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, বীরেন দরখাস্ত করলে আমি বাঁচি। হরিধন দত্ত, অশ্বিনী বাঁড়ুয্যে ও জে. সি. মুখার্জী তিনজনে ধরেছে। বীরেনের নাম প্রস্তাব হলে এদের আমি সাফ্ জবাব দিতে পারি। ভেড়ামারা হইতে ফিরিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলকে দেশবন্ধুর মনোভাব জানাইলাম।

কিন্তু এই কথা প্রচার হইবামাত্র কলিকাতার দলের মধ্যে ভীষণ

ষড়যন্ত্র হইয়া গেল। 'মেদিনীপুরের ক্যাণ্ট' এসে কলিকাতায় রাজত্ব করবে? একথাটাও দলের একজন পাণ্ডার মুখে শোনা গেল। শাসমলকে হঠাইতে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্রকে নানা ফিকিরে খাড়া করা হইল। পার্টির ভোটের সময় শাসমলের নাম টিকিল না।" (পৃঃ ৫০)

দৈনিক মাতৃভূমি পত্রিকায় হেমন্ত কুমার সরকার আরও লিখেছিলেন—

"সুখের পর দুঃখ আছে—বিপদের দিনে শাসমল আমাদের সকলের আগে মাথা পাতিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—হাসিমুখে কারা-বরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সুযোগ্য সম্পাদকরূপে, মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে, দেশবন্ধুর ফরওয়ার্ড পত্রিকার প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টার হিসাবে, স্বরাজ্য দলের প্রধান কর্মীরূপে—শাসমলের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় পাইয়া সকলেই তাঁহার দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী রূপে মনে মনে বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু কি কুক্ষণে বিবাদ বাধিল কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারের পদ লইয়া। শাসমল মাসিক ৫০০ টাকা ভাতায় ঐপদ গ্রহণে রাজি ছিলেন—দেশবন্ধুর তাহাতে সম্মতি ছিল। কিন্তু অভিজাতদলের চক্রান্তে শাসমলের তথা দেশবন্ধুর অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক পত্রে (১৯. ৯, ১৯২৪) শাসমলকে লিখেছিলেন "........কলকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officer এর পদ আপনারই প্রাপ্য বলিয়া আমরা জানিতাম কিন্তু স্বরাজ্য দলের কি অভিসন্ধি ছিল জানিনা। আপনাকে coolly ignore করিল।"

এই দুই দেশনেতার বিচ্ছেদ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল। অসহযোগ প্রবর্তনের সময় থেকে ওঁরা দেশ পরিচালনার সকল কার্য্যে একান্ত অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক এবং স্বরাজ্যদলেরও এইরূপ দুটি পদে অধিষ্ঠিত থেকে ওঁরা দেশকে শক্তিশালী ও সংগ্রামী করে তুলেছিলেন। ব্যারিষ্টারী

ব্যবসা ত্যাগ ক'রে উভয়ে একত্র ত্যাগব্রত গ্রহণ করেছিলেন। দেশবন্ধুর পরেই বঙ্গদেশে নেতৃত্বের স্থান ছিল বীরেন্দ্রনাথের। বীরেন্দ্রনাথের পদত্যাগের পর কাঁথি কেন্দ্রের আইনসভার আসন গ্রহণ ক'রে চিত্তরঞ্জন তাঁর সহমর্মিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের অন্যতম নেতা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী সাতকড়িপতি রায় লিখেছেন "দেশবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যাঁরা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বল্লে অত্যুক্তি হয় না।"

দেশবন্ধুর পর বীরেন্দ্রনাথ যে বাংলাদেশের নেতার পদ গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন একথা সর্বভারতীয় নেতাগণও অনুভব করতেন। ১৯২৬ সালের জানুয়ারীতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বীরেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন তার একস্থানে লিখেন :— "আপনার উদ্ধৃত দেশবন্ধুর কথা হইতে জানা যায় যে বাংলা দেশকে আপনারই চালিত করার কথা—এরূপ ব্যক্তি আপনি অনিষ্টকারীদের ভয়ে বিচলিত হইয়া কার্য্যকরী সমিতি ছাড়িয়া দিবার কথা চিন্তা করিয়াছেন ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি।" (দেশপ্রাণ শাসমল, প্রমথ নাথ পাল পৃঃ ১৩৬)। বীরেন্দ্রনাথের সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে কতকগুলি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার যোগ ছিল কাজেই মতিলালজীর এই আহ্বান ফলপ্রসূ হয় নি।

১৯২৪ সালে বাংলার রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ তীর্থ যাত্রীদের নিকট থেকে যে অবৈধ কর আদায় ক'রে আসছেন তার প্রতিবাদে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করা হবে। বাংলার শত শত যুবক এই আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারাবরণ করেন। মেদিনীপুর জেলা থেকে অনেক কর্মী আসেন ও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। নন্দীগ্রাম থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিনোদ বিহারী তুঙ্গ প্রমুখ কর্মীগণ কারাবরণ করেন এবং এর ফলে এই সময়কার রাজনৈতিক কার্য্যে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়।

১৯২৪ সালের শেষাংশে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন স্বরাজ্য দল-নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তাঁর বিশ্বাস হয় যে স্বরাজ্য দলকে একটি প্রচণ্ড আঘাত দেওয়ার জন্য ইহা আমলাতন্ত্রের একটি ষড়যন্ত্র। সে সময় ১/১১/২৪ তারিখে দেশবন্ধু শাসমলকে লিখেন—"প্রিয় শাসমল, আমরা এখন সঙ্কটের সম্মুখীন এবং তোমাকে আমার নিতান্ত দরকার। আমি আশাকরি তুমি পূব কথা ভুলিয়া ক্ষমা করিবে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার শক্তি নিয়োগ করিবে। আমাকে যে কোন দিন ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। রক্ষণশীলদল শক্তিশালী হইয়াছে। বাংলাদেশ তোমাব নেতৃত্বের আশা কবে। দাশগুপ্ত (জে. এম.) এই পত্র লইয়া যাইতেছেন। তিনি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবেন। স্নেহাসক্ত (স্বাক্ষর) সি. আর. দাস।" "চিত্তরঞ্জনের পত্র পাঠ করিয়া বীরেন্দ্র-নাথ কলকাতায় গিয়া কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু এই সময় দাসগুপ্ত মহাশয়ের একজন সঙ্গী বলেন—যদি আপনি বিপ্লববাদীদেব সহিত মিলিত না হন তাহা হইলে কংগ্রেসের কার্য্যভাব গ্রহণ আদৌ সুখদায়ক হইবে না। কাজেই বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনেব কথামত বাংলার কংগ্রেসে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আর কলিকাতা গেলেন না এবং চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া বিষণ্ণভাবে সরলান্তঃকরণে ডা. দাসগুপ্তকে বিদায় দিলেন।" (দেশপ্রাণ শাসমল—প্রমথনাথ পাল পৃঃ—১১৭)।

বাংলাব, এমনকি দেশের দুর্ভাগ্য এই যে দেশবন্ধুর সঙ্গে দেশ-প্রাণেব পুনর্মিলন ঘটল না। বীরেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। তাঁকে একটি দলীয় চক্রের কুটিল খেলার শিকার হতে হয়েছিল—নিজের দোষের জন্য নহে—গুণেরই জন্য। তাঁব ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনচিত্ততা, নিজ বিবেকানুমোদিত পথে চলাব শক্তি সবই ব্যবহাব করা হয়েছিলো তাঁর বিরুদ্ধে। দেশবন্ধু যোগ্য পাত্রে যথাযোগ্য দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর চিরপোষিত সংকীর্ণতা ও কৌলিন্যগর্ব এবং একদল রাজনৈতিক কর্মীর ক্ষমতা

অক্ষুণ্ন রাখাব চেষ্টাব ফলে যে চক্রান্তের সৃষ্টি হোল তার ফল দেশবন্ধুকে নিরুপায় ভাবে স্বীকার ক'রে নিতে হোল। পরবর্তী ঘটনা সমূহ এই দুর্দৈবের কোন প্রতিকার সাধন করতে পারলো না। যে গঠন চিন্তায় বিভোর হয়ে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুব জেলা বোর্ডের ক্ষুদ্র গণ্ডিব মধ্যে জেলার বহু কল্যাণকব কর্মের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, বিরাট কলিকাতা নগরীর কর্মভাব প্রাপ্ত হয়ে তদপেক্ষা বিপুল কর্মপ্রবাহ সৃষ্টির আশায় তিনি উন্মুখ ছিলেন— কালে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যপ্তিলাভ করবার আশাও ছিল। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণেব সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল দেশবন্ধুব আন্তরিক ইচ্ছার মধ্যে কিন্তু বীরেন্দ্রনাথকে বেদনাহত চিত্তে এক সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হতে হোল। তিনি ও মেদিনীপুরবাসী স্তব্ধ হয়ে লক্ষ্য কবলেন এই বিড়ম্বনার খেলা!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (১৯২৫, ১৯২৬)

এবপব দেশবন্ধুব ইচ্ছাক্রমে ১৯২৫ সালেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনেব ফরিদপুর অধিবেশনে বীরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী কর্মীগণকে প্রাধান্য দেওয়াব প্রয়োজন হবে বুঝে বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন। তখন দেশবন্ধু নিজেই ফরিদপুর সম্মেলনেব সভাপতির পদ গ্রহণ কবেন। দেশবন্ধুর এই সম্মেলনের অভিভাষণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা প্রস্তাবের একটী দলিল স্বরূপ হয়েছিল। অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পব গুরুতর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশবন্ধু দার্জিলিং গমন কবেন এবং সমগ্র দেশকে শোকসাগরে নিমগ্ন ক'রে সেখানেই দেহত্যাগ কবেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলন—

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"

ইহাই ছিল দেশবন্ধুর অমর আত্মার প্রতি দেশের অগণিত নরনারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

দেশপ্রাণ শাসমলের দেশবন্ধুর স্থলে বাংলার নেতৃত্বভার গ্রহণ করার সুযোগ ঘটল না বটে কিন্তু দেশপ্রাণ মেদিনীপুরের নেতৃত্ব ত্যাগ করবেন না এই ছিল মেদিনীপুরবাসীর আশা ও সান্ত্বনা।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পূর্বেই ১৯২৪ সালে বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের সদস্যপদ ও আইন সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। এই কারণে ডায়মণ্ডহারবারের আইনসভার সদস্যপদ শূন্য হওয়ায় ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় ঐ আসনে প্রার্থী হন এবং দেশবন্ধুর আহ্বানে বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেন। দেশবন্ধুর পরলোকগমনে কাঁথির সদস্যপদটী শূন্য হওয়ায় বীরেন্দ্রনাথ ঐ আসনে স্বাধীন প্রার্থী হিসাবে আইন সভায় প্রবেশ করেন।

এবার বঙ্গীয় আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল উথাপিত হয়; এই বিলটি প্রজা সাধারণের স্বার্থের অনুকূল নয় বিবেচনা ক'রে বীরেন্দ্রনাথ তমলুকের প্রধান উকীল আইনসভার সদস্য মহেন্দ্র নাথ মাইতি প্রভৃতির সহযোগে ইহার বিরোধিতা করেন।

১৯২৬ সালের ২১শে মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সহরে। বীরেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি তাঁর সভাপতির অভিভাষণে একদল বিপ্লবী কর্মীর কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকা অবস্থায় সহিংস গোপন কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিভাষণে ছিল—"আমাদের সকল কর্মী একমনে ও একপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তাঁহারা গোপনের অন্ধকারে কখনও কিছু করিতে চেষ্টা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এখনি violence (সহিংস পন্থা অবলম্বন) করা উচিত তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের সমূহ কার্য্য প্রতিষ্ঠান হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে যে কারণে হউক মার্কামারা হইয়া গিয়াছেন তাঁহারাও এই সকল কর্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিবেন।" তাঁর অভিমতের সঙ্গে সম্মেলন একমত নন এইরূপ একটী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তিনি এটিকে

তাঁর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবরূপে গ্রহণ ক'রে সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। এই ঘটনার ফলে সম্মেলনের অধিবেশনের অপ্রত্যাশিত পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯২৬ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রধান কংগ্রেসকর্মী-রূপে বীরেন্দ্রনাথের মনোনয়ন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি অনুমোদন করেন কিন্তু প্রদেশ হতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির গোপন হস্ত-ক্ষেপের ফলে এই মনোনয়নের পরিবর্তন ঘটে এবং বীরেন্দ্র নাথের স্থলে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। জেলা কংগ্রেস কমিটিতে গুরুতর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং মেদিনীপুর জেলার তিনটী আইন সভার আসনের মধ্যে সদরে বীরেন্দ্রনাথ, কাঁথিতে প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তমলুকে মহেন্দ্রনাথ মাইতি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ হতে প্রার্থী হন। বীরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেস মনোনীত দেবেন্দ্র লাল খাঁনের সহিত ও প্রমথবাবুকে মুগবেড়িয়ার জমিদার গঙ্গাধর নন্দের সহিত এবং মহেন্দ্রবাবুকে ব্যারিষ্টার রেবতীনাথ মাইতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প ভোটের ব্যবধানে বীরেন্দ্রনাথ পরাজিত হন কিন্তু প্রমথবাবু ও মহেন্দ্রবাবু নিজ নিজ আসনে জয়ী হন।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদক পদে
বীরেন্দ্রনাথ (দ্বিতীয়বার)

এই সময়ে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পুণর্গঠন হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই সময় মেদিনীপুর ত্যাগ ক'রে কলিকাতাতে ব্যারিষ্টারি করতে থাকেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্বাচনে খ্যাতনামা অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সমিতির সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে এক শ্রেণীর কংগ্রেস কর্মীগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল বীরেন্দ্রনাথ তা দূর করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন।

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণের প্রতি।"

"প্রিয় মহাশয়গণ—

গতকল্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার এক বিবৃতিতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে যদি আমি বুঝতে পারি আমি আমার কৃষ্ণনগর অভিভাষণে রাজবন্দীদের ও রাজনৈতিক নির্য্যাতিত ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ ক'রে প্রকৃত পক্ষে তাঁদের মনকে পীড়া দিয়েছি তা হলে আমি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করব। গত রাত্রে আমার কয়েকজন বন্ধু স্থানীয় রাজনৈতিক নির্য্যাতিত বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার অভিভাষণের কয়েক পংক্তি ঐভাবে অর্থ করা যেতে পারে। সুতরাং আমি কেবল দুঃখ প্রকাশ করছি তা নয়—পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার অভিভাষণের সমস্ত অংশটুকু (৮ পৃঃ-৯ পৃঃ) এবং ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠার আপত্তিকর অংশটুকু—আমাদের সকল কর্ম্মী 'একমনে' হতে আরম্ভ করে "তাঁহারা আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবেন" পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করছি। আমি বিশ্বাস করি যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং যাঁদের সহযোগিতা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন আন্দোলনে আবশ্যক, তাঁরা এতে সন্তুষ্ট হবেন।

কলিকাতা আপনাদেব

১১ই ফেব্রুয়ারী ২৯২৭ স্বাক্ষর বি. এন. শাসমল"

বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

এই পত্র প্রকাশ করা সত্ত্বেও ঐ ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অধিবেশনে বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব চারটি ভোটের আধিক্যে পাশ হয়ে যায়।

বীরেন্দ্রনাথের ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৭) তারিখের পত্রের পর কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী নেতাগণ যদি অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নিতেন এবং বীরেন্দ্রনাথের সহযোগিতা কামনা করতেন তাহলে বাংলাতে কংগ্রেসের শক্তি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেত এবং

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যেত কিন্তু বীরেন্দ্রনাথকে চির-নির্বাসনে প্রেরণ ক'রে কণ্টকহীন নেতৃত্বের আশায় যাঁরা শক্ত হয়ে রইলেন তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। তাঁরা নেতৃত্বের দলাদলিতে অনতিবিলম্বে কংগ্রেসের গুরুতর দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য ঘটনা।

বীরেন্দ্রনাথের নিকট বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রতিবন্ধকতার অর্গলে রুদ্ধ হয়ে রইল। কিন্তু যেখানে তাঁর প্রভাব মলিন হয়নি এবং যেখানে তাঁর নেতৃত্ব অবিচল প্রভায় দীপ্তিমান ছিল সেখানে তাঁকে কেউ অস্বীকার করেননি। বিপদে-আপদে সঙ্কটে মেদিনীপুর জেলার কর্মী ও জনগণ বীরেন্দ্রনাথের দ্বারাই পরিচালিত হতে চাইতেন এবং তাঁর পরামর্শ ব্যতীত এক পাও অগ্রসর হতেন না। বীরেন্দ্রনাথেব স্থান ছিল মেদিনীপুর বাসীর হৃদয় সিংহাসনে—কোন শক্তিই তাঁকে সেখান থেকে টলাতে পারেনি।

একাদশ অধ্যায়

মহাত্মা গান্ধীর মেদিনীপুরে শুভাগমন (১৯২৫)

১৯২২ সালে ছয় বৎসব কারাদণ্ড ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণ ক'রে গান্ধীজী যার্বেদা জেলে প্রবেশ করেছিলেন। প্রথমে তাঁকে জেল কর্তৃপক্ষের চরকা দিতে অস্বীকৃতি এবং অন্যান্য কয়েকটি অসুবিধার নিরসন হওয়ার পর তিনি তাঁর দৈনন্দিন প্রার্থনা সুতাকাটা, পুস্তক পাঠ প্রভৃতি কাজে মগ্ন থেকে সময়েব পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে থাকেন এবং ৭ বৎসরের নিরবিচ্ছিন্ন দেশভ্রমণ ও কর্মানুসরণজনিত ক্লান্তির পর বিশ্রামের সুযোগ লাভ ক'রে সুস্থতা বোধ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, গান্ধীজীর 'arrest cure' সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে এপেণ্ডিসাইটিস

রোগে আক্রান্ত হন ও পুণার সেশুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তারপর তিনি বোম্বাইএব নিকটবর্তী জুহুর সমুদ্রোপকূলে স্বাস্থ্য লাভের জন্য কিছু সময় কাটিয়ে ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। এই সময়েব মধ্যে দাস নেহরু-গান্ধী চুক্তি নামে সুপরিচিত দলিলটি সম্পাদনের ফলে স্বরাজ্য দল নিরঙ্কুশ ভাবে কংগ্রেসেব নামে কাউন্সিল প্রবেশ কর্মধারা অনুসরণ করতে থাকলেও তিনি গঠনমূলক কার্য্যে অবিচলিত বিশ্বাসের কথা জ্ঞাপন ক'রে কার্য্য করতে থাকেন এবং দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুর জেলার কর্মীগণ বেলগাঁও কংগ্রেসের চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে কাজ করতে থাকেন। মেদিনীপুরের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি কাউন্সিলে প্রবেশ করার জন্য কোন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়নি এবং সর্বত্র গঠনমূলক কর্মধারাকে সফল করার জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। ১৯২৫ সালেব ৭ই জানুয়াবী কাঁথির সরস্বতী তলাতে অনুষ্ঠিত জনসভাতে বেলগাঁও কংগ্রেসের কর্মসূচী আলোচিত হয় এবং কংগ্রেস নেতা সাতকড়িপতি রায় মহাশয় বেলগাঁও কংগ্রেসের বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে বক্তৃতা করেন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় কৃষ্ণ মাইতি প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীগণ দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে জেলার কর্ম্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আবেদন জানান।

অকস্মাৎ ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেহাবসান ঘটে। গান্ধীজী তাঁর ঘনিষ্ঠতম মহান সহকর্মীর বিয়োগব্যথা বহন করেও একদিনও কর্মবিমুখ থাকেননি। তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট কার্য্যক্রম অনুবর্তন ক'রে তিনি মেদিনীপুর জেলাতে আগমন করেন। ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে সভানুষ্ঠান হতে থাকে সুদূর গ্রাম পর্য্যন্ত। মানুষের প্রাণ মহান নেতা চিত্তরঞ্জনের জন্য বেদনায় কাতর হয়ে উঠেছিল।

১৯২৫ সালের জুলাইতে মেদিনীপুর জেলার জন্য মহাত্মা গান্ধীর একটি ভ্রমণসূচী নির্দিষ্ট ছিল। এই সময়ে কংগ্রেসের কার্য্যসূচী ছিল —গঠন মূলক কার্য্য। মেদিনীপুর জেলাতে চরকা ও খদ্দর, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সালিশ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রভৃতি গঠনমূলক কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে চলছিল। মেদিনীপুরের এই কর্মোদ্যম ছিল গান্ধীজীর প্রধান আকর্ষণ।

১৯২৫ সালের ৪ঠা জুলাই থেকে ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত তাঁর কর্মসূচী রাখা হয়—কাঁথি, মেদিনীপুর (সহর) ও খড়্গপুরে জন্য।

তিনি ৪ঠা জুলাই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে খড়্গপুর থেকে মোটর গাড়ী যোগে কাঁথি পৌঁছেন রাত্রি প্রায় ১০ টায়। তাঁর গাড়ীর সঙ্গী ছিলেন স্বনাম প্রসিদ্ধ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য কাঁথি প্রবেশের মুখে যে সব ব্যবস্থা ছিল সতীশবাবু সেগুলো এড়িয়ে নিদ্রিত গান্ধীজীকে সরাসরি কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে নিয়ে উপস্থিত হন। গম্বুজের মত নির্মিত বিদ্যালয়ের দোতলার একটি প্রকোষ্ঠে তাঁকে রাখা হয়। সেই কামরাতে প্রবেশ মাত্রই সতীশবাবু তাঁর পাখাওয়ালা চরকাটি (তখনও বাক্স চরকা হয়নি) সাজিয়ে দিলেন এবং তিনি চরকা কাটতে মন দিলেন। সে সময় পর্য্যন্ত তাঁর প্রাত্যহিক চরকা কাটার কর্তব্য সম্পন্ন না হওয়ায় চরকা ব্রতধারী গান্ধীজী সেই কার্য্য শেষ করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন সেখানে যে কয়েকজন কর্মী ছিলেন তাঁদের নিকট তিনি খদ্দর ও জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন। তাঁকে জানান হল জাতীয় বিদ্যালয়ে এতদিন মিলের সূতা টানা দিয়ে ও চরকার সূতা পোড়েন দিয়ে 'অর্দ্ধ খাদি' বোনা হত কিন্তু বিদ্যালয়ে তাঁর আগমন সূচী নির্দিষ্ট হওয়ার দিন থেকে টানা ও পোড়েন উভয় দিকেই চরকার সূতা ব্যবহার ক'রে খদ্দর বোনা হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে গান্ধীজী তাঁর 'Young India' পত্রিকাতে লিখেছিলেন- -"Half Khadi is no Khadi" কর্মীদের অকপট উক্তিতে তিনি কতটা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলা কঠিন কিন্তু তাঁর নিকট কোন অসত্য উক্তি করা নিশ্চয় সম্ভবপর

ছিল না। তাঁর জন্য যে বসবার আসন (ছোট গদি) ঠেস দেওয়ার মোটা বালিশ (তাকিয়া) তোষক, বিছানার চাদর ও মশারি প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আমাদের কয়েকজন কর্মীর বিশেষতঃ মহিলা কর্মীর হাতে কাটা সূতা শুনে তিনি বলেছিলেন—তোমরা খুবই সরু সূতা কাট ("you spin exceedingly fine yarn)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরবৎসর গান্ধীজী কাঁথি মহকুমার

বালেশ্বরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রস্তুত কয়েকখানি খদ্দরের বস্ত্র উপহার দেন। শ্রীমতী কস্তুরবার জন্য বাঙ্গালী প্যাটার্ণের একখানি শাড়ী উপহার দিলে তাঁর অভ্যস্ত হাস্য সহকারে তিনি বলেন—'কস্তুরবা সর্ব্বজনীন হয়ে উঠেছেন (She has become cosmopolitan)।' দীনবন্ধু এণ্ডুজ জাতীয় বিদ্যালয়ে বুনা ও লাল রং করা উপহার প্রদত্ত থান একখানি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্য রেখে বলেন—"গুরুদেব এই রং খুব ভালবাসেন। আমি তাঁকে এই থান খানি দিব।" এণ্ডুজ মহোদয়কেও আমরা কিছু খদ্দর উপহার দিলাম। মহাত্মাজী খুশি হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। যখন তাঁর আশীর্বাদ চাওয়া হল তিনি স্মিতহাস্যে বল্লেন—"তোমরা যতটা সময় চেয়েছিলে তার বেশি সময় দিয়েছি।"

কাঁথিতে ৫ই জুলাই, রবিবার তাঁর কর্মবহুল দিনটি আরম্ভ হল সকাল ৬টায়। সকালের মধ্যে কাঁথি এসে পড়লেন বিহারের বিখ্যাত জননায়ক ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, অন্যতম নেতা মথুরা প্রসাদ সমভিব্যাহারে। গান্ধীজী রাত্রি ৩॥ টায় জাগ্রত হয়ে তাঁর অভ্যস্ত প্রার্থনা ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং নিম্নলিখিত কর্মসূচী আরম্ভ করলেন। বিকালের জনসভা ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছিল কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে। সকাল ৬টায় চরকা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, ৭টায় অস্পৃশ্যতা বর্জন সভা, ৮টায় ছাত্র সভা ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ, বিকাল ২॥টায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত সামাজিক সমস্যার আলোচনা; বিকাল

৩ টায় মহিলা সভা ও চরকা প্রতিযোগিতা এবং বিকাল ৪॥ টায় দারুয়া ময়দানে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হল।

ইহাই কাঁথিতে গান্ধীজীর প্রথম পদার্পণ। যাঁর নামে ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আবেগকম্পিত, যাঁর আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে নগরে পল্লীতে-গ্রামে, প্রতি নরনারীর নিকট যাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে উঠেছে, যাঁর বাণী ভারতবাসী মাত্রেরই ধ্যান-ধারণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর দর্শন কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সেজন্য কাঁথির দারুয়া ময়দানের জনসভায় অগণিত মানুষের সমাবেশ। তখনও মাইকের প্রচলন হয় নি। গান্ধীজীর গাড়ী দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র উঠল বিপুল জয়ধ্বনি—পরক্ষণেই পরিপূর্ণ নীরবতা—সূচটী পড়লেও শব্দ শোনা যাবে এরূপ গভীর নীরবতা।

প্রথমে গাওয়া হল খেজুরীর যুবক কংগ্রেসকর্মী চুনিলাল মণ্ডল রচিত সঙ্গীত ঃ—

"সুক্ষণে যাঁর পরিমল দ্যুতি মহিমা রাগের আলোকস্পর্শ
পাইয়া পুলকে উঠিল শিহরি, দুঃখিনী জননী ভারতবর্ষ '
বিশ্বের শির বিনয়ে নত, ভরিল শ্রদ্ধায় মানবপ্রাণ;
গগন ভূধর স্পন্দিত করি, উঠিছে তাঁহার বিজয় গান ॥
গাও আজি সবে বিশ্ববন্দ্য সত্যসন্ধ গান্ধীর জয়;
স্বাধীনতা যাগে যাজ্ঞিক ঋষি পুরুষোত্তম মহিমাময়।
লঙ্ঘি সুনীল জলধি যাহার, ঝলসি উঠিল মহিমা লোক
শুভ আগমন বার্তা যাহার দিল অপসরি দুঃখ শোক,
অহিংসাসাধন শাস্ত্রের বলে, হিংসাদণ্ড করি যে দূর
অন্যায়ে দেখায়ে বিজয় ডঙ্কা, মরণ শঙ্কা করিল দূর।
গাও আজি সবে বিশ্ববন্দ্য, সত্যসন্ধ গান্ধীর জয়!
স্বাধীনতা যাগে যাজ্ঞিক ঋষি, পুরুষোত্তম মহিমাময়
বাঁধিল ঐক্যে হিন্দু-মুসলমান, বরষি হৃদয়ে দেশাত্মবোধ,
প্রেমের পুণ্য বাণীতে যাহার, অস্পৃশ্যতা হইল রোধ

চরকা যাহার ঘর্ঘর রথে, ঘরে ঘরে আজ জোগায় প্রাণ।
খদ্দর ব্রতে দিল যে ঘুচায়ে ইতর ও ভদ্র এ ব্যবধান।
গাও আজি সবে বিশ্ববন্দ্য, সত্যসন্ধ গান্ধীর জয়।
স্বাধীনতা যাগে যাজ্ঞিক ঋষি, পুরুষোত্তম মহিমাময়।”

বিপুল জনতার অন্তরের আকুতি ধ্বনিত হল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়। তারা উৎকর্ণ হয়ে শুনল কটিবাস পরিহিত অপূর্ব দর্শন গান্ধীজীর বাণী গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে।

গান্ধীজী প্রধানতঃ সদ্যপ্রয়াত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথাই বললেন। দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণের (১৬ই জুন) তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি কাঁথি আসেন। দেশবন্ধুকে তিনি স্বরাজ সাধনায় তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ পেয়েছিলেন। ত্যাগের মহিমায় দীপ্তিমান এইরূপ শক্তিমান নেতা যে কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের প্রাণশক্তির উৎস হয়ে দাঁড়ান। মহান দেশবন্ধুকে হারিয়ে গান্ধীজী কতটা বেদনাক্লিষ্ট হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। গান্ধীজীর প্রাণস্পর্শী ভাষা জনগণকে কর্তব্যপথে উদ্বুদ্ধ করেছিল—তা সন্দেহাতীত।

সন্ধ্যার পূর্বেই মোটর গাড়ী যোগে গান্ধীজীকে কাঁথি ত্যাগ করতে হল কাঁসাই নদীতে বন্যা থাকার জন্য। খড়্গপুর থেকে তিনি ট্রেনযোগে মেদিনীপুর পৌঁছেন। মহাত্মাজীর এবারকার মেদিনীপুর সহরে শুভাগমন ঘটেছিল প্রধানতঃ কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁনের চেষ্টায়। দেশবন্ধুর মৃত্যুরপর বঙ্গীয় আইন সভার নেতৃত্ব, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদ এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদে কে আসীন হবেন তা নির্দ্ধারণের জন্য মহাত্মাজীর কলিকাতা আগমন অনিবার্য্য হয়ে পড়েছিল। কুমার দেবেন্দ্র লাল এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে গান্ধীজীকে মেদিনীপুরে আনার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৫ই জুন, ১৯২৫ দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের সংবাদ মহাত্মাজীর নিকট পৌঁছে তাঁর খুলনা ভ্রমণের সময়। তিনি সেখানকার কার্য্যসূচী বাতিল ক'রে কলিকাতা ছুটে আসেন এবং দেশবন্ধুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। স্থির হয় যে দেশবন্ধুর বাসগৃহ দেশবন্ধুর

স্মৃতিতে একটি হাসপাতালে পরিণত করা হবে ; নামকরণ করা স্থির হয় "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন"। গান্ধীজী এই স্মৃতি-ভবন প্রতিষ্ঠার জন্যে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের সঙ্কল্প করেন। মেদিনীপুরেও তাঁর এই উদ্দেশ্য ছিল।

গান্ধীজী যখন খড়্গপুর থেকে ট্রেনযোগে মেদিনীপুর ষ্টেশনে পৌঁছলেন—তখন রাত্রি হয়ে পড়েছিল। কাজেই তাঁকে সেখান থেকে সরাসরি গোপ প্রাসাদে নিয়ে গেলেন কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁন ও তাঁর ভ্রাতা কুমার বিজয়কৃষ্ণ খাঁন। মেদিনীপুর ষ্টেশনে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। জন সমাগমও কম হয়নি।

পরদিন সকালে সরাসরি মেদিনীপুর সহরস্থ নাড়াজোল রাজ-কাছারিতে অস্পৃশ্যতা বর্জন, হরিজনগণের মন্দির প্রবেশের অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত একটি আলোচনা বৈঠকে গান্ধীজী মিলিত হন। সেখানে অনেক বাদানুবাদ হয়। মহাত্মাজী বলেন যে তিনি বহু হিন্দু শাস্ত্র পড়েন নি এবং সে অবসরও তাঁর হয় নি। তিনি এইটুকু মাত্র বলেন যে, যে ভগবান ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেছেন সেই ভগবানের সৃষ্ট হরিজনগণকে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত ও অস্পৃশ্য ক'রে রাখার কোন অর্থ নাই। হরিজনকে অশিক্ষিত ও নোংরা ক'রে রাখার জন্য তথাকথিত উচ্চজাতিগণ কি দায়ী নন? হরিজনগণ সমাজে চিরঅভিশপ্ত জীবন যাপন করেন ইহা কখনও ভগবানের অভিপ্রেত হতে পারে না। তাঁর হৃদয়স্পর্শী আবেদন ও সারগর্ভ যুক্তির ফলে বহু অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

ছাত্র সভায় তিনি ছাত্রগণকে দেশবন্ধুর প্রিয় পল্লী সংগঠন কার্য্যে যোগদানের আবেদন জানান এবং চরকায় নিয়মিত সূতা কাটার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন।

অপরাহ্নে রাজকাছারির দ্বিতলের ছাদে একটি মহিলাসভার অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংখ্যক মহিলা মহাত্মার দর্শন ও বাণী শ্রবণের জন্য উৎসুক হয়ে সভায় যোগদান করেন। মহাত্মাজী

তাঁদের নিকট দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে পরিকল্পিত "চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের" জন্য অর্থ ভিক্ষা করেন। মহিলাগণ এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সাধ্য মত অর্থ দান করেন।

কাছারিবাড়ীর নিম্ন তলার বারান্দাতে চরকায় সূতা কাটার একটি প্রদর্শনী হয়। প্রায় চার ঘণ্টা কাছারিবাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভা হল। মহাত্মাজীকে সহরবাসীর পক্ষে কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁন, উকীল সভার পক্ষে উপেন্দ্রনাথ মাইতি, পৌর সভার পক্ষে মন্মথ নাথ বসু, জেলাবোর্ডের পক্ষে বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, বিধবা বিবাহ সমিতির পক্ষে ভাগবত চন্দ্র দাস, মোক্তার সভার পক্ষে চারু চন্দ্র সেন, অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের পক্ষে কুমার চন্দ্র জানা, ঝাড়গ্রাম আদিবাসীদের পক্ষে শৈলজানন্দ সেন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। মহাত্মাজী জনমণ্ডলীর নিকট চরকা ও খদ্দর গ্রহণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদক দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি কার্য প্রণালী অনুষ্ঠানের জন্যে আহ্বান জানান। তিনি বলেন—"আমি যে জনতার সম্মুখীন হইব তাঁহাদিগকে খদ্দর পরিহিত দেখিতে আমার ইচ্ছা হয়।"

বলা বাহুল্য মহাত্মাজীর দর্শন লাভ ক'রে ও তাঁর বাণী শ্রবণ ক'রে জনগণ এক নূতন প্রেরণা লাভ করেন। রাত্রির আহারের পর তিনি গিয়ে ট্রেনের কামরায় শয়ন করেন ও সময়মত বাঁকুড়া যাত্রা করেন।

জেলাতে গঠন কার্য্য

নিমতৌড়ি পল্লী সংস্কার কেন্দ্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাংলার গ্রামগুলির দুর্দশা দেখে চিরদিনই অত্যন্ত কাতর হতেন। ১৯১৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি রূপে বলেছিলেন—"কিন্তু কেন, দেশ আছে দেশের আদর্শ চলিয়া গেল, জাতি আছে, জাতির প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি ভাসিয়া গেল। সে গ্রাম নাই কেন? পল্লী নাই কেন? বাঙ্গলার যে শত শত গ্রাম লইয়া শত শত সমাজ ছিল সে সমাজ নাই কেন? খর্ব, নগ্ন, স্বাস্থ্যহীন রুক্ষ্ম কেশ কংকালসার প্রাণীর দল ক্ষয়গ্রস্ত মরণাহত পশুর মত পানা পুকুরের ধারে পথে পড়িয়া ধুঁকিতেছে কেন? আজ যে বাঙালীর মেয়ে

আধপেটা খাইয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে চোখের জল চোখে শুকাইতেছে তাহার কথা ভাবিনা কেন?

আবার পল্লীগ্রামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইবে, অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করিতে হইবে, বনজঙ্গল পরিস্কার করিতে হইবে, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং চাষীকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ করিবে কে? রাজ সরকার না আমরা? আমাদেরই করিতে হইবে। এই আমাদের কাজ। আর এই কাজে সকলকে ডাকিতে হইবে। ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক, ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ, জাগ, ডাক, আপনার কল্যাণকে জাগাও! বল এসো ভাই, তুমি মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি। এযে আমার কাজ এযে তোমার কাজ, এযে মায়ের কাজ!"

১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের সংগে কতকগুলি বিষয়ে দেশবন্ধুর মতভেদ ছিল এবং ডিসেম্বরের নাগপুর অধিবেশনে তিনি কতকগুলি বিষয় সংশোধনের আশা করছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নাগপুরের প্রস্তাব তাঁর মনোমত না হলে তিনি কি করবেন? তাতে তাঁর দ্ব্যর্থহীন উত্তর ছিল যে তিনি গ্রাম সংগঠনে আত্মনিয়োগ করবেন।

নাগপুরের পর অসহযোগী কংগ্রেস নেতা এবং গয়া কংগ্রেসের পর স্বরাজ্য দলের নেতা ও সংগঠক কর্তা হিসাবে প্রাণপাত পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকতে হলেও তিনি পল্লী পুনর্গঠনের কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর জীবনাবসানের পূর্বেই পল্লী সংস্কার কার্য্যের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর

নামাঙ্কিত 'দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির' কার্য্য পরিচালনার জন্ম কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয় ;—মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমাতে কেন্দ্র খোলা হয় :—নিমতৌড়ি কেন্দ্র তাহার অন্যতম।

এই কেন্দ্রটি খোলা হয় ১৯২৫ সালে। ভারপ্রাপ্ত কর্মী নিযুক্ত হন অজয় কুমার মুখার্জী। প্রধান কর্মী ছিলেন—সতীশচন্দ্র সামন্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দাস ও ভবতোষ দাস। তাঁরা কেন্দ্রেই বাস করতেন এবং স্বহস্তে রান্নায় যে অতি সাধারণ খাদ্য প্রস্তুত হত তা দিয়ে কম খরচে তাঁরা দিন চালাতেন। গ্রামের প্রধান অসুবিধাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা কাজ আরম্ভ করেন। গ্রামবাসীগণ নিজেরা যাতে আগ্রহশীল হয়ে কর্মীদের সঙ্গী স্বরূপ কাজ হাতে নেন এই দিকে তাঁরা বিশেষ লক্ষ্য রাখেতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি করা একটি কঠিন কাজ ছিল। গ্রামোন্নয়ন কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাঁরা গ্রামবাসীগণের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্যতম কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ দাসের প্রাণ খোলা মেলামেশা এ বিষয়ে খুব কার্য্যকারী হয়েছিল। গ্রামবাসীদের নিয়ে এঁরা তাদের সান্ধ্য আসর জমিয়ে তুলতেন, সেখানে তামাক এবং হুঁকার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কর্মীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর দূরত্বের ভাব লোপ পেয়ে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির ফলে তাঁরা কর্মীদের বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠেন। এখন থেকে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মিটাবার জন্য কেন্দ্রের কার্য্যালয়ে চলে এসে কর্মীদের সাহায্য নিতেন। কর্মীরাও গ্রামের মধ্যে গিয়ে সালিশ মীমাংসার কাজ করতেন। কেন্দ্রের সহায়ক কর্মী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ জানা (মহিষাদল ভাণ্ডার বেড়িয়া) যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক (ভগবানপুর থানা), যতীন্দ্রনাথ সামন্ত (সোনামুই), রাখালচন্দ্র মাইতি (গণপতি নগর)। নিমতৌড়ী গ্রামের কর্মী ছিলেন—সত্যসরণ জানা, মাধব চন্দ্র জানা, তরণী চরণ জানা ও কৃষ্ণ বিহারী জানা। পার্শ্ববর্তী উত্তর নারকেলদা গ্রামের নিতাই চরণ হুতাইৎ ও শ্যাম চন্দ্র ভৌমিক এবং উত্তর সাঁওতাল-চক গ্রামের বিপিন দাস অধিকারী (মোহান্ত) ও ব্রজমোহন কর।

কেন্দ্রের কাজ কিছুদিন চলার পর কেন্দ্রের অন্যতম কর্মী ধীরেন্দ্র নাথ দাস দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি পরিচালিত দমদম ট্রেনিং ক্যাম্পে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষণীয় বিষয় ছিল নিম্নরূপ (১) ফাষ্ট এড্ বা প্রাথমিক সাহায্য দান, বিখ্যাত ডাঃ ইউ. এন্, ব্রহ্মচারী বিস্তারিত ভাবে এই বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন, (২) অগ্নিকাণ্ডে সাহায্য দান—ঘরে আগুন লাগলে প্রথমে কিরূপে কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কিরূপে উদ্ধার কার্য্যাদি চালাতে হবে কলিকাতা করপোরেশনের দমকল বিভাগ সেই কৌশলগুলি শিখাতেন; (৩) লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, কুস্তি, যুযুৎসু প্রভৃতি শিখাতেন ফরিদপুরের বিখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস; (৪) ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা শেখাতেন স্বনাম-খ্যাত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। মধ্যে মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ট্রেনিং ক্যাম্পে এসে বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মতবাদের বিবর্তন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে ফিরে গিয়ে ধীরেনবাবু পুনরায় সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং কেন্দ্রের কার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত হন।

কেন্দ্রের কার্য্যে আকৃষ্ট হয়ে যুবকরা কেন্দ্রে আসতে থাকলে তাদের মধ্যে আক্ষরিক শিক্ষা চালাবার চেষ্টা হতে লাগল এবং দ্রুত ফল পাওয়া গেল। শীঘ্রই নৈশ বিদ্যালয়টি জমে উঠল। পাঠার্থীরা বিদ্যার স্বাদ কিছু কিছু পেতে লাগল। অজয়বাবু, সতীশবাবু, ভবতোষবাবু, ধীরেনবাবু সবাই নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ানোর অংশ নিয়ে পাঠার্থীদের মনের খোরাক যোগাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে হরি পূজা, সংকীর্ত্তন ইত্যাদির আনন্দ গ্রামবাসী পুরুষ স্ত্রী—বালক বালিকা সবাই মিলে উপভোগ করতে লাগলেন। তমলুক লোক্যাল বোর্ডের পরিচালক কংগ্রেস নেতা বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক, বিধু ভূষণ হাইত প্রভৃতি পানা-পুকুরাদি পরিষ্কার বাবদ টাকা মঞ্জুর করতেন। পানীয় জলের অভাব পুরণের জন্য একটি নূতন পুষ্করিণীও খনন করা হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে পল্লী-সংস্কার-সমিতির কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল

গ্রাম সাফাই, পানাপুকুর খানা ও ডোবা, রাস্তাঘাট এবং ঝোপঝাড় পরিষ্কার ক'রে স্বাস্থ্যকর অবস্থা প্রবর্তন। এইসব কাজে সমিতি প্রচুর যত্ন নিতেন।

বিনামূল্যে চিকিৎসা—সমিতির অন্য একটি প্রধান কার্য্য ছিল। তমলুকের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যামিনী মোহন সিংহ মহাশয় প্রত্যহ সকালে তমলুক থেকে এসে ডাক্তারখানা খুলে বসতেন এবং সমাগত রোগীদের রোগ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিতেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র লাল মাইতিও চিকিৎসা কার্য্যে অংশ গ্রহণ করতেন। কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ও আরোগ্যমূলক ঔষধও কেন্দ্র থেকে দেওয়া হত। ঐসব রোগের প্রাদুর্ভাব হলে সমিতির কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে যথাসাধ্য রোগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় মধ্যে মধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে কেন্দ্রের অন্তর্গত গ্রামগুলিতে এসে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর 'দেশের ডাক' বক্তৃতা গ্রামবাসীগণের পক্ষে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হত। সমিতির কর্মীরাও গ্রামবাসীদের নিকট প্রচার কার্য্য চালিয়ে দেশের অবস্থা ও তার প্রতিকারের পথ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগকে সজাগ করে তুলতেন।

সমিতির কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হল নিমতৌড়ীর পার্শ্ববর্তী কুলবেড়িয়া, গণপত, উত্তর নারিকেলদা, সাওতান চক্ প্রভৃতি গ্রামে। এই সব গ্রামে যুবকদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠিত হয়েছিল। এই বাহিনী ১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৪২ সালের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। তার প্রধান ভার ছিল কেন্দ্রের অন্যতম কর্মী সতীশচন্দ্র সামন্তের উপর। পরে কাকগেছ্যা গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ জানা মহাশয় ঐ ভার গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়টিতে মধ্য ইংরাজী ষ্ট্যাণ্ডার্ড (৬ষ্ঠ শ্রেণী) পর্য্যন্ত পড়ান হত। বিদ্যালয়ের জন্য একটি নূতন গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল।

এই কেন্দ্রের কাজ ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত পূর্ণ

উদ্যমের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। তারপর এসেছিল ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নিমতৌড়ী পল্লী-সংস্কার-কেন্দ্রের অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল।

১৮ দফা গঠনমূলক কার্য্য

গঠনমূলক কার্য্যগুলিকে যে ১৮ দফা কর্মসূচীতে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলি ছিল—(১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন (৩) মাদকতা নিবারণ (৪) খাদি (৫) অন্যান্য গ্রামীন শিল্প (৬) গ্রাম স্বাস্থ্য (৭) বুনিয়াদি শিক্ষা (৮) বয়স্ক শিক্ষা (৯) নারী জাতির উন্নয়ন (১০) স্বাস্থ্য ও শরীর তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা (১১) প্রাদেশিক ভাষা (১২) রাষ্ট্রভাষা (১৩) আর্থিক সমতা (১৪) কৃষক (১৫) শ্রমিক সংগঠন (১৬) আদিবাসী (১৭) কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ (১৮) ছাত্র সংগঠন।

মেদিনীপুর জেলার কর্মীগণ গঠনমূলক কার্য্য পদ্ধতির প্রচার ও প্রবর্তন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায় বাংলার কোন একটি জেলাতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে এতগুলি গঠন কর্ম সংস্থার উদ্ভব হয়নি। কোন কোন কার্য্যের জন্য হয়ত বিশেষ সংস্থা গঠিত হয়নি কিন্তু নির্দিষ্ট কার্য্যক্রম বিশেষ নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হত।

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস কর্মীগণ কংগ্রেস কার্য্য হিসাবেই গঠন কার্য্যগুলির অনুসরণ করতেন—এইগুলিকে পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত কর্মীদের কার্য্য বা কর্তব্য হিসাবে দেখতেন না। আইন অমান্য কার্য্যক্রম নিবিড়ভাবে অনুসৃত হতে থাকে। গঠন কার্য্যে নিযুক্ত—বিশেষভাবে খাদি কার্য্যের কর্মীগণকে সাধারণতঃ কারাবরণের জন্য আহ্বান করা হত না এবং এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজও পৃথকভাবে রাখা হত। তথাপি জেলাতে কখনও এই দুই বিভাগের মধ্যে কোন দুর্ভেদ্য অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর স্থাপনের চেষ্টা করা হয়নি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে চরকা

খাদি কার্য্য, সকল কংগ্রেস কর্মীর অবশ্য করণীয় কর্তব্যের অঙ্গীভূত ছিল। তাঁরা খাদিকে স্বাধীনতাকামীর প্রতীক পরিচ্ছদ (livery of freedom) হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বরাজ ও সংগঠন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন যিনি কলেজ জীবনে সরকারী বৃত্তি ত্যাগ ক'রে দারিদ্রকে অগ্রাহ্য ক'রে অসহযোগ ব্রতী হয়ে কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করেছিলেন তাঁর বিবৃতিতে পাই— তিনি প্রথমে চরকা ও তাঁত শিক্ষা করেন—মেদিনীপুরে জেলা কংগ্রেস কার্য্যালয়ে পরিচালিত চরকা ও তাঁত শালায়। তারপর ডেবরা থানাতে তাঁর স্বগ্রামে এসে যে গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম দেওয়া হয়েছিল—'কংগ্রেস'। সেখানে চরকা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সালিশ, কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ ইত্যাদি কংগ্রেসের নির্দিষ্ট বিভিন্ন গঠন কার্য্য ও সাংগঠনিক কার্য্য চলত। নগেনবাবু দীর্ঘদিন জেলা কংগ্রেস কমিটি ও সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির অন্যতম কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে তাঁদের প্রতিষ্ঠানটি রেজেষ্ট্রীকৃত সংস্থা হিসাবে 'আলোক কেন্দ্র' নামে পরিচালিত হচ্ছে এবং সেখানে খাদি কার্য্য সহ "সর্বোদয়" ও "গ্রাম স্বরাজ" সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মধারা অনুসরণ করা হচ্ছে।

যে কোন জনসভার প্রারম্ভে কংগ্রেস কর্মীগণ সূত্রযজ্ঞের ব্যবস্থা ক'রে এবং চরকার গান গেয়ে জনগণকে চরকার প্রতি আকৃষ্ট করতেন। গান্ধীজী চরকাকে 'নূতন প্রাণ ও নূতন অর্থ দিয়ে ভারতে স্বরাজ সাধনার যন্ত্ররূপে উপস্থাপিত করেছিলেন।' এই প্রসঙ্গে আমরা বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা রতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ করি। 'গ্রামে ও পথে' গ্রন্থ—"প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে, ভারতবর্ষ যখন পতনের মুখে তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল। কিন্তু চরকাই ছিল, চেতনা ছিল না। বহুলক্ষ চরকার দ্বারা, বহুলক্ষ লোকের মন তখন স্বরাজ সাধনের ক্ষেত্রে একসূত্রে গ্রথিত হয় নাই। চরকার মধ্যে তখন সত্যের আহ্বান ছিল না, ত্যাগের প্রেরণা ছিল না, সেবার

আকুতি ছিল না, প্রেমের সুর ছিল না, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ছিল না। তাই বহুলক্ষ চরকার আবর্তন অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত হইতে তখন দেশকে বাঁচাইতে পারে নাই।

আজ দেশে ঘরে ঘরে চরকা এখনো চলে নাই—তবুও কর্মীর হাতের চরকায় আজ কি নূতন সুর লাগিয়াছে। 'এক সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন'—আজ সহস্র হস্তের স্পন্দনে চরকায় যে সুর জাগিয়াছে, সেই সুরে নবজীবনের সঙ্গীত গীত হইতেছে। চরকা নয়, ব্যক্তিকে স্বীকার করিয়া—মানুষকে মর্যাদা দিয়া—চরকা আজ বহু গ্রাম শিল্পের মধ্যমণি। চরকা গৃহহারাকে কারখানা ঘর হইতে গৃহে আহ্বান করিতেছে। চরকা জনগণের মনের রাস্তাকে খুলিয়া দিয়াছে। চরকা কেন্দ্র দেশে নূতন ভাব ও নূতন কর্মের কেন্দ্রে পরিণত হইতেছে। নাম জপের মতো আলোক ও বাতাসের মতো চরকা সর্ব সাধারণের। প্রতিযোগিতার প্রাণান্তকর পথ হইতে চরকা সহযোগিতার আনন্দময় পথে আহ্বান করিতেছে। চরকা শোষণহীন শ্রমের প্রতীক, তাই অহিংসার দ্যোতক। যন্ত্রাসুরের পদভরে আজ মেদিনী কম্পমানা; যন্ত্রসভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ভীষণ আত্মঘাতের দিন বুঝি ঘনাইয়া আসিতেছে। এই ভয়ঙ্করের পটভূমিকায় চরকার কল্যাণময়ী মূর্তি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং চরকার মধ্যে যাঁহারা নবজীবনের গান শুনিয়াছেন তাঁহারা তো মিথ্যা শুনেন নাই।"

১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী জলপাইগুড়িতে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে যে স্মরণীয় উপদেশটি দেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল; 'খাদি ও চরকার কথা' সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত—(পৃ: ৪০):—"তোমরা বলো চরকা কাটায় মজা কোথায়? আমি জিজ্ঞাসা করি, গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করো তো, কলমা পড়ো তো, তাহাতে মজা কোথায়? কিন্তু তোমরা তাহা করোতো? কর্তব্য বোধে করো। এটিও তেমনি কর্তব্য বোধ হইতে করিতে হয়। ইহা ধর্মময় অনুষ্ঠান হিসাবে করিতে হয়। ভারতমাতা মরিতে বসিয়াছেন। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িতা। তোমরা কি কখনও মৃত্যুশয্যাশায়ী মানুষ দেখিয়াছ? লক্ষ্য করিয়াছ?

মৃত্যুর পূর্বে পা স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছ ? তোমরা দেখিবে তখন পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। হয়তো বা তখনও মাথায় হাত দিয়ে দেখিবে যে, তখনও একটু সরস আছে আর মনে সান্ত্বনা আনিবে যে লোকটা এখনও মৃত্যুর কবলে পুরাপুরি পড়ে নাই। তবে প্রাণ পদার্থতো বাহির হইয়া যাইতেছেই। ঠিক তেমনই ভারতের অসংখ্য জনসাধারণ। ভারতমাতার পায়ের মতো তাহারা। তাহারা হিম হইয়া গিয়াছে। অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। যদি ভারতমাতাকে তোমরা বাঁচাইতে চাও আমি যে সামান্য একটু কিছু করিতে বলি—তাহা তো করো, আমি এখনও সাবধান করিয়া দিতেছি। সময় থাকিতে চরকা ধরো, নচেৎ ধ্বংস অবধারিত।"

গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের উত্তরে লিখেছিলেন—"আমি তো কাহাকেও নিজ ব্যবসা ও উপার্জনের পন্থা ত্যাগ করিতে বলি নাই, বরঞ্চ আমি বলিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদেব ব্যবসাকে অলঙ্কৃত করুন, শুধু দৈনিক আধঘণ্টা সূতোকাটায় দিন—দেশের সেবায় যাজ্ঞিক কার্য্য হিসাবে। তবে যাহারা, যে স্ত্রী লোকেরা কর্মাভাবে অনাহারে থাকে, অথবা যাহাদের হাতে একেবারে কোন কাজ নাই, তাহারা জীবিকার জন্যই চরকা কাটুক। আর যে কৃষক আধপেটা মাত্র খাইতে পায়, সে আয় বাড়াইবার জন্য যত পারে চরকাতে সূতা কাটুক। কবিও যদি দৈনিক আধঘণ্টা চরকা কাটেন তবে তাঁহার কবিতা আরও মনোমুগ্ধকর হইবে। তখন কবিতার ভিতর দিয়া আরও ভালো করিয়া দরিদ্রের দৈন্যের করুণ কথা ফুটিয়া উঠিবে।" গান্ধীজীর নিকট চরকা ছিল তাই অহিংসার আদর্শ সঞ্জীবিত গ্রাম জীবনের কেন্দ্র বিন্দু। ইহাই ছিল বিকেন্দ্রীত শিল্পের প্রতীক। কলকারখানা কতিপয় বিত্তশালী ব্যক্তির হস্তে প্রচুর ধন সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার যে সুযোগ ঘটায় এবং তাতে যে নানা সামাজিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয় তা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থেকে শান্ত পরিবেশের মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠ জীবন যাপনের উপায় উদ্‌ভাবন ক'রে গান্ধীজী নব আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ-সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এইজন্য তাঁর "হিন্দ্‌ স্বরাজ্য" (১৯০৯)

পুস্তকে বর্ণিত আদর্শ থেকে আরম্ভ ক'রে জীবনব্যাপী অহিংসা সাধনার পথে তিনি চরকা ও খদ্দর, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্যকে আঠার দফা গঠন কর্মের অঙ্গীভূত করেছিলেন।

ইহা অনস্বীকার্য্য যে জেলার জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে, জনসভা ও কর্মীসম্মেলনগুলিতে, বহু চরকা প্রতিযোগিতাতে, চরকার যে গুঞ্জনধ্বনি বেজে উঠত তার সুর শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হয়নি। গান্ধীজী 'নিখিল ভাবত কাটুনি সংঘ' (All India Spinners Association) গঠন ক'বে চরকা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মেদিনীপুব জেলার ঐ সময়কার কয়েকটি গঠনমূলক কার্য্য প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হল। খদ্দরের কাজের সঙ্গে তাঁরা অন্যান্য কর্মসূচীও অনুসরণ করতেন।

অভয় আশ্রম বলরামপুব। ইহা ষ্টেশন থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এটী অনেক বৎসব কুমিল্লা অভয় আশ্রমের একটি শাখা স্বরূপ পরিচালিত হয়েছিল। ইহার পবিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডাঃ সুবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষিতীশ চন্দ্র বায়চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ কুমিল্লা অভয় আশ্রমের পরিচালনার সহিত প্রথম হতে যুক্ত ছিলেন মেদিনীপুরের একজন কৃতীসন্তান অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী। ইনি স্বাধীনতালাভের পর ইহার জন্মস্থান ঘাটাল মহকুমার ক্ষীবপাই গ্রামে বহুমুখী গঠনমূলক কার্য্যের একটি বৃহৎপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত করতেন। তিনি একজন কৃতী সংগঠক ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় সহায়তা স্মরণ যোগ্য। বলরামপুর অভয় আশ্রম এখন একটি পৃথক রেজিষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান রূপে পবিচালিত হচ্ছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে খাদিবস্ত্র উৎপাদন করা হয়।

নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কর্মীগণ পরিচালিত ডেবরা থানার অন্তর্গত 'আলোক কেন্দ্রের' কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এখানকার খাদি কার্য্য উল্লেখযোগ্য।

কাঁথিতে জুখিয়া কেন্দ্রে 'কাঁথি খদ্দর প্রচার সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়

১৯২৬ সালে কেলেঘাই বন্যার পর। জুখিয়া ও নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে তুলার চাষ ও চরকা পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এইগুলি বিশেষভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। কেলেঘাই বন্যার ধ্বংসলীলার পর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে পরিচালিত 'মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য সমিতি' থেকে প্রদত্ত অর্থে একটি খদ্দর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানপুর থানার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে উৎপাদিত খদ্দর কাঁথি শহরে প্রতিষ্ঠিত খাদি ভাণ্ডার থেকে বিক্রয় করা হত। পরে 'কাঁথি সেবাসঙ্ঘ' নামে একটী রেজিষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত কুলাপাড়াতেও বন্যা সাহায্য সমিতি থেকে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রদত্ত অর্থে একটি খাদি কেন্দ্র খোলা হয়। তার নাম ছিল 'দেশবন্ধু খাদি মিশন'। ইহার প্রধান পরিচালক ছিলেন তমলুকের বিশিষ্ট অসহযোগী কর্মী হংসধ্বজ মাইতি। কেন্দ্রটি খাদি কার্য্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। সুপরিচিত খাদিকর্মী জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিশ্র কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন।

১৯২৬ সালে কেলেঘাই বন্যার ফলে সবং থানাতে যে দুর্দশার সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে 'সবং চরকা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হল। সবং থানার সুপরিচিত কংগ্রেস নেতা আদিত্য কুমার বাঁকুড়া ও গোপাল চন্দ্র মাইতি যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সমিতি তুলা চাষ, নূতন ও পুরাতন চরকা প্রচলন এবং খদ্দর বয়নের উপযোগী তাঁত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কাজ হাতে নেন।

১৯২৬ সালের মহা বিপদ থেকে সৃষ্টি হল গঠন কার্য্যের এক মহান সুযোগ। বন্যাপ্লাবিত দুর্গত অঞ্চলে অধিবাসীগণের স্থায়ী সাহায্যের উপায় অনুসন্ধানে কর্মীগণ তৎপর হলেন। কংগ্রেসের অসহযোগ কর্মধারার মধ্যে চরকা ও খদ্দর প্রচলন, সালিশ মীমাংসা, অস্পৃশ্যতা বর্জন জাতীয় শিক্ষা প্রচলন ইত্যাদি বহুবিধ গঠন কর্মের নির্দেশ ছিল। জেলার কর্মীগণ নিষ্ঠার সহিত এগুলি পালনে যত্নবান হতেন। প্লাবনের

পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উপায় হিসাবে একটি চরকা ও খাদি সঙ্ঘ গঠন করতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন।

'কাঁথি খদ্দর প্রচার সমিতি' গঠিত হল—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত হলেন।

গ্রামীন শিল্প

চরকা ও খদ্দরের সঙ্গে আরও কতকগুলি গ্রামীন শিল্প চিন্তা করা হয়েছিল। হাতে তৈরী আটা, ঢেঁকি ছাটা চাউল, সাবান তৈরী, কাগজ তৈরী, দেয়াশলাই তৈরী, চামড়া পাকাই, ঘানিতে তৈল তৈরী প্রভৃতি গ্রামীন শিল্পগুলির দিকে কর্মীদের ও দেশের লোকের দৃষ্টি পড়েছিল। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গ্রামোদ্যোগ সংস্থার সাহায্য ও ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত উল্লিখিত শিল্পগুলির সেরূপ প্রচার বা প্রসার লাভ ঘটেনি কিন্তু লোকের মনে বিশেষতঃ মেদিনীপুরের ন্যায় কৃষকবহুল গ্রামগুলিতে স্বাভাবিকভাবে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। কাঁথি মহকুমার রঘুনাথ মাইতি ও ভূদেব চন্দ্র দাস প্রমুখ কর্মীগণ ঘানিতে তেল তৈরী, কাগজ তৈরী, হাতে আটা তৈরী, ঢেঁকি ছাটা চাল তৈরী প্রভৃতি কার্য্য প্রবর্তনের জন্য সংস্থা গঠনে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

মেদিনীপুর জেলাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণাজনিত কোন স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। জেলার প্রায় ৫৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১৯৭১-৭২ সালে ছিল প্রায় ৪ লক্ষ কুড়ি হাজার। ইহারা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হ'লেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ একটি প্রীতির ভাব বজায় ছিল। কোন কোন স্থানে কতকগুলি পরিবার বিশেষ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। নন্দীগ্রাম থানাতে মীর পরিবারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি হিন্দুপরিবারের উপঢৌকন ও নববস্ত্র আদান-প্রদান প্রভৃতি সামাজিক

যোগাযোগ নিয়মিতভাবে চলত। এরূপ সম্পর্কের কথা একান্ত বিরল ছিল না। গোহত্যাদি ব্যাপার কোন কোন সময় দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কে আঘাত দিত না এমন নয় কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। প্রয়োজনমত শান্তি-কমিটি গঠিত হত এবং ঐ সব কমিটির মাধ্যমে আলোচনা বৈঠক ও সভাদিতে মিলিত হয়ে উভয় সম্প্রদায় আসন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। তমলুক মহকুমাতে একটি 'মহকুমা শান্তি কমিটি' গঠিত হয়। (১৯২৬)। চনসরপুর নিবাসী রায় সাহেব হাজি ওয়াহেদ রসুল ছিলেন ঐ কমিটির সভাপতি। শেক্ ইসরাইল, দেদার বক্স প্রভৃতি গণ্যমান্য মুসলমানগণ এবং কংগ্রেস নেতা বর্ষীয়ান আইনজীবী শ্রীনাথ চন্দ্র দাস ও বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবী অবিনাশচন্দ্র কর, ভোলানাথ মহাপাত্র, ত্রিপুরা চরণ ঘোষ. অজয় কুমার মুখার্জী, রমেশ চন্দ্র কর, বিপ্রচরণ মাইতি প্রভৃতি কমিটির সদস্য ছিলেন। হাজি সাহেব নিজস্ব জীপ যোগে মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে বেড়াতেন, কখনও কখনও তাঁকে তমলুক মহকুমার বাইরেও যেতে হত। হিন্দু পর্বাদির সময় কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত থেকে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা শান্তভাবে মসজিদের নিকট দিয়ে উপযুক্ত পথে পার করে দিতেন। হাজি সাহেব বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অধিকার রক্ষার কথা সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। সমিতির প্রভাব এই ভাবে খুব ফলপ্রদ হয়েছিল।

কাঁথিতে গঠিত (১৯২৬) হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সমিতির কার্যাও বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল, ঐ সমিতির সভাপতি ছিলেন কংগ্রেস নেতা প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ছিলেন বসন্ত কুমার দাস। নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, ঈশ্বর চন্দ্র মাল, বিজয় কৃষ্ণ মাইতি, সতীশ চন্দ্র জানা, তারক নাথ পাল, ভূতেশ্বর পড়্যা, গণেশ চন্দ্র তলা প্রমুখ কংগ্রেস কর্মীগণ এবং দারুয়া, বেতালিয়া চালতি প্রভৃতি গ্রামের মুসলমান প্রতিনিধিগণ সমিতির সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। মুসলমান বহুল গ্রামগুলিতে দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিদের প্রচারের ফলে প্রধানতঃ গোহত্যা নিয়ে বিক্ষোভের সূত্রপাত হলে উভয় সম্প্রদায়ের বিচার বুদ্ধি

সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যে কংগ্রেস কর্মীগণ সেগুলি নিরসনের জন্য বিশেষ যত্নবান হতেন। কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র আবদুল কৈয়ুম খাঁ, ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক মহতাব আলি খাঁ, নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী সৈয়দ মৈনুদ্দিন বক্স বিশিষ্ট গ্রামবাসী আফতাব আলি মিঞা, দারুয়ার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সেখ আলাউদ্দীন ও জালালুদ্দিন মহম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তথাপি জেলাতে ১৯২৮ সালে একটি দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল—প্রধানতঃ বহিরাগত গুণ্ডাশ্রেণীব লোকের চক্রান্তে। খড়্গপুর মেদিনীপুর জেলার একটি সুবৃহৎ রেলওয়ে জংশন। বিভিন্ন প্রদেশ ও সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষাধিক লোক এখানে বাস করে—চাকুরীয়া, শ্রমিক ব্যবসায়ী, ইত্যাদি হিসাবে। ইহাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ খুব কম ঘটে। খড়্গপুরে ঘটে গেল একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গুণ্ডাগুলিকে উসকানি দিয়েছিল কলিকাতার কোন কোন রাজনৈতিক নেতা। এই দুর্ভাগ্য কেটে গিয়েছিল কিছু সময়ের পর, কিছু রক্তপাতের পর। ভবিষ্যতে উভয় সম্প্রদায়ের উন্মত্ততা বঙ্গের নানা স্থানে তাদের রক্ত ক্ষরণের কারণ হয়ে থাকলেও মেদিনীপুর জেলাতে ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। এজন্য জেলার কংগ্রেস নেতাগণের এবং কংগ্রেস সংস্থাগুলির এমনকি হিন্দু মহাসভার শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ।

এই জেলার মুসলমানগণ হিন্দুর গৃহে অতিথি হলে অথবা পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবে উপস্থিত হলে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হতেন। কংগ্রেস কমিটিগুলিতেও তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হত। ১৯২১ সালের খেজুরীব মুসলমান কর্মী খাদেন আলি মিঞা বহুদিন থানা কংগ্রেসের একটি দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছিলেন। কেশপুর থানার বর্ষীয়ান কংগ্রেস কর্মী ফকির মহম্মদ সাহেব বহু বৎসর জেলা কংগ্রেসের সদস্য ও অন্যান্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই অবসর প্রাপ্ত সাব্‌রেজিষ্ট্রার সুরাবর্দি সাহেবকে ভাইস্ চেয়ার-

ম্যান রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এইসব প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে মেদিনীপুর কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সৈয়দ সামশুল বারি সাহেব কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়ে বঙ্গীয় আইন সভাতে প্রবেশ লাভ করেছিলেন।

অস্পৃশ্যতা বর্জন

অস্পৃশ্যতা বর্জন কর্মধারা কংগ্রেস কর্মীগণের নিকট একটি ধর্মকার্য্য রূপে পরিগণিত হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য প্রভাব দেশবাসীর হৃদয়দ্বারকে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়ার পূর্বে তথাকথিত শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর বা হিন্দু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীগুলির ঘৃণা ও অবহেলা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রের সাহায্যে ইঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করার জন্য আন্দোলনে রত হয়েছিলেন। তুইটি নির্জিত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহ ও ছোট বড় রেষারেষিও কম ছিল না। কৌলিন্যের দাবীর প্রতিযোগিতা মধ্যে মধ্যে বিদ্বেষ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠত। সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'জাতিভেদ' 'শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার' 'জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার. 'অস্পৃশ্যতা বর্জন' 'শ্রীগৌরাঙ্গ' প্রভৃতি পুস্তকে প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের অন্যায় ও অবিচারকে তীব্র কশাঘাত করেছিলেন। মনীন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয় তাঁর "বঙ্গে দিগিন্দ্র নারায়ণ" পুস্তকে এই ত্যাগব্রতী স্বাধীনতা সংগ্রামী (অসহযোগ আন্দোলনে ৯ মাস কারাবরণ করেন) হিন্দু সম্প্রদায়ের তথা হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পথপ্রদর্শক দিগিন্দ্র নারায়ণের জীবন ও কর্মের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে দু' একটি মন্তব্যের উল্লেখ করলে তাঁর সমাজ সংস্কার ব্রতের স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিলেন—"সমাজজীবনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার মহৎ ব্রতে বহু বর্ষ ধরিয়া সিরাজগঞ্জের দীন দরিদ্র ভগবদ্ভক্ত কর্মী দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তিলে তিলে

আত্মোৎসর্গ করিতেছেন।" আনন্দবাজার পত্রিকা অপর একটি মন্তব্যে বলেছেন "আজ সেই অবনত, অস্পৃশ্য, অনাচরণীয়রূপী নারায়ণগণের সেবার জন্য তিনি কেবল গ্রন্থ লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই— তাহার উদ্ধার কার্য্যে সমাজের অত্যাচার, নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে হাসিমুখে মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "গ্রন্থকার ভীমরুলের চাকে বসেই ভীমরুলের দলকে খোঁচা দিচ্ছেন। এটি বড় সহজ কাজ নয়। কলকাতায় বসে সমাজ সংস্কারের কথা বলা সহজ কিন্তু পল্লীসমাজের বুকে বসে, সমাজকে সাহস করে ঘা দেওয়া ভারি কঠিন, তিনি তাই করেছেন।"

দিগিন্দ্র নারায়ণ খেজুরী, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা প্রভৃতি থানার সমাজ সেবীগণের আহ্বানে ১৯১৮ সালের পূর্বে থেকেই কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় এসে তাঁর পুস্তকাদি প্রচার এবং জনসভাগুলিতে বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ দিয়ে হিন্দু সমাজের বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার বহুগ্রাম পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং কৌলীন্যগর্বিত সম্পদায়গুলির অসার মনোভাব ও তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীগুলির হীন-মন্যতার বিরুদ্ধে প্রবল কশাঘাত ক'রে এবং কল্যাণের পথ অনুসরণের জন্য প্রাণস্পর্শী আবেদন জানিয়ে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর গান্ধীজীর দিব্য আবির্ভাব মানুষের প্রাণকে এরূপ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করল যাতে যুগসঞ্চিত পাষাণপ্রাচীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেল। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবচন উদ্ধার ক'রে অস্পৃশ্যতা সমর্থন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার উত্তর দিয়েছিলেন দিগিন্দ্র নারায়ণ কিন্তু মহাত্মাজী প্রাণের পথে প্রেমের পথে বহু তার্কিককে টেনে এনে অস্পৃশ্যতার প্রাচীর ধুলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।

গোঁড়া সংস্কার বিরোধীগণের নিকট কংগ্রেসের লোকেরা একটি ভিন্ন জাত্ হয়ে উঠল কিন্তু তাদের আড়াল থেকে অসংখ্য লোক সংস্কার পন্থী হয়ে উঠল। ছোঁয়াছুঁইর বাছবিচার শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে লাগল। কংগ্রেস কর্মীগণের চেষ্টায় সর্ব সম্পদায়ের পংক্তি ভোজ একটা উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হল। প্রথম প্রথম কংগ্রেসকর্মীগণ নিজ

নিজ পরিবারের মধ্যে ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোন কোন স্থানে নির্য্যাতন ভোগ করেছে একথা সত্য কিন্তু জাতের নামে বজ্জাতি বেশী দিন প্রশ্রয় পায়নি, কাজী নজরুলের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের ধ্বনিতে প্রাচীন সংস্কারের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। বহু জনসভায় কংগ্রেস কর্মীগণ প্রাণখুলে গাইতেন ঃ—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া
ছুঁলেই কি তোর জাত যাবে ?
(জাত) ছেলের হাতের নয় তো মোয়া ॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি।
ভাবলি এতেই জাতের জান,
তাইতো বেকুব করলি তোরা
এক জাতিকে একশো খান ॥
এখন দেখিস ভাবত জোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া
মানুষ নাই আজ আছে শুধু
জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥
সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর
বিশ্ব মায়ের বিশ্বঘর
মায়েব ছেলে সবাই সমান
তাঁর কাছে নাই আত্মপর ॥
তোরা সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা করে
স্রষ্টায় পূজিস জীবন ভরে
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর
মেরে গাভী দোওয়া ॥
বলতে পারিস বিশ্বপিতা
ভগবানের কোন সে জাত ?

কোন ছেলে তাঁর লাগলে ছোঁওয়া
অশুচি হন জগন্নাথ ?
নারায়ণের জাত যদি নাই
তোদের কেন জাতের বালাই
তোরা ছেলের মুখে থুতু দিয়ে
মার মুখে দিস
ধূপের ধোঁয়া ॥
ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট
নাই সেখানে জাত বিচার,
তোব পৈতে, টিকি, টুপি, টোপর
সব সেথা ভাই একাকার।
জাত সে শিকেয় তোলারবে
কর্ম্ম নিয়ে বিচার হবে
বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে
নরক কিম্বা স্বর্গে খোওয়া ॥”

গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও অসহযোগের প্রবাহে আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা বহুদিনের ‘অচলায়তন’ কে ধুলিসাৎ করে দিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সেই উদাত্ত আহ্বান ‘মুচি, মেথর, তোমায় রক্ত, তোমার ভাই’। স্বরাজের জন্য চেতনা সঞ্চারের সংগে এই বাণীকে কার্যে পবিণত করার আগ্রহ জাগিয়ে তুলল। তবুও গান্ধীজী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেনঃ—“অনেক কংগ্রেসী এই ব্যাপারকে (অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ) নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে আবশ্যক বস্তু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহা যে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য এ ধারণা অনেকে রাখেন না। …প্রত্যেক হিন্দু তাহাদের (হরিজনদের) সমস্যাকে নিজ সমস্যা বলিয়া মনে করিবেন। তাহাদের ভীষণ একাকীত্বের মধ্যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিবেন। হরিজনদের যে একাকীত্ব, দুনিয়ায় তাহাদের সমান এতবড় নিদারুণ একাকীত্ব আর দেখা যায় না। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে,

এই কাজ করা কত কঠিন। কিন্তু স্বরাজের সৌধ নির্মাণ করিতে হইলে এই কাজ অবশ্য করণীয়।

মেদিনীপুর জেলাতে কংগ্রেস কর্মীগণের চেষ্টায় ও আগ্রহে পণ্ডিত দ্বিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, অবধূত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ গান্ধী তত্ত্ব বিশারদ নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রভৃতি যে মুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টীর কাজ করেছিলেন তাতে কবির বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল—"নূতন আশে হৃদয়ে ভাসে, ভাইয়েব পাশে ভাইকে দেখে।"

হরিজনদের নিকট থেকে মন্দিরে পূজা গ্রহণ, স্থানে স্থানে মন্দির প্রবেশ অনুষ্ঠান উদযাপন, তাদের স্পৃষ্ট জলগ্রহণ, পংক্তি ভোজ, হরিজন পল্লীতে পূজা পার্বণের অনুষ্ঠান, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি কংগ্রেস কর্মীগণের অলঙ্ঘণীয় কর্ত্তব্যে পরিণত হয়েছিল।

মাদকতা নিবারণ

মাদকতা নিবারণ কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে হরিজন পল্লীগুলি বেছে নেওয়া হত। যদিও তথাকথিত 'ভদ্রলোকদের' মধ্যে মাদকতা পাপ কম ছিলনা তথাপি গরীব হরিজনরা তাদের স্ত্রীপুত্রকে তাদেব স্বল্প খাদ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে মাদক দ্রব্যের নেশায় যে পরিমাণ অর্থব্যয় করত এবং তাদের প্রতি মাঝে মাঝে যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করত তার প্রতীকারের জন্য কংগ্রেস কর্মীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

মাদকতার বিরুদ্ধে গৃহীত অন্য কর্ম্মসূচীটি ছিল অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক। আবগারী দোকানে পিকেটিং খুব ব্যাপকভাবে চালান হত আন্দোলনের আক্রমণাত্মক কর্ম্মধারার অঙ্গ হিসাবে। সেজন্য পুলিশের হস্তে প্রহারাদি নির্য্যাতন ও গ্রেপ্তারবরণ প্রভৃত উন্মাদনার সৃষ্টি করত। এজন্য নেশাখোর লোকেরা সহজে আবগারী দোকানে প্রবেশ করতে পারতোনা। নূতন নূতন মদ, গাঁজা আফিং দোকান সৃষ্টি অনেক

পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। পিকেটিংএ রত স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হত তাও একান্ত বিফল হত না। নেশায় আসক্ত ব্যক্তিগণের মনে কংগ্রেস কর্ম্মীগণের নির্যাতন ও দুঃখবরণ অবশ্যই যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত।

আক্রমণাত্মক আন্দোলনের উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ায় কংগ্রেস কর্ম্মীগণের মাদকতা বর্জ্জন কার্যধারার তীব্রতাও হ্রাস পেয়েছিল তা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

নারী উন্নয়ন

নারীজাতির উন্নয়ন কার্যধারা অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচীতে একটি বৈপ্লবিক আকার ধারণ ক'রেছিল। অসহযোগ থেকে আরম্ভ ক'রে আইন অমান্য প্রভৃতি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে নারী সমাজে অপূর্ব জাগৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। স্বরাজের জন্য সংগ্রামে তাঁরা পুরুষের সমান অংশ গ্রহণে সক্ষম এই যোগ্যতার পরিচয় দিতে নারী সমাজের কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি। জনসভাগুলিতে নারীদের জন্য পর্দ্দাপরিবৃত আসন সংরক্ষণের আয়ু অতিসত্বর শেষ হ'য়ে গেল। তাঁরা শত শত, সহস্র সহস্র সংখ্যায় মুক্ত বায়ুতে এসে অসহযোগ সভাগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকলেন। চরকা গ্রহণ ক'রে সূত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁরা পরম আগ্রহে যোগ দিতে লাগলেন। চরকা প্রতিযোগিতা ও চরকা-খদ্দর প্রদর্শনীতে তাঁরাই অগ্রণী হলেন। খদ্দর উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে তাঁরাই হলেন প্রধান। কংগ্রেসের জন্য মুষ্টি ভিক্ষার হাঁড়ি স্থাপন ক'রে বাড়ীতে বাড়ীতে তাঁরা নিয়মিত সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। 'তিলকস্বরাজ্য ভাণ্ডারে'র জন্য অর্থ সংগ্রহে তাঁদের অকুণ্ঠ দানই আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠল। কোন কোন মহিলা সভাস্থলে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার দান করতে কুণ্ঠিত হননি এ দৃষ্টান্তের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। তাঁদের আতিথেয়তা ও সদয় ব্যবহার, সকল সম্প্রদায়ের কর্ম্মীগণের একত্র আহার ও অবস্থান ব্যবস্থা ছুৎমার্গের মূলোচ্ছেদের পক্ষে মহামূল্য অবদানস্বরূপ হয়েছিল। কাঁথির

ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলনে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার ক'রে পল্লীর গৃহস্থগণ নিজ নিজ তৈজসপত্র বিনা দ্বিধায় ক্রোক হ'তে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, নারীদেরই সক্রিয় সহযোগিতার শক্তিতে। প্রকৃতপক্ষে 'অসহযোগ' থেকে গান্ধীভাবধারার যে প্লাবন দেশের সর্ব্বস্তরকে আপ্লুত করেছিল, তাতে নারীসমাজ সাড়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি।

যুবরাজের ভারত আগমন বর্জ্জন ঘোষণা উপলক্ষ্যে দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী, ভগিনী উর্মিলা দেবী ও বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী সুনীতি দেবীকে ৭ই ডিসেম্বর (১৯২০) তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এজন্য সমগ্র বঙ্গ ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। শীর্ষস্থানীয়া মহিলাগণের এই কারাবরণ নারীসমাজের সম্মুখে একটি অনুকরণ-যোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে, বিশেষতঃ আইনঅমান্য আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী সমাজের অবদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। মেদিনীপুর জেলাতে নারী সমাজ যে অপূর্ব্ব ত্যাগের ও ক্লেশ বরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। যথাস্থানে সেগুলি বিবৃত হবে কিন্তু ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে জেলার নারীরা ত্যাগে, সাহসে ও স্বরাজসাধনায় নিজেদের শক্তিকে মহিমামণ্ডিত করে জেলার গৌরব অর্জ্জন করেছিলেন।

গান্ধীজী বলেন---'পুরুষেরা নারীদের প্রতি ব্যবহারে নিজদিগকে নারীদিগের প্রভু, কর্ত্তা, ইত্যাদি মনে করিয়াছে, বন্ধু ও সহকর্ম্মী এই দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখে নাই। কংগ্রেসীদের গৌরবময় কর্তব্য হইতেছে নারীদিগকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লওয়া এবং ইহা দেখা যে নারীরা তাহাদের পূর্ণ দায়িত্বের বোধ পায় এবং পুরুষের সহিত সমানে তাহাদের যোগ্য স্থান অধিকার করে'। নিরপেক্ষ কোন দ্রষ্টার নিকট আইনগত ও আচারগতভাবে এখনকার নারী সমাজের অবস্থা বস্তুতঃই সর্ব্বদা খারাপ এবং উহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক'।

নারীদের সমাজগত ও আইনগত মর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান সৃষ্টি ক'রেছিল অসহযোগ আন্দোলন এবং কয়েক বৎসর ধরে গঠনমূলক কার্যধারার অনুসরণের ফলে এই প্রচেষ্টা ক্রমবর্দ্ধমান ফল প্রসব করেছে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বর্ত্তমান।

গঠনমূলক বা রচনাত্মক কার্যসূচীর মধ্যে আরও অনেক প্রকার কর্ম্মের নির্দ্দেশ ছিল। জেলার কর্ম্মীগণ সকল প্রকার কর্ম্মের প্রতি সমান মনোযোগ দিতে পারেন নি। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা ক'রে কতকগুলি কার্য্যের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ ক'রে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন এবং জেলাবাসীর গুরুতর অসুবিধাগুলি দূরীকরণে তাঁরা বিশেষভাবে সজাগ ও সতর্ক ছিলেন।

জেলাতে বন্যার তাণ্ডব—কেলেঘাই ও অন্যান্য নদীর বন্যার ধ্বংস লীলা

১৯২৬ সালে মেদিনীপুর জেলাতে একটি বিপুল বিধ্বংসী বন্যা ঘটে। প্রায় ৭৫ মাইল দীর্ঘ কেলেঘাই নদীটি জেলার এক প্রান্তে ঝাড়গ্রাম মহকুমার দুধকুণ্ডিতে জন্ম লাভ ক'রে সদর মহকুমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, কাঁথি মহকুমা অতিক্রম ক'রে পুনরায় সদর মহকুমাতে প্রবেশ ক'রে তমলুক মহকুমার একপ্রান্তে কংসাবতী নদীর সহিত মিলিত হ'য়েছে। এই মিলিত নদীটি 'হলদি' নদী নামে পরিচিত এবং ইহা হলদিয়া বন্দরের প্রান্তবর্ত্তী। বর্ষাতে জলস্ফীতি না ঘট্‌লে নদীটি গ্রীষ্ম, শীত ইত্যাদি কালে বেশ শান্তশিষ্ট ও ক্ষীণ কলেবর, কিন্তু নদীতে উভয় কূলবর্ত্তী গ্রাম, মাঠ, পথ, ঘাট, বন্যা এলে প্লাবনের কবলে পতিত হ'য়ে সমুদ্রের ন্যায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই নদীর জল-নিকাশ জেলার অন্যতম প্রধান সমস্যা আকারে বহুকাল জেলাবাসীকে পীড়িত করছে। ১৯২৬ সালে কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে যে বন্যা হয় তাতে সদর, কাঁথি ও তমলুক মহকুমার কয়েক শত গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র পথ ঘাট সহ জলের নীচে ডুবে যায়। ক্ষেত্রের ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। গৃহ-সঞ্চিত শস্য অধিকাংশই ভেসে যায় ও নষ্ট হয় এবং অসংখ্য গৃহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত গৃহ-পালিত প্রাণীর সংখ্যাও কম ছিল

না। ভয়াবহ দুর্দশার কবলে পতিত গ্রামবাসীকে খাদ্য, আশ্রয় ও চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য দেওয়ার সমস্যাটি গুরুতর আকার ধারণ করে।

দেশবাসীর মহা দুঃখের দিনে কংগ্রেস-কর্মীগণ প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে ত্রাণ ও সেবা কার্য্যের ব্যবস্থা ক'রেছিল। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ অর্থ বস্ত্র ও বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। খড়্গপুরে একটি কেন্দ্র খুলে রেলযাত্রীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহের যে ব্যবস্থা হয় তা উল্লেখযোগ্য। সুশান্ত কুমার মাইতি, নরেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ কর্মীগণ খড়্গপুর জংশনের পথে যাতায়াতকারী সকল প্রধান ট্রেনে অর্থ সংগ্রহ কার্য্যে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত রত থাকতেন। এঁদের ২।৩ মাস ব্যাপী কার্য্য বিশেষ ফলপ্রদ হ'য়েছিল।

মহাপ্রাণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে একটি 'মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সহকারী সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক অমিয়কুমার সেন ও নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি। সর্বজন স্বীকৃত সততা ও মহৎ চরিত্রের অমিত প্রভাবের জন্য আচার্য্যের প্রতি মানুষের হৃদয় সহজেই আকৃষ্ট হোত। দুঃস্থ-দুর্গত ব্যক্তিগণের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করার জন্য আচার্য্য রায়ের কর্ম ও আবাসস্থল দুর্গত মেদিনীপুর বাসীর উদ্দেশ্যে ভারতের নানাস্থান হ'তে প্রেরিত দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। কলিকাতা প্রবাসী মেদিনীপুরের ছাত্র ও যুবকদল আচার্য্যের স্নেহের স্পর্শে তাঁদের মহৎ কর্ত্তব্য পালনে পরম উৎসাহ ও উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন।

জেলার মধ্যে সমস্ত স্কুল, কলেজ, বার লাইব্রেরী, ক্লাব ও অন্যান্য যুবসংগঠন ও বিভিন্ন প্রকারের সংস্থা প্রভৃতিতে সর্বত্র একটি সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের সংগৃহীত অর্থ, নূতন-পুরাতন বস্ত্র নিজ নিজ মনোমত সংস্থার নিকট পাঠিয়ে সাহায্য ভাণ্ডারগুলি পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন। আচার্য্য রায়ের নিকট দেশ বিদেশ হ'তে প্রভূত পরিমাণ অর্থও প্রেরিত হয়েছিল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত বন্যা সাহায্য সমিতি হ'তে প্রাপ্ত সাহায্য বিতরণের জন্য প্লাবিত অঞ্চলে বহুসংখ্যক কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। কংগ্রেসকর্মীগণ এই কেন্দ্রগুলির ভার নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন; দিবারাত্র নৌকাযোগে যাতায়াত, কখনো বা দুর্গম কর্দমাক্ত পথে মনুষ্যখাদ্য ও গোখাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানা প্রকার প্রয়াস, তাঁদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল। গোখাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্রে তা পৌছানো একটি অতীব শ্রমসাধ্য কার্য্য। বহু দূরবর্তী ধানকলের নিকট থেকে শত শত মণ কুঁড়া নিয়ে নৌকা ও শ্রমিকগণের মাধ্যমে সাহায্যবিতরণ কেন্দ্রে ও প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেবার জন্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হ'য়েছিল। গোখাদ্য সাহায্যের জন্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীভগবান দাসজী নারায়ণ দাসজী সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন।

'মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য সমিতি' ব্যতীত 'মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি' 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রমুখ আর্ত সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি গভীর নিষ্ঠার সহিত কার্য্য ক'রে দুঃস্থ ও বন্যার্ত নরনারীকে প্রভূত সাহায্য দান ক'রে ছিলেন। কংগ্রেসকর্মীগণ সর্বদাই চেষ্টাগুলিকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন।

একটি গুজরাটি প্রতিষ্ঠান দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে তাঁদের সুবিধামতো স্থানে গিয়ে তাঁদের সাহায্যগ্রহণের যে ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, তা তাঁদের সম্ভ্রম অক্ষত রেখে প্রাণ বাঁচানোর পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হয়েছিলো। অভাব এরূপ সর্বব্যাপী হ'য়েছিলো যে এই প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা না হ'লে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারকে অনশনে কাল কাটাতে হোত এবং ক্ষুধা ও রোগ কবলিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করতে হোত।

এই মহা বিপদের সময় চিরাচরিত ধারার সরকারী সাহায্য অত্যন্ত অপ্রচুর ভাবেই এসেছিল, এমনকি গৃহনির্মাণ প্রভৃতি স্থায়ী কার্য্যের জন্যও সরকারী দান অত্যন্ত সীমিত ছিল যার দ্বারা কোনও কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে নির্বাহ হওয়া অসম্ভব হোত। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি লোকের ন্যূনতম অভাব পূরণেও যত্নবান ছিলেন। বন্যাক্লিষ্ট গ্রাম-

গুলিতে কংগ্রেস কর্মীগণের অক্লান্ত জনসেবা তাঁদেরকে দুঃখী ও আর্তের বন্ধুরূপে অতীব জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। যে সকল সাহায্য সমিতি স্থায়ীভাবে গঠিত হ'য়েছিলো তাতে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীগণ পরিচালক ছিলেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কিশোরীপতি রায়, মহেন্দ্র নাথ মাইতি, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন দাস, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেস নেতাগণ সকলেই জেলার, মহকুমার বা থানার 'রিলিফ কমিটি' গুলির অগ্রণী ছিলেন। এমন একজনও কংগ্রেস কর্মী ছিলেন না, যিনি বন্যার্তদের সেবাকার্য্যে যোগ দেননি।

এই বৎসরের (১৯২৬) কেলেঘাই নদীর ধ্বংসলীলা প্রলয়ংকর রূপ ধারণ করলেও ১৯১৩ এবং ১৯২৩ সালের কেলেঘাই বন্যার ব্যাপকতা ও নাশকতা বড়ো কম ছিল না।

১৯২৫ সালের এক বিধ্বংসী বন্যাতে তমলুক কাঁথি ও সদর মহকুমার প্রায় একশত বর্গমাইল স্থান প্লাবিত হয়ে যায়। আগষ্ট মাসে কয়েক দিন যাবৎ অতিবর্ষণের ফলে কংসাবতী নদীতে অস্বাভাবিক জলস্ফীতি ঘটে এবং জলের চাপে বাঁধ ভেঙে পাঁশকুড়া, তমলুক ও মহিষাদল থানার প্রায় ৫২ বর্গমাইল স্থান জলে ডুবে যায়। মাঠে জল দাঁড়ায় প্রায় ৮ ফুট। উপযুক্ত জলনিকাশ ব্যবস্থার অভাবে ১"/২" জল কমতে কয়েকদিন সময় লেগে যায়। তমলুকের কংগ্রেস নেতা মহেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে বন্যা সাহায্য সমিতি গঠিত হয়, তাঁদের মতে ১৮০০ খানি গৃহ একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। ১২০০ গৃহ পতনোন্মুখ হ'য়েছিলো এবং দুই হাজারের অধিক গৃহ অল্লাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হ'য়েছিল। মাঠের ফসল একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। বহু সহস্র ব্যক্তি অত্যন্ত অসহায় হ'য়ে পড়েছিল—তারা আশ্রয়হীন ও কর্মহীন হ'য়ে নির্মূল হ'বার উপক্রম হ'য়েছিল। পাঁশকুড়া ও প্রতাপপুরের মধ্যবর্তী জেলাবোর্ডের রাস্তা ভেঙে যায় এবং সেখানে নৌকার সাহায্যে পারাপার শতশত লোকের দারুণ কষ্টের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

কাঁথি মহকুমাতেও প্লাবনের দুর্যোগে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সমগ্র ফসল নষ্ট হ'য়ে যায়, লোকে গৃহত্যাগ ক'রে বড়ো রাস্তার ওপর কুঁড়ে ঘর বেঁধে বাস করতে বাধ্য হয়। এই মহকুমার দুবদা (এগ্‌রা থানা), বারচৌকা (পটাশপুর থানা) কাঁথি (কাঁথি থানা), আঁওরাই (কাঁথি থানা) প্রভৃতি কুখ্যাত বেসিনগুলিতে বন্যার জল প্রবেশ ক'রে এ-গুলিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে পরিণত করে। প্লাবনের জল মাসাধিক কাল দাঁড়িয়ে থেকে খাদ্য ও আশ্রয়ের দিক থেকে মহাবিপদের সৃষ্টি করে, আবার রোগাদির আক্রমণ ও গুরুতর দুর্দশার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। উল্লিখিত বেসিনগুলির জলনিকাশ সমস্যা একটি স্থায়ী রূপ ধারণ ক'রে বৎসরের পর বৎসর জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি করতে থাকে। সদর মহকুমার শালমারা জলা, তমলুক মহকুমার ময়না বেসিন প্রভৃতির দুঃখ দুর্দশাও গুরুতর আকার ধারণ করে।

১৯২৯ সালের ঘাটাল বন্যাতে কতকগুলি বহুবিস্তৃত এলাকা জলমগ্ন হ'য়ে যায়। কংসাবতী, শিলাবতী প্রভৃতি নদীগুলির প্লাবনে সদর ও ঘাটাল মহকুমাতে যে ধ্বংসলীলা প্রকট হয়েছিল তার ক্ষতি পূরণ প্রায় দুঃসাধ্য ছিল।

জলনিকাশ সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা

জেলার নদীগুলির জল নিকাশ সমস্যা বিপুল আকার ধারণ করেছিল। স্বাভাবিক বর্ষণের সীমা লঙ্ঘিত হওয়া মাত্র ঐ নদীগুলি প্রলয়ঙ্কর রূপ ধারণ ক'রে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভয়ানক বিপদের মুখে নিক্ষেপ করতো এবং তাদের কৃষি, গৃহদ্বার, গৃহপালিত পশু, সঞ্চিত খাদ্য, পথ ঘাট, পানীয় জল ও পণ্য দ্রব্যাদি ধ্বংসের মুখে পতিত হ'তো। ইহা এত ব্যাপক ও পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হতো যে লোকের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯২১ সালে 'কাঁথি জল নিকাশ সমিতি' গঠিত হয় এবং মহকুমার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী অসহযোগ ব্রতী ভূতেশ্বর পড়্যা মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক হন। তিনি সমগ্র মহকুমা পরিভ্রমণ ক'রে কেলেঘাই, রসুলপুর, বাঘুই প্রভৃতি

নদীর এবং ছবদা বাবোচৌকা, কাঁথি, আঁওরাই প্রভৃতি বেসিনের সমস্যাগুলির প্রতি জনগণের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। 'পাঁঠ হিতকরী সমিতি' ও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কার্য্য ক'রেছিলো। সবং থানাতে বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী আদিত্য কুমার বাঁকুড়া মহাশয়ের চেষ্টাতে 'সবং জলনিকাশ সমিতি' গঠিত হয়। এইভাবে সমগ্র জেলাতে কংগ্রেস সেবীগণের মধ্যে জেলাব জল নিকাশ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

১৯২৬ সালের 'কেলেঘাই' নদীর বিধ্বংসী বন্যার পর বঙ্গের তদানীন্তন Chief Engineer মিঃ এ্যাডামস্ উইলিয়ামস্ কেলেঘাই নদী পরিদর্শনে গমন করেন এবং মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলাতে কয়েকটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। (১৯২৭ ২৮ খ্রীঃ)। বলা বাহুল্য অভিজ্ঞ কংগ্রেস কর্মীগণই জনগণের মুখপাত্র রূপে এই সব সম্মেলনে বিভিন্ন নদীর সমস্যাগুলি বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

স্বাধীনতাপূর্ব যুগে ও স্বাধীনতা যুগে মেদিনীপুব জেলার বন্যা একটি দীর্ঘস্থায়ী গুরুতরো সমস্যার আকারে সরকারকে ও জনগণকে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত ক'রে রেখেছে। একসময়ে শীলাবতী নদীর প্রলয়ঙ্কর রূপ প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুজীকেও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে বাধ্য করেছিল। ইঞ্জিনীয়ারগণও নানা প্রকার স্কীম তৈবী ক'রে সরকারের নিকটে সেগুলি উপস্থাপিত ক'বে আসছেন। এই সমস্যাসমূহ সমাধানে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হওয়া অসম্ভব নয়। জেলার জল নিকাশ সমস্যার সমাধান ও প্লাবনের সময়কার দুর্গতি হ্রাসের জন্য এবং বন্যাক্লিষ্ট নরনারীগণের সাহায্যের জন্য কংগ্রেস সেবীগণ যে অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম ক'রে আসছিলেন, তাহাই কংগ্রেসের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টির পক্ষে অতীব মুল্যবান হ'য়ে উঠেছিল ইহা অনস্বীকার্য্য !

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীনতার দাবী

স্বরাজ ও স্বাধীনতা

অসহযোগ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফতের অবিচারের প্রতিকারে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে। অসহযোগ কর্মধারার আক্রমণাত্মক (Agressive) অংশ বাদ দেওয়া হয় চৌরী চৌরার দুর্ঘটনার জন্য এবং উহার গঠন মূলক অংশের উপর জোর দেওয়া হয়। জনগণের মধ্যে সংগঠন ও শৃঙ্খলা বোধ দৃঢ়ীভূত করার জন্য আইন সভার অভ্যন্তরে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রাম চালানোর মধ্যে সরকারের নিকট স্বরাজদলের পক্ষ হতে যে সকল দাবী উত্থাপিত হয়েছিল তাতেও স্বরাজের রূপ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তথাপি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঐ সামান্য দাবীগুলি স্বীকার করে নেননি। এ অবস্থায় প্রয়োজন হয়েছিল 'স্বরাজে'র একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার প্রকাশ যাতে ভারতবাসীর মনে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কোন অনির্দিষ্ট ভাবের স্থান না থাকে এবং সেই লক্ষ্যকে হৃদয়ে ধারণ করে জনগণ তাদের অভীষ্ট পূরণের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হতে পারে।

১৯০৬ সালে কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতিরূপে প্রবীন নেতা দাদাভাই নৌরজী বলেছিলেন—স্বরাজ-লাভই ভারতবাসীর লক্ষ্য। 'স্বরাজ' শব্দের অর্থ নিয়ে অনেক মতভেদ ঘটেছিল। নরমপন্থীগণের নিকট স্বরাজ ছিল—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। বৃটিশ শাসিত সাম্রাজ্যের (empire) অংশ হিসাবে ভারত একটি স্বয়ংশাসিত দেশরূপে গণ্য হবে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৃটিশ জাতির উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন বিদ্যমান। তাঁদের নিজস্ব পার্লামেণ্ট আছে কিন্তু তাঁরা ইংলণ্ডের রাজার প্রতি তাঁদের

আনুগত্য রক্ষা করে চলেন। চরমপন্থী রাজনীতিকগণ স্বরাজের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নি।

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক যে ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন "Swarajya is my brith right" (স্বরাজ্য আমার জন্মগত অধিকার) এইস্থলে স্বরাজ্যের বিশদ অর্থ কি ছিল জানা যায় না। লোকমান্য "Home Rule League" এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —তা সুবিদিত। তিনি ১৯১৬ সালে কর্ণাটক, বেরার ও মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণের সময় প্রথম ঐ উক্তি করেছিলেন। তারপর পুসাদ, বেলগাঁও এবং আমেদনগর এবং পরে বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণকালীন দৃঢ়তা সহকারে বারবার এই উক্তি করেছিলেন। তিনি স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন না একথা বলা যায় না কিন্তু জীবিতকালে তিনি স্বরাজ্যের অর্থ 'Home Rule'-র মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছিলেন এবং বৃটিশ সম্পর্কচ্যুত হওয়ার কথা বলেননি। তিনি সেই সময় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন পর্যান্ত তাঁর দাবীর মধ্যে রেখেছিলেন মনে করা যেতে পারে।

১৯০৭ সালে মেদিনীপুর সহরে যে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে নেতাগণ দুটি পৃথক মতবাদ ও কর্মপন্থার ভিত্তিতে দুটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের কর্মীগণের মধ্যেও এই দুটি পৃথক মতবাদের সমর্থক হিসাবে তাঁরা নরমদল ও গরমদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বলাবাহুল্য মেদিনীপুরের বিপ্লবীগণ গরম দলভুক্ত ছিলেন এবং বৃটিশ কর্তৃত্বহীন পূর্ণ স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। ডঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) এই দুই মতাবলম্বীদের মধ্যে গুরুতর সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল।

কংগ্রেসে কখনও নরমপন্থীদের আবার কখনও গরম পন্থীদের প্রাধান্য ঘটেছিল। অবশ্য একথা বলা যায় না যে এই একটি মাত্র বিষয়ের জন্যই কংগ্রেস নেতা ও কর্মীগণ পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়তেন। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের পটভূমিকায় বিভিন্ন সমস্যা-

সমাধান বিষয়ে মত ও পথ গ্রহণে নেতাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটত। তবে মূলতঃ চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকেই দেশের সমস্যাগুলির মর্মানুসন্ধান ও প্রতীকারের পথ নির্দ্ধারণের উপর নির্ভর করেই অধিকাংশ বিভেদের সৃষ্টি হত। চরমপন্থী মনোভাবের নেতা বিপ্লবী গুরু শ্রীঅরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে লিখেছিলেন (১৮৯৩--৯৪ খৃঃ) "আমরা চাই বৃটিশশাসন মুক্ত পূর্ণ স্বাধীন ভারত।"

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ঘোষণা করল যে "সর্বপ্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব পন্থায় স্বরাজ লাভই ভারতের লক্ষ্য"। এই লক্ষ্যকেই ঈপ্সিত (Creed) হিসাবে মেনে নিয়ে কংগ্রেস-সদস্য হতে হত। এতেও স্বরাজের স্বরূপ কি তার বিষদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতাবলী সম্বলিত 'Swaraj Within a Year' (এক বৎসরে স্বরাজ) পুস্তকেও স্বরাজের অর্থ আলোচিত হয়নি। মহত্মাগান্ধী বলেছিলেন 'যদি সম্ভবপর হয় স্বরাজ হবে বৃটিশের সহিত সম্পর্ক রক্ষা ক'রে আর যদি তা সম্ভবপর না হয় বৃটিশের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।' একদল নেতা ও কর্মী গান্ধীজীর এই অভিমত বা ব্যাখার সহিত একমত ছিলেন না।

মৌলানা হজরৎ মোহানী ১৯২১ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ঐবিষয়টিকে সকল বিতর্কের বাহিরে রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের (১৯২৯) পূর্বে এ বিষয়ে কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

১৯২৭ সালের কংগ্রেস

১৯২৭ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতাগণ এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা একটু বিশদভাবে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা এক সময়ে লিখেছিলেন—

"যে-ইংরাজ আমাদের চিরশত্রু তাহার কাছে সাহায্য আশা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শাসকদের নিকট দরবার না করিয়া দৈহিক শক্তির চর্চ্চা ও মনে সাহস সঞ্চয় করিতে হইবে" ...... "জাতীয়তাবাদী আমরা মনে করি, মানুষের জন্ম ও স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং আমরাও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন—কাহারও হুকুম মানিতে আমরা বাধ্য নহি।" বিপ্লববাদীরা এই মতেরই সমর্থক ছিলেন, এবং স্বাধীনতার জন্যই তাঁরা জীবন বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন ও ফাঁসি কাষ্ঠে জীবনদানও করেছিলেন।

বিভিন্ন অর্থসমন্বিত 'স্বরাজ' শব্দের 'বৃটিশ-কর্তৃত্বহীন-স্বাধীনতা' অর্থ গৃহীত হওয়া এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই দাবী উত্থাপিত করা চরমপন্থী ও বিপ্লবপন্থীগণের লক্ষ্য ছিল। কাজেই তাঁরা কলিকাতা কংগ্রেসে ঐরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার জন্য উৎসুক ছিলেন।

সাইমন কমিশন

কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্বে ১৯২৭ সালের ৮ই নভেম্বর বৃটিশ পার্লামেণ্ট স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের বিষয় ঘোষণা করেন। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন বিধানে একটি নির্দেশ ছিল যে—এই সংবিধান অনুসারে দশবৎসর ভারত শাসনের পর এর ফল কিরূপ দাঁড়ায় তা পর্য্যালোচনার জন্য ভারতে সরেজমিনে তদন্ত হবে। কিন্তু দশবৎসর অতীত হওয়ার পূর্বেই হয়ত বা অবস্থার চাপে উল্লিখিত সাইমন কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু এই কমিশনের ৭ জন সদস্যই ছিলেন বৃটিশ। এতে একজনও ভারতবাসীকে স্থান দেওয়া হয়নি। এজন্য ভারতে বিশেষ অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভারতের নরমপন্থী, মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী সকল রাজনৈতিক দলই একযোগে সাইমন কমিশন বর্জ্জনের সঙ্কল্প করেন। ভারতের সর্বত্র কমিশন বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে বহু সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে সাইমন কমিশন ভারতে পৌঁছিবার দিন সমগ্র ভারতে এবং যেদিন যে সহরে কমিশন উপস্থিত

হবেন সেদিন সেই সহরে হরতাল প্রতি-পালিত হয়। 'সাইমন ফিরিয়া যাও' লিখিত শত শত ফেষ্টুন ও কাল পতাকা বহন ক'রে বিশাল শোভাযাত্রাসমূহ নগর পরিভ্রমণ করে। পুলিশের ব্যাটন ও লাঠি শোভাযাত্রা বন্ধ করতে বিফল হয়।

কমিশন বর্জ্জনে লালাজীর আত্মোৎসর্গ

লাহোরের একটি শোভাযাত্রাতে ভারতের সর্ব্বজনমান্য নেতা লালা লাজপৎ রায় একজন পুলিশ অফিসারের লাঠির ঘায়ে এরূপভাবে আহত হন যে উহাই অল্প দিন পরে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের সম্মান ও জীবন বৃটিশ রাজত্বে একজন সামান্য কর্মচারীর নিকট এরূপ তুচ্ছ গণ্য হতে দেখে ভারতবাসী সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলো এইরূপ অসহায় অবস্থার একমাত্র প্রতিকার—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। মেদিনীপুরের একজন তরুণ কবি গেয়েছিলেন—

"ঐ শোন আজ কণ্ঠে হাহাকার
ভারতগগন ভরি'
দিকে দিকে উঠে ক্রন্দন রোল
হৃদয়ে কাহারে স্মরি।....
বিষাদ সিন্ধু করিয়া মন্থন
মাতৃমুক্তি তরে
উঠিল যে জন তরুণ বরণ
অমৃত ভাণ্ড করে।
মহান যে জন লুকাল কোথায়
প্রবীণ কর্ম্মবীর
(আর) শুনিতে পাবনা হুঙ্কার বুঝি
পাঞ্জাব কেশরীর
ভয় কিরে আজ অভয় মন্ত্র
দিয়ে গেছে লাজপৎ
মুক্তি সমরে চলুক ছুটিয়া
বিজয়ী মোদের রথ।"*

কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি বৈদ্যশাস্ত্রী

সর্বদলীয় সম্মেলন ও নেহরু রিপোর্ট

এই সর্বব্যাপী শোক ও বিক্ষোভের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ভারতে সংবিধানের একটি খসড়া প্রস্তুতের জন্য ১৯২৮ সালে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে সমবেত হন। কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের মধ্যে স্থির হয় যে "পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের" (Full Responsible Government) ভিত্তিতে উহা রচিত হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত ক্রমে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হয় তাঁরা একটি সংবিধানের খসড়া রচনা করেন এবং তাহাই 'নেহরু রিপোর্ট' নামে সুপরিচিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা Dominion Status এর ভিত্তিতে এই সংবিধান রচিত হল। এজন্য রিপোর্টটি বিশেষভাবে তরুণদের নিকট গ্রহণীয় ছিল না।

কলিকাতা কংগ্রেস (১৯২৮)

এই পটভূমিকায় ১৯২৮ সালে ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে একটি বিরাট শোভাযাত্রাতে রাজসম্মানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়ক ছিলেন তরুণ দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। সৈন্য বাহিনীর সেনাপতির ন্যায় তাঁকে জি. ও. সি বা সর্বাধিনায়ক নামে অভিহিত করা হয়েছিল। আত্ম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র পরিবেশ ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচনী সভাতে অনেক আলোচনার পর স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Independence League) সদস্যবর্গ ও অন্যান্যদের মধ্যে একটি আপোষ হয়। কিন্তু সে আপোষ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়নি। নেহরু রিপোর্ট আলোচনা কালে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত দল রিপোর্টে বর্ণিত ভারতের ঔপনিবেশিক মর্য্যাদা অনুমোদন না ক'রে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মূলক

প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মহাত্মাগান্ধী বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবটি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন ক'রে বলেন যে —যদি নেহরু কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শাসন সংস্কার (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন) এক বৎসরের মধ্যে ভারতে প্রবর্ত্তিত না হয় তাহলে পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে ভারতবাসীর আন্দোলন করার কোন বাধা থাকবে না এবং তিনিও এসে আন্দোলনে যোগ দিবেন।

বৎসরকাল অপেক্ষার নির্দেশ

গান্ধীজী উত্থাপিত প্রস্তাবটি এইরূপ ছিল—"সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্টের সুপারিশে প্রদত্ত গঠনতন্ত্রটি বিবেচনা ক'রে এই কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করছে যে, ভারতের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি সমাধানের পক্ষে ইহা একটি সুদূর প্রসারী প্রয়াস।" সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালজী একটি সংশোধক প্রস্তাব আনেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কংগ্রেস আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। পণ্ডিত জওহরলালজী উত্থাপিত সংশোধক প্রস্তাবটিতে বলা হয়—'মাদ্রাজ কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছিল যে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য। এই কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকবে এবং বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া পর্যান্ত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হতে পারে না, ইহাই এই কংগ্রেসের অভিমত।'

সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ৯৭০টি এবং গান্ধীজীর প্রস্তাবের পক্ষে ১৩৫০টি ভোট হয়, ফলে গান্ধীজীর মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। গান্ধীজী, মতিলালজী প্রভৃতি প্রভাবশালী সর্বভারতীয় নেতাদের বিরোধিতা সত্বেও তরুণ নেতাদের প্রস্তাবের প্রতি এইরূপ প্রকাশ্য সমর্থন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার বহুকর্মী কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের ভোট বিশ্লেষণ ক'রে দেখার সুযোগ না থাকলেও তাঁদের আন্তরিক আকর্ষণ ছিল স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে তার পরিচয় তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়েছিল।

কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের পর আশাপ্রদ কিছু ঘটল না। গান্ধীজী ও মতিলালজী বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কিন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিশ্রুতি এমনকি কোন আশার কথাও পাওয়া গেল না। গান্ধীজী বললেন—এই অবস্থায় তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই আন্দোলন করবেন।

লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব

১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত জহওরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ঔপনিবেশিক শায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে রচিত রিপোর্ট (নেহরু রিপোর্ট) বাতিল বলে গণ্য হল।

সকল বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও মতভেদের অবসান ঘটল। আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলীর সামনে লাহোর কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন "Dominion Status সম্বন্ধে ৩১শে অক্টোবর ঘোষণার পর কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলের নেতাদের স্বাক্ষরিত ম্যানিফেষ্টো সম্বন্ধে Working Committeeর প্রস্তাব এই কংগ্রেস অনুমোদন করছে এবং স্বরাজের উদ্দেশ্যে জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভাইসরয়ের প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। কিন্তু পরবর্তী কালের ঘটনা এবং মিঃ এম. কে. গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও অন্যান্য নেতাদের সহিত ভাইস্রয়ের আলোচনার ফল বিবেচনা ক'রে এই কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গোল টেবিল কন্‌ফারেন্সে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠিয়ে কোন ফল হবে না।

অতএব এই কংগ্রেস গত কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ঘোষণা করছে যে কংগ্রেস সংবিধানের ১নং ধারায় স্বরাজ শব্দের অর্থ হল পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আরও ঘোষণা করছে যে নেহরু রিপোর্টের সমগ্র পরিকল্পনা বাতিল বলে গণ্য হল এবং আশা করছে যে এখন থেকে কংগ্রেসের সকল সদস্যই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার

উদ্দেশ্যে তাদের পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রচারকার্য্য চালাবেন। মূল নীতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বরূপ এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান সভাগুলি সম্পূর্ণ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। জাতীয় আন্দোলনের অংশ গ্রহণকারী কংগ্রেসের সদস্যগণকে এবং অন্যান্য সকলকে তাঁদের প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ভবিষ্যত নির্বাচনে কোন অংশ গ্রহণে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। বর্ত্তমানে বিধানসভা ও কমিটিগুলির পদগুলিতে কংগ্রেসের সদস্যগণ যেন ইস্তফা দেন। এই কংগ্রেস গঠনমূলক কর্মসূচী প্রবলভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য জাতির নিকট আবেদন জানাচ্ছে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে অধিকার দিচ্ছে যে কর প্রদানে অস্বীকার করা সহ নির্বাচিত স্থানে অথবা অন্য প্রকারে উচ্চ কমিটির বিবেচনা সম্মত রক্ষা কবচ রেখে আইন অমান্যের কর্মসূচী গ্রহণ করার ব্যবস্থা দিতে পারেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন

রাত্রি দ্বিপ্রহরে বীরত্বের ইতিহাস মণ্ডিত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরীতে পঞ্চ নদের অন্যতম নদ ইরাবতী তটে কংগ্রেসের এই স্মরণীয় অধিবেশনে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল।

"স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে প্রধান প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে ১১৫ ফুট উচ্চ একটি দণ্ড স্থাপন করা হয়েছিল। দণ্ডটি পাইপ দ্বারা নির্মিত, তার নিম্নভাগের বেড় ছিল ৬ ফুট, ক্রমশ উর্দ্ধে দাঁড়িয়েছিল ,৪ ফুট। দণ্ডে অবলম্বিত জাতীয় পতাকা ২০০ মোমবাতি শক্তির ত্রিবর্ণের প্রত্যেকটি রংয়ের পাঁচটি করে ১৫টি বৈদ্যুতিক বালব দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। তাছাড়া ত্রিবর্ণের প্রত্যেকটি রংয়ের ২০০০ হাজার মোমবাতি শক্তি যুক্ত একটি আর্ক টাঙ্গানো ছিল। দণ্ডটিও ত্রিবর্ণে রঞ্জিত ছিল।

স্বাধীন ভারতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মহান দৃশ্য দেখার

জন্য লাহোরের প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও প্রতিনিধি ছাড়াও সহস্র সহস্র লোকও সমবেত হয়েছিল। সে এক পরম আশ্চর্য্য দৃশ্য।

কাঁটায় কাঁটায় ৩১শে ডিসেম্বর (১৯২৯) রাত্রি ১২টা অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারীর প্রারম্ভে সভাপতিমশাই সমবেত জনগণের তুমুল "বন্দেমাতরম" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "মহাত্মাগান্ধী কি জয়" ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রে বললেন যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে আজ তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার সময় দর্শকদের চোখে মুখে আনন্দের যে দীপ্তি দেখা গিয়েছিল তা ভোলবার নয়।

সভাপতিমশাই পতাকাকে অভিবাদন জানালেন সমগ্র জনতা তাঁর অনুসরণ করল।*

এই অনন্য সাধারণ ভাবোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত দৃশ্য হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে নিয়ে প্রতিনিধিগণ ও জনমণ্ডলী নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই চিন্তা করতে লাগলেন—অতঃপর কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে এই অমূল্য স্বাধীনতা ধন অনিচ্ছুক বৃটিশ হস্ত থেকে ছিনিয়ে আনা সম্ভবপর হবে। জাতীর প্রতিভূ স্বরূপ কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীগণ যে পথ দেখাবেন, একমন এক প্রাণ হয়ে সেই পথ অনুবর্তন করতে হবে। সে হবে একটি কঠোর সাধনা; অসীম বলে বলীয়ান অদ্বিতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য সহজে ক্ষমতা ত্যাগ করবে না যেমন এতদিন করে নাই। তাঁরা নানা যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে, ভেদ ও দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, মিথ্যার ও প্রবঞ্চনার কুহেলিকার সৃষ্টি ক'রে লোভ ও ভীতির নিগড়ে নানা বন্ধন জাল রচনা ক'রে, ফাঁসির রজ্জু, কারাগার, নির্ব্বাসন শত প্রকার নির্যাতনের নিষ্ঠুরতায় পীড়িত ক'রে ধনপ্রাণ রক্ষার আবরণে পঙ্গুত্বের ক্লেদরাশি নিক্ষেপ ক'রে সমগ্র জাতির মেরুদণ্ড ভগ্ন ক'রে দিয়ে ক্ষমতাশীল হয়ে থাকার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে

* প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গিরিজা মোহন সান্যাল প্রদত্ত বিবরণ—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৮২

এসেছেন। সেই ক্ষমতার সিংহাসন থেকে ওদেরকে দূরে নিক্ষেপ ক'রে ভারতবাসীর স্বাধিকার বলে একটি স্বাধীন স্বশাসিত স্বয়ম্ভর জাতি রূপে কি ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে সেই পথের সন্ধান ও অনুবর্তনের মহান শক্তির সাধনার নিমিত্ত উদাত্ত আহ্বানই লাহোরের লাজপৎ রায় নগরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের মর্ম।

আজ দিকে দিকে আহ্বান ধ্বনিত হোক—'কে আছ মায়ের মুখ-পানে চেয়ে এস কে কেঁদেছো নীরবে ; মার মুখ চেয়ে আত্ম বলি দিয়ে মায়ের শৃঙ্খল ভাঙিবে'! 'আজ ভারতের প্রত্যেক নর নারীর বুক গৌরবে ভরে যাক—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে!' 'আজ নব ভারতের জনতা' 'এক জাতি এক প্রাণ একতা।'

একদিন ভারতীয় সন্ন্যাসী মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিত হয়েছিল —'উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' আজ সেই বাণী সার্থক হোক।

ভারতবাসীর ধমনীতে এক নূতন রক্তের স্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগল। এক নব শক্তির প্রেরণায় প্রাণ, মন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো!

প্রস্তুতির আহ্বান

১৯৩০ সালের ২রা জানুয়ারী কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জাতির নিকট একটি আবেদন প্রচার করলেন।....

'কংগ্রেস প্রস্তাবের ব্যাপক প্রচার এবং তার ভাবার্থ বোঝাবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, জেলা ও স্থানীয় কমিটিগুলির নিকট আবেদন জানাচ্ছি। ভবিষ্যত কার্যক্রম সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি নির্দেশ দিবে কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তাদের ঘর সামলাতে হবে'।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২রা জানুয়ারী ১৯৩০ তারিখের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল।—

"পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী ভারতের দূরবর্তী গ্রামে গ্রামে পৌছানর জন্য এই কমিটি ১৯৩০ সাল ২৬শে জানুয়ারী (রবিবার) একটি

উৎসবের দিন স্থির করেছে। সেদিন সভায় সভায় স্বাধীনতার ঘোষণা পড়ে শুনানো হবে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ঐ ঘোষণাতে সম্মতি জানানোর জন্য হাত তুলতে আহ্বান জানানো হবে।"

২৬শে জানুয়ারীর উৎসব পালন ক'রে যে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তা নিম্নরূপ স্থির করলেন।

ওয়ার্কিং কমিটি গৃহীত ঘোষণা বাণী ও শপথবাক্য

"আমরা বিশ্বাস করি যে অন্যান্য জাতিব ন্যায় ভারতীয় জাতিরও স্বাধীনতা লাভ এবং তাদের পরিশ্রমের ফলভোগ এবং তাদের জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য তাদের উন্নতির জন্য পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে যদি কোন গভর্ণমেণ্ট জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের উপর উৎপীড়ন চালায় তাহলে সেই গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন বা লোপ করার অধিকার জনগণের আছে। ভারতের বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে কেবল ভারতের জনগণকে তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে তাই নয় জনসাধারণের শোষণের উপর তার ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং ভারতকে অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস করেছে। সেই হেতু আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতকে বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করতে হবে।

ভারত অর্থ নৈতিক ব্যাপারে ধ্বংস হয়েছে। আমাদের জনগণের নিকট থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় আমাদের আয়ের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য নাই। আমাদের গড়পড়তা দৈনিক আয় ৭ পয়সা মাত্র এবং যে গুরুভার ট্যাক্স আমরা দেই তার শতকরা ২০ অংশ কৃষকদের প্রদত্ত ভূমি রাজস্ব থেকে আদায় হয় এবং শতকরা ৩ অংশ লবণ কর থেকে আদায় হয়। তার ফলে গরীবের উপর খুব চাপ সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন শিল্প যথা হাতের সুতাকাটা ধ্বংস করা হয়েছে। তার ফলে বৎসরে অন্তত চার মাস কৃষকদের কর্ম্মহীন জীবন-যাপন করতে

হয় এবং হস্ত শিল্পের অভাবে তাদের বুদ্ধি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। যে সকল শিল্প ধ্বংস করা হয়েছে অন্যান্য দেশের ন্যায় তাব বিকল্পে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

শুল্ক ও মুদ্রানীতি এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে যাতে কৃষকদের উপর চাপ আরো বাড়ে। আমাদের আমদানি পণ্যের অধিকাংশই বৃটেনে তৈয়ারী এবং বৃটিশ পণ্যের উপর শুল্কের নীতি স্পষ্টতঃ পক্ষপাত মূলক এবং তা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব জনগণের উপর চাপ লাঘবের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না। তা ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য। আরো স্বেচ্ছাচারী কাজ হচ্ছে মুদ্রা বিনিময়ের হার এমন সুকৌশলে পবিচালনা করা হচ্ছে যার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা দেশ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক দিক থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি এমনভাবে কোন দিন দুর্বল হয়নি যেমন বৃটিশ রাজত্বে হয়েছে। কোন সংস্কার দ্বারা জনসাধারণকে সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

বিদেশী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও মাথা নত করতে হয়। স্বাধীন মত প্রকাশ ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে এবং দেশের বহু লোককে বিদেশে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাঁরা দেশে ফিরতে পারছেন না।

আমাদের সমস্ত প্রশাসনিক কাজ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং সামান্য গ্রাম্য অফিসে চাকরী ও কেরাণীগিরি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হ'য়েছে।

কৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষার পদ্ধতি আমাদের মূল ভিত্তি থেকে বঞ্চিত, বিচ্ছিন্ন করেছে এবং আমাদের শিক্ষা যে-শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে সেই শৃঙ্খলকেই আলিঙ্গন করতে শেখান হচ্ছে।

আধ্যাত্মিকভাবে বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের অমানুষ করেছে এবং আমাদের প্রাতিরোধের ইচ্ছা মারাত্মকভাবে পূর্ণ করার

জন্য দখলকারী বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি এমন অবস্থায় এনেছে যে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি না, অথবা বৈদেশিক আক্রমণকে বাধা দিতে পারি না। এমন কি চোর, ডাকাত বা দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের পরিবারকে অথবা গৃহকে রক্ষা করতে পারি না।

যে শাসন আমাদের দেশে এই চতুর্বিধ দুর্ভাগ্য এনেছে সেই শাসনকে আর মেনে নেওয়া মানুষ ও ভগবানের নিকট অপরাধ মনে করি।

যাই হোক, আমরা জানি যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের সর্ব্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হিংসার মাধ্যম নয়; সেইহেতু আমরা প্রস্তুত হচ্ছি যতদূর সম্ভব বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সর্ব্ব প্রকার স্বেচ্ছাকৃত সংস্রব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে এবং ট্যাক্স বন্ধ সহ আইন অমান্য করার জন্য প্রস্তুত হতে। আমরা বিশ্বাস করি যদি আমরা স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য দানে বিরত হই এবং প্ররোচনা সত্ত্বেও কোন প্রকার হিংসার পথ অবলম্বন না ক'রে ট্যাক্স প্রদানে বিরত হই তাহলে এই অমানুষিক শাসনের অবসান হবে। সেইহেতু আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যে সকল নির্দ্দেশ সময়ে সময়ে দেবে তা আমরা কার্য্যকর করব।”

ভারত ব্যাপী উৎসব

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের গ্রামে-গঞ্জে, পল্লীতে-জনপদে, সহরে নগরে শত শত উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হল। সহস্র সহস্র নর-নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল স্বাধীনতার শপথ বাক্য। জেগে উঠল এক নূতন প্রাণ—প্রকাশমান হল স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্পে উদ্দীপ্ত এক জীবন—স্মৃতিপথে ধ্বনিত হল এক অভয় বাণী—'নাহি ভয়—হবে জয়, হবে জয়।'

মেদিনীপুর জেলার চিরসংগ্রামী মন কম্পিত হয়ে উঠল এক নূতন আবেগে। বিগত প্রায় দুই শত বৎসর ধরে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সঙ্ঘর্ষ-

সংগ্রামের পথে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা রূপ গ্রহণের জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষমান ছিল তাই এই পুণ্য দিবসে মূর্ত্ত হয়ে উঠল—শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণে। সহস্র সহস্র কণ্ঠ মুখরিত হয়ে উঠল ভারতের জয় গানে—'জয় ভারতের জয়—গাও ভারতের জয়'—...

এই সংগ্রামের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়েছিল গান্ধীজীর উপর—যিনি অপরাজেয় আত্মার শক্তিতে পার্থিব জড়শক্তির বিভীষিকাময়ী ভীতিব উর্দ্ধে তাঁর মহাতেজোময় সত্বাকে স্থাপন ক'রে ব্রিটিশের সর্ব্ব-প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়নের সম্মুখে অকুতোভয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন। সমগ্র দেশ তাঁর একটি মাত্র আদেশের অপেক্ষায় উন্মুখ ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অপূর্ব্ব সংগ্রামের জন্য জগতের দৃষ্টি পড়েছিল এই অস্ত্রশস্ত্রহীন কৌপীনধারী সেনাপতির সংগ্রাম কৌশলের দিকে। ভারতের কোটি কোটি নর-নারী নেতাব প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস ও আনুগত্য নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল তাঁর একটি মাত্র আদেশের জন্য।

অবিলম্বেই এই আদেশ এসেছিল। সমগ্র জগৎ এবার বিস্ময়ে সেই অহিংস সংগ্রামের অভিনবত্ব লক্ষ্য করছিল।

মেদিনীপুরের যুবসমাজ

দেশব্যাপী এই উদ্দীপনার তরঙ্গ জেলার মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার পূর্ব্ব হতেই মেদিনীপুরের যুবসমাজে একটি উদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল। মেদিনীপুরে বিপ্লবের প্রথম পর্য্যায়ে যে ভ্রূক্ষেপহীন আত্মোৎসর্গের চিন্তা যুবকদলকে অস্থির আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত ক'রে তুলেছিল পুনরায় তারই ছায়াপাত দেখা দিয়েছিল—১৯২৪ সাল থেকে মেদিনীপুরের যুবচিত্তে।

ঐ সময় মেদিনীপুর শহরের স্কুলগুলিতে যে 'বয়েজ স্কাউট্স' গড়ে তোলার (১৯২৪ খৃঃ অঃ) ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে স্কাউট্স্ দলভুক্ত ছাত্রদেরকে 'ঈশ্বর, রাজা ও দেশের' প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ক'রে শপথবাক্য পাঠ করতে হত। তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল বিদেশী

রাজা কি দেশ অপেক্ষা অগ্রগণ্য ? আগে রাজার (বিদেশী) প্রতি তারপর নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বড় বিসদৃশ। রাজা ও দেশের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হতে পারে তথাপি রাজার প্রতি আগে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে ? এ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। এঁরা মেদিনীপুরের মাটিতে জন্মলাভ করেছিলেন এবং শহীদ ক্ষুদিরাম ও সত্যেন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হেমচন্দ্র প্রভৃতির জীবন কাহিনীর সহিতও পরিচিত ছিলেন। ১৯২১ সাল থেকে সমগ্র দেশে বিশেষ ক'রে মেদিনীপুর জেলাতে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের যে প্রবাহ মানুষের প্রাণকে উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল তাও এঁদের যুব মনে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এঁদের প্রাণ তরঙ্গে উচ্ছল যুব মন কোন বন্ধন স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না—স্বাধীনতার অমৃত স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য এঁরা উন্মুখ হয়েছিলেন। কি করে এই অভিষ্ট লাভ হতে পারে তার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে এঁরা দিনের পর দিন পরামর্শে মগ্ন হলেন। মেদিনীপুর শহরের প্রান্তে কংসাবতীর জনবিরল সৈকতে বসে এঁরা ভবিষ্যতের কত স্বপ্নই না দেখতেন। একদিন এঁরা ৫টি কিশোর ছাত্র একত্রে গীতা হস্তে শপথ নিলেন—"দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবেন"। এঁরা ছিলেন—পরিমলকুমার রায় (ভবিষ্যতে ইনি বহু কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন), পুলিনবিহারী মাইতি (পিংলা), বীরেন্দ্রনাথ মাঝি, সন্তোষকুমার মিশ্র ও হরিপদ ভৌমিক (সবং) এঁদের সমবেত চিন্তা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করল টাউন স্কুলের "মিলন মন্দির" প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন উৎসাহী ছাত্র প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠী। এঁদের চেষ্টা চলল সহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি 'ছাত্র সঙ্ঘ' গঠনের জন্য। কিছু দিনের মধ্যে 'মেদিনীপুর যুব সঙ্ঘ' গঠিত হল। প্রফুল্লকুমারের সম্পাদনায় "পরশু" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হোল। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগের সৃষ্টি হোল কলিকাতার যুব-আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের। এখানকার যুবক ও ছাত্রগণকে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁন এবং শহীদ সত্যেনের অন্যতম ভ্রাতা ডাঃ

সুবোধকুমার বসু নানা দিক দিয়ে সাহায্য করেন। তখন গঠিত হোল "মেদিনীপুর যুব সমিতি"। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের ছাত্র ও যুবদলের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিলো স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খাকে রূপ দেওয়ার জন্য একটি প্রাণবন্ত চিন্তা। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে উত্থাপিত স্বাধীনতা প্রস্তাব এঁদের মন প্রাণকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

এই সময়ে (১৯২৮ খৃষ্টাব্দ) বি. ভি. গ্রুপের দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (বঙ্গের অন্যতম শহীদ) মেদিনীপুরে এসে মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র রূপে স্বীয় কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকেন। অনুশীলন দলের সুপরিচিত কর্মী ক্ষীরোদকুমার দত্তও কলেজে ভর্তি হ'য়ে বিপ্লবী দল গঠনের চেষ্টায় ব্রতী হন। সহরের মধ্যে যুবক দলের ব্যায়ামের আখড়া ও গোপন কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে উঠতে থাকে। এঁদের কিছু সেবামূলক প্রকাশ্য কাজকর্ম ছিল। মেদিনীপুর অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠিত 'তিলক পাঠাগার'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হ'য়ে এঁরা সৎপুস্তক পাঠ ও সদালোচনার জন্য প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় মিলিত হ'তেন। এখানে কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হ'ত না। ইহা পরস্পরের মেলামেশার সুযোগ রূপেই ব্যবহৃত হোত।

১৯২৯ সালে 'জেলা যুব সমিতি'র চেষ্টায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'মেদিনীপুর জেলা যুব সম্মেলনে'র সভাপতি রূপে মেদিনীপুর আসেন। তাঁর সাথী হ'য়ে এসেছিলেন মৌলবী জালালুদ্দিন হাসেমী, ডাক্তার সুবোধচন্দ্র বসু প্রমুখ যুব-আন্দোলনের নেতাগণ। নেতাজীর শুভাগমন ও প্রেরণা মেদিনীপুরের যুব সমাজকে দেশ সেবার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগমনী

এই পৃষ্ঠভূমিতে হ'য়েছিল মেদিনীপুরের রক্তক্ষরা প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম। একদিকে নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের কূলপ্লাবী জোয়ার, আর অন্যদিকে অপেক্ষা-ক্লান্ত যুবক দলের হৃদয়দাহ প্রসূত

অগ্রগামী পদক্ষেপ প্রচেষ্টা। পরবর্তী দীর্ঘ পঞ্চদশাধিক বর্ষ ব্যাপী প্রত্যক্ষসংগ্রামেব ঘটনাপুঞ্জ বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে মহিমামণ্ডিত ক'রে রেখেছে।

আমরা সেই ত্যাগ, দুঃখ সাহস ও বীরত্বের কাহিনীগুলির অনুবর্তন করবো—এই ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে।

বন্দেমাতরম্ !!

সহায়ক পুস্তকাবলী

যে সকল পুস্তক পত্র পত্রিকা এবং রেকর্ড থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে :—

১। History of freedom movement in India—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

২। The Sepoy Mutiny and The Revolt of 1857— ঐ

৩। Eighteen Fifty Seven—ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন

৪। বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

৬। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা—যোগেশ চন্দ্র বাগল

৭। সত্তর বৎসর—আত্মজীবনী—বিপিন চন্দ্র পাল

৮। ঋষি অরবিন্দ—ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

৯। Sri Aurobinda on himself—Sri Aurobinda

১০। ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

১১। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশ চন্দ্র বাগল

১২। Indian Association— ঐ

১৩। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

১৪। বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কানুনগো

১৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লবী যুগ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

১৬। রাজনারায়ণ বসু (পুস্তকাবলী)—হরিপদ মণ্ডল

১৭। বিপ্লবী বাঙ্‌লা—তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

১৮। বিপ্লবের সন্ধানে—নারায়ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

১৯। সে যুগের আগ্নেয় পথ—পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তী

২০। আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী—মতিলাল রায়

২১। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলন (সফল স্বপ্ন)—অতুল চন্দ্র বসু

২২। Dictionery of National Biography—

২৩। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়

২৪। মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশ চন্দ্র বসু

২৫। মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য্য
২৬। History of Midnapore vol I, II, III—নরেন্দ্র নাথ দাস
২৭। হিজ্‌লির মসনদ্‌-ই-আলা—মহেন্দ্র নাথ করণ
২৮। Bengal District Gazeteers Midnapore—S. S. O. Mally
২৯। Mahatma Gandhi B. R. Nanda
৩০। গান্ধী রচনা সম্ভার—গান্ধীশতবার্ষিকী প্রকাশন
৩১। Swaraj in one year—Mahatma Gandhi
৩২। History of Indian National Congress—Dr. Pattavi Sitaramiya
৩৩। দেশবন্ধু স্মৃতি—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
৩৪। স্রোতের তৃণ—বীরেন্দ্র নাথ শাসমল
৩৫। দেশপ্রাণ শাসমল—প্রমথ নাথ পাল
৩৬। বাংলার হলদিঘাট তমলুক—গোপীনন্দন গোস্বামী
৩৭। মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস—চিত্তরঞ্জন দাস
৩৮। India Ravaged—
৩৯। Rebel India—
৪০। 2 years of National Govt—S. C. Samanta & others
৪১। মুক্তির গান—সতীশ চন্দ্র সামন্ত
৪২। শহীদ ক্ষুদিরাম—হরিপদ মণ্ডল
৪৩। ক্ষুদিরাম—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
৪৪। সত্যেন্দ্রনাথ— ঐ
৪৫। জাতি ভেদাদি গ্রন্থাবলী—দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য
৪৬। বঙ্গে দিগিন্দ্র নারায়ণ—মণীন্দ্র নাথ মণ্ডল
৪৭। National Archives—নরেন্দ্র নাথ দাস ও বসন্ত কুমার দাস

(সংগৃহীত notes)

৪৮। 'প্রবাসী' 'প্রণব' 'নীহার' 'দেশ' 'আনন্দ বাজার' 'মেদিনীবাণী' 'মেদিনীপুর পত্রিকা' প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ॥
৪৯। জেলার বিভিন্ন থানা হইতে প্রকাশিত বুলেটিন—
৫০। মানবেন্দ্র নাথ রায়—স্বদেশ রঞ্জন দাস
৫১। মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রাম, খেজুরী থানা—বসন্ত কুমার দাস
৫২। কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি—রাধারমণ চক্রবর্তী

৫৩। The Indian Struggle—সুভাষ চন্দ্র বসু
৫৪। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
৫৫। ডেবরা থানার ইতিহাস—বলাই চন্দ্র হাজরা
৫৬। স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা—বঙ্কিম ব্রহ্মচারী
৫৭। এগরা থানার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—বঙ্কিম চন্দ্র দাস
৫৮। শহীদ রক্তে সিক্ত মেদিনীপুর—মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি ॥
৫৯। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর থানা—হৃষিকেশ গায়েন
৬০। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—ক্ষীরোদ কুমার দত্ত
৬১। তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত
৬২। Role of Central legislature in the freedom Struggle
Monoranjan Jha
৬৩। দিব্যায়ন—মনমোহন দত্ত
৬৪। ঘাটালের কথা—পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায়
৬৫। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—প্রহ্লাদ কুমার প্রামানিক
৬৬। আত্ম চরিত—রাজনারায়ণ বসু
৬৭। History of Bagri Rayaya—গৌরী পদ চ্যাটার্জী
৬৮। মেদিনীপুরের বোমার মামলা—অতুল চন্দ্র বসু

নির্দেশিকা

অ

আ

ও

ক

ধ

ন

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা ২৪ :—

মহিষাদলের নিকটবর্তী গ্রাম মসলন্দপুরের যে বর্ণানাটি দেওয়া হয়েছে তা S. S. O. Mally প্রণীত মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার হতে গৃহীত হয়েছে কিন্তু তা সঠিক নয়। ৺মহেন্দ্রনাথ কবণ মহাশয় তাঁর 'হিজ্‌লীব মস্‌নদ্‌-ই-আলা' নামক ইতিহাস পুস্তকে এই বিবরণ গ্রহণ করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে মসলন্দপুরে কোন মিহি মাদুব প্রস্তুত হয় না। গেঁওখালির নিকটবর্তী 'মীবপুরে'ই একটি পর্তুগীজ কলোনীর সৃষ্টি হযেছিল তাব চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

পৃষ্ঠা ৩৫ :—

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মভূমিব সম্বন্ধে কোন কোন লেখক 'ক্ষেপূত' গ্রামেব নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু কতকগুলি প্রামাণ্য পুস্তকে দেখা যায় যে তাঁব জন্মস্থান ছিল ২৪ পরগণা জেলায় আডবেলিযা গ্রাম এবং জন্ম সন ছিল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।

পৃষ্ঠা ৩০৬ :—

'দিগম্বর পডিয়া' স্থলে 'দিগম্বর পণ্ডা' হবে।

পৃষ্ঠা ২০৯ :—

২৩শে নভেম্বর (১৯০৮) স্থলে ২১শে নভেম্বব '১৯০৮' হবে।